প্রথম প্রকাশ : ১৯৬০

প্রকাশক : প্রবীর মিত্র : ৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট : কলকাতা-৭০০০০৯
প্রচ্ছদ : মানবেন্দ্র পাল
মুদ্রণ : তনুশ্রী প্রিন্টার্স : ২১বি. রাধানাথ বোস লেন : কলকাতা-৭০০০০৬

সুপ্রকাশ দত্ত ও বর্ণালী দত্ত
প্রিয়যুগলেষু

সূচীপত্র

নিউ মাস্টারস ফর এণ্ড

কার্টার ডিকসন

বাতি দুটো না ধরানো পর্যন্ত হারগ্রিভস গা থেকে ওভারকোটটা যেমন খুললেন না, তেমনি একটা শব্দও বার করলেন না মুখ থেকে। ঘরটা ভীষণ ঠাণ্ডা হলেও কেমন বিশ্রি গুমোট ভাব আর স্যাঁতস্যাঁতে একটা গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল। আসলে জানলাগুলো সব বন্ধ। কয়েকটা খড়খড়ি অবশ্য পুরো বন্ধ ছিল না, যার জন্য বাইরের আলোয় বোঝা যাচ্ছিল কি রকম তুষারপাত হচ্ছে।

হারগ্রিভস বাতিটা জ্বাললেন। তারপর বিছানাটা দেখিয়ে বললেন, লক্ষ্যবস্তুটা ছিল এখানে। আর এই যে দরজাটা, এখান দিয়েই সে ভিতরে ঢুকেছিল। আশা করি আপনি বুঝতে পাচ্ছেন আমি কি বলতে চাইছি। এই বলে হারগ্রিভস তাকালেন তার সঙ্গিনীর দিকে।

তিনি মাথা নাড়ালেন। বোঝা গেল হারগ্রিভস যা বলেছেন তা সবটাই তার বোধগম্য হয়েছে।

হারগ্রিভস আবার বললেন, আমি কিন্তু আপনার মনে কোন বিভ্রান্তি তৈরি করতে চাইছি না। আমি চেষ্টা করছি যাতে আপনি সমস্ত ব্যাপারটা ঠিকঠাক ভাবে বুঝতে পারেন। সঙ্গিনীটি তাকালেন। হারগ্রিভস বললেন, এবার তাহলে আমরা নিচের তলায় যেতে পারি।

কথাটা বলে তিনি তার সঙ্গিনীকে নিয়ে নিচের তলায় নামলেন। শক্ত গদির গালিচা পাতা সত্বেও সিঁড়ির মাথাগুলো থেকে নিচে নামবার সময় অদ্ভুত একটা অনুভূতি হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল শক্তপোক্ত বিশাল বাড়িটা যেন তীক্ষ্ণ সুরে কিছু একটা বলতে চাইছে যার অর্থ বোঝা মুশকিল।

নিচে পিছন দিকে একটা ছোট্ট ঘরে গ্যাসের আগুন জ্বলছিল। নীল শিখা আর তার হিসহিস্ শব্দ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল। ঘরটা সম্ভবত পড়ার ঘর হবে। আগুনের ঠিক উল্টোদিকে একটা কুর্সি তিনি এগিয়ে দিলেন তার সঙ্গিনীকে বসার জন্য, তারপর নিজে বসলেন তার উল্টোদিকে।

হারগ্রিভস বললেন—আমি আপনাকে আসলে সমস্ত ঘটনাটা ভাল করে বুঝিয়ে দিতে চাইছি। মনে করবেন না যেন আমি পণ্ডিতি করছি, আসলে মনে করবেন আপনি এই ব্যাপারে কিছুই জানেন না। এই ব্যাপারের সঙ্গে আপনার নিজস্ব কোন

সম্পর্ক নেই। যদি এইভাবে আমার বক্তব্যকে অনুধাবণ করেন তাহলে আপনার পক্ষে বোঝা অনেক সহজ হবে যে তাকে কি ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

হারগ্রিভস অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে সামনের দিকে ঝুঁকে কথা বলছিলেন। মাঝে মাঝে তার দস্তানা পরা হাতদুটো চঞ্চলতা প্রকাশ করছিল, কখনো বা তিনি হাতদুটোকে দুই হাঁটুর মধ্যে চেপে ধরছিলেন।

—তাহলে টনি মারভেলকে দিয়েই শুরু করা যাক আমাদের আলোচনা। এই বলে হারগ্রিভস বলতে লাগলেন, টনি মারভেল খুব ভাল লোক। ওকে সবাই ভীষণ পছন্দ করতো। একজন ভাল ব্যবসাদার হতে গেলে যে রকম শয়তানী বুদ্ধির দরকার হয় তা ঠিক ওর মধ্যে ছিল না। তবে ভদ্রলোকের বিচারবুদ্ধি ছিল অত্যন্ত পরিষ্কার।

টনি ছিলেন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের ছাত্র। প্রথম শ্রেণিতে সম্মানের সঙ্গে স্নাতক হয়েছিলেন। ইচ্ছে ছিল পড়াশুনো করেই চালিয়ে যাবেন। আসলে লেখাপড়া ব্যাপারটাকে টনি একটু বেশি ভালবাসতো। কিন্তু মানুষ যা চায় বাস্তবে তা অনেক সময় হয়ে ওঠে না। যখন তিনি পড়াশুনোর মধ্যে ডুবে যাবেন বলে স্থির করে ফেলেছেন তখনই তার কাকা মারা গেলেন। ফলে কাকার ব্যবসা দেখার দায়িত্বটা এসে পড়লো তার উপর। ওর কাকার ছিল হোটেলের ব্যবসা। বিলাসবহুল তিনটে হোটেলের মালিক ছিলেন ভদ্রলোক এবং বেশ জমকালো ভাবেই তিনি সেগুলো চালাতেন। বাইরে থেকে হোটেলগুলোকে দেখলে মনে হত ভালই ব্যবসা হচ্ছে, আসলে তখন ওর সবকটাই গোল্লায় যেতে বসেছে।

অনেকেই তখন টনিকে বলেছিলেন, ওসব ঝুট ঝামেলায় যেও না, তার চাইতে যেমন পড়াশুনো করছো, তেমনি পড়াশুনোটা চালিয়ে যাও। কি দরকার অন্যের বোঝা কাঁধে নেওয়ার। তার ভাই মানে পূর্বতন শল্যবিদ স্টিফেন মারভেল বলেছিল, টনি শুধু শুধু কাকার দেনার বোঝাটা কাঁধে নিয়ে আমাদের গোটা পরিবারটাকে ডুবিয়ে দেবে। টনি কিন্তু এসব কথায় কান দেননি। বরং লেগে পড়েছিলেন কাকার হোটেলের ব্যবসায় এবং তারপর পঁচিশ বছর বয়সে ব্যবসাটা হাতে নিয়ে, সাতাশ বছর বয়সের মধ্যে হোটেলগুলোকে তিনি লাভজনক জায়গায় এনে, তিরিশ বছর বয়সে সেই লাভের অঙ্ক কোন্ জায়গায় দাঁড় করিয়েছিলেন—এটা নিশ্চয় আপনাকে আমার নতুন করে কিছু বলে দিতে হবে না।

আসলে টনির এই সাফল্যের পিছনে কোন যাদুবিদ্যা ছিল না। তবে যেটা ছিল সেটা হল, কাজে কোনরকম গা ঢিলে না দেওয়া। তার যে কাজটা করতে খুব ভাল লাগছিল এমন নয়। তার বক্তব্য ছিল, এই ব্যবসাটা আমার কাছে আদৌ পছন্দের নয়। তবু দায়িত্বটা যখন এসেছে, তখন তাকে পরিচ্ছন্নভাবে একটা সুষ্ঠ জায়গায়

তাড়াতাড়ি দাঁড় করাতে পারলে, আমি আবার অন্য গুরুত্বপূর্ণ কাজে লেগে থাকতে পারবো। গুরত্বপূর্ণ কাজ বলতে, পড়াশুনো আর কি। আসলে ব্যবসাটা টনি কাঁধে নিয়েছিলেন, স্রেফ কাকাকে তিনি কথা দিয়েছিলেন বলে। বৃদ্ধ জিম তাকে যথেষ্ট স্নেহ করতেন। টনির মনে হয়েছিল ব্যবসা বস্তুটা এমন কিছু নয়। ব্যাপারটা তিনি খুব সহজ ভাবেই গ্রহণ করেছিলেন। আসলে যতটা সহজ বলে তার কাছে মনে হয়েছিল ব্যবসাটা, ততোটা সহজ ছিল না। কোথায় লণ্ডন, কোথায় ব্রাইটন আর কোথায় ইষ্টবোর্ণ। মারভেল দায়িত্ব হাতে নিয়ে হোটেলের সব কিছু অঙ্কের মতই জেনে নিয়েছিলেন। বালিশের ওয়াড় থেকে শুরু করে, লিফটে ব্যবহারের তেলের দাম—সব ছিল তার নখদর্পণ। কিন্তু এর ফলে পঞ্চম বছরের শেষের দিকে একদিন সকালবেলা উনি নিজের অফিস ঘরের মধ্যে একবারে ভেঙ্গে পড়লেন।

ওর ভাই স্টিফেন এসে ওকে পরিষ্কার জানিয়ে দিল, এখান থেকে এখন তোমাকে কেটে পড়তে হবে। সারা দুনিয়াটা একবার ঘুরে দেখ, যেখানে খুশি সেখানে যাও—তোমাকে মস্ত ছুটি দেওয়া হচ্ছে। এই ছুটির সময়টা কোন মতেই আট মাসের কম হলে চলবে না। এই সময়টার মধ্যে তুমি তোমার কাজকর্মের কথা একদম কিছু চিন্তা করতে পারবে না। কি বুঝেছো?

গতকাল রাতে টনি নিজেই আমাকে কাহিনীটা বলেছেন। উনি বলেছেন দূরে থাকার সময় তাকে যদি চিঠিপত্র লিখতে বারণ করা না হত, তাহলে পুরো ঘটনাটা হয়ত আদৌ ঘটতো না।

স্টিফেন তাকে বলে দিয়েছিল, কাউকে পোস্টকার্ডে একটা লাইন পর্যন্ত লেখা চলবে না। যদি তুমি তা করো তাহলে একমাত্র ঈশ্বরই হবেন তোমার ভরসা।

টনি বলেছিলেন—কিন্তু জুডিথ, তাকে তো—

—বিশেষ করে জুডিথকে তো নয়ই। তুমি যদি তোমার সেক্রেটারিকে বিয়ে করবে বলে ভেবে থাকো, সেটা হল তোমার নিজের ব্যাপার। কিন্তু হোটেলগুলোর সম্পর্কে লম্বা চওড়া চিঠি লিখে তুমি তোমার সুস্থ হয়ে ওঠার সময়টাকে নষ্ট করে ফেল না।

একবার মনে মনে চিন্তা করে দেখুন, স্টিফেনের রাগান্বিত অভিজাত মুখখানা টনির উপর ঝুঁকে ছিল। ওর হার্লে স্ট্রিটের অফিস ঘরে পালিশ করা ঝাঁ চকচকে টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে আছে স্টিফেন। পরণে কালো কোট আর ডোরাকাটা পাতলুন। স্টিফেন মারভেলের মধ্যে এবং কিছুটা পরিমাণ হলেও টনির মধ্যে যে অভিজাত ভাবটা ছিল, সেটি টনি মারভেল কোন কালেই আয়ত্ত করতে পারেননি।

স্টিফেনের কথায় টনি কোন প্রতিবাদ করেন নি। আসলে তিনিও মনে মনে এইরকম একটা লম্বা ছুটি চাইছিলেন কাজ থেকে, ক্লান্তি দূর করার জন্য। একটাই

যা তাকে কষ্ট দিচ্ছিল সেটা হল জুডিথকে চিঠি না লেখার ব্যাপারটা। তবে তাকে নিয়ে চিন্তা করতে কোন বাধা ছিল না। আজ থেকে আট মাস আগে সম্ভবত সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে সাউদাম্পটন থেকে 'কুইন অ্যান' জাহাজে চেপে তিনি রওনা হলেন। বলা দরকার নেই রাত্রি থেকেই শুরু হল ভয়ঙ্কর ঘটনাগুলো।

হারগ্রিভস সামান্য সময়ের জন্য একটু চুপ করে রইলেন। স্বল্পালোকিত ছোট্ট ঘরখানাতে এখনো গ্যাসের আগুনের হিস্‌হিস্‌ শব্দ শোনা যাচ্ছে। হারগ্রিভসের সঙ্গিনীর মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল এই বাড়িতে একটা মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে এবং তা মাত্র কিছুদিন আগেই।

হারগ্রিভস বলতে লাগলেন ঃ মাঝরাতে 'কুইন অ্যান' যাত্রা শুরু করে। টনি দূরে দাঁড়িয়ে দেখলেন জাহাজটা আকাশ সমান উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অসংখ্য আলোয় চারদিক ঝলমল করছে। ডেকের উপর চলমান লোকগুলোকে দূর থেকে বিন্দুর মত লাগছিল। প্রথমটায় বেশ ভাল লাগছিল। মনে মনে উত্তেজনা বোধ করছিলেন। স্টিফেন মারভেল আর টনির প্রেমিকা জুডিথ—দুজনেই তারা এসেছিলেন সাউদাম্পটন পর্যন্ত। তার কেবিনটা দারুণ সুন্দর। প্রেমিকাকে সেটা দেখাবার জন্য তিনি তাকে নিয়ে গেলেন। কেবিনের মধ্যে টনির মালপত্র আর একটা ফলের ঝুড়ি। জুডিথ দেখলেন, সত্যি কেবিনটার তুলনা হয় না।

জাহাজ থেকে নেমে যাওয়ার সংকেত ঘণ্টা বাজার কয়েক মিনিট আগে ছাড়া টনিকে কোন একাকীত্ববোধ গ্রাস করতে পারেনি। ঠিক শেষ সময় স্টিফেন আর জুডিথ জাহাজ থেকে নেমে গিয়ে ডকের উপরে দাঁড়িয়েছিল। জাহাজের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে টনি মারভেল ওদের দেখতে পাচ্ছিলেন। জুডিথের ছোট্ট সুন্দর শান্ত মুখটা যেন অনেক দূরের বিন্দু বলে মনে হল। এর পরেই টনি ঘণ্টার ধ্বনি শুনতে পেলেন। ঘণ্টাটা যেন চিৎকার করে বললে—যারা যাত্রী নন, তারা নেমে পড়ুন। টনির বুকের ভিতরটা হু-হু করে উঠেছিল। মনে হয়েছিল একসময়, এখনও সময় আছে মালপত্তর নিয়ে জাহাজ থেকে উনি নেমে পড়তে পারেন। দূর থেকে জুডিথ আর স্টিফেন হাত নাড়লো। নিজেকে দৃঢ় করে ডেক থেকে সোজা চলে এলেন টনি নিজের কেবিনে। যেতেই যখন হবে, তখন মালপত্তরগুলো ঠিক ঠিক কেবিনে গুছিয়ে নেওয়াই ভাল।

কিন্তু কেবিনে ঢুকে টনি তো একেবারে হতবাক। তার মালপত্তর কিছুই নেই। পোর্টহোলে পরিষ্কার পর্দা লাগানো কেবিনের চারদিকে চোখ বোলালেন। মালগুলো তো সব এখানেই ছিল। একটা ট্রাঙ্ক, দুটো সুটকেশ আর একটা ফলের ঝুড়ি। সবকটাতে লেবেল সাঁটা ছিল। ওগুলো গেল কোথায়?

সিঁড়ি ধরে ফের ছুটতে ছুটতে টনি চলে এলেন যাত্রী তত্ত্বাবধায়কের অফিস ঘরে। ভদ্রলোক সমস্ত ঝামেলা মিটিয়ে একটু সবে স্থির হওয়ার চেষ্টা করছিলেন।

ঘণ্টা বাজানো এবং নির্দেশ দেবার মাঝামাঝি সময়টুকুর মধ্যে তার নজর পড়লো টনির দিকে।

—আমার মালপত্তর? ওগুলো কে নামিয়ে নিল?

—ঠিক আছে মিস্টার মারভেল। সেগুলো জাহাজ থেকে নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আপনি বরং নিজে একটু তাড়াতাড়ি করুন।

টনির নিজেকে অসম্ভব বোকা বলে মনে হচ্ছিল। বললেন—আমার মালপত্তর নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে মানে? কে আপনাকে নামিয়ে দিতে বলেছে?

—কেন আপনি। এই তো দেখুন আপনার নাম আর সংখ্যা লেখা স্লিপটা—এক টুকরো কাগজ ভদ্রলোক এগিয়ে দিলেন টনির দিকে।

টনি তো অবাক, মুখে কথা সরলো না। ভদ্রলোক বললেন, এই তো দশ মিনিট আগে আপনি নিজে এসে বললেন যে আপনি যাবেন না। আপনার মালপত্তরগুলো যেন নামিয়ে দেওয়া হয়। আমি তখন বলেছিলাম, এই সময় আপনি যাবেন না বলছেন, তা না যান, টিকিটের দাম কিন্তু ফেরৎ দিতে পারব না।

টনির কানে কথাগুলো অদ্ভুত শোনালো। তারপর বললেন—

—না, না আপনি সব মালপত্তর ফিরিয়ে আনুন।

—যেমন আপনার অভিরুচি। তবে যদি সময় থাকে।

আশ্চর্য লাগছিল নিজের। একবারও তার মনে হল না যে এই ভদ্রলোকের সঙ্গে এর আগে কোন কথা বলেছে বলে।

সমুদ্রের উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ এবং জাহাজের শিস, তখনই তার মাথাটাকে ঝাঁজিয়ে তুললো। আঘাত করলো সাউদাম্পর্টনের জলে। খোলা দরজাগুলোর মাঝখানে বি ডেকে তখন ঝোড়ো হাওয়ার উন্মাদনা।

টনি ভাবছিলেন লোকটাতো ভারি অদ্ভুত কথা বললেন। মনে মনে ভাবলেন, সিঁড়ি তোলার আগে তিনি একছুটে 'কুইন অ্যান' থেকে নেমে যাবেন। এটাও আবার একটা দুঃস্বপ্ন। তাঁর স্নায়ু বিকলতার এক বিশ্রী বৈশিষ্ট্য ছিল। আচমকা রাত্রিবেলা তার মনে হত—তিনি যেন আর বাস্তব মানুষ নেই। দেহ থেকে তার আত্মাটা বেরিয়ে তাকে আলাদা করে দিয়েছে। দৈনন্দিন কাজকর্মগুলো যন্ত্রের মত করে গেলেও তার মস্তিষ্কের মধ্যে থাকতো অন্য চিন্তা। ঠিক যেন মনে হত মরে গিয়ে তিনি সব কিছু দেখতে পাচ্ছেন, তার দেহটাও নড়াচড়া করছে।

নিজেকে স্বাভাবিক করার জন্য টনি তখন তার পরিচিত মানুষদের দিকে একটু বেশি মনোযোগি হওয়ার চেষ্টা করতেন। যেমন জুডিথ। ভাবতে চেষ্টা করতেন তার মুখ, তার পরণের হালকা পোশাকের রূপ। জুডিথ তার প্রেমিকা আবার তার একান্ত সচিবও বটে। টনির বিশ্বাস তার অনুপস্থিতিতে জুডিথ তার সমস্ত ব্যবসার দিকে কড়া নজর রাখবে। কিন্তু জুডিথের সঙ্গে তার আর দেখা হবে না বেশ

কিছুদিন। শেষ মুহূর্তেও ঠিকমত কথা বলা হল না। স্টিফেন ওদের দুজনের কথাবার্তা যাতে বেশি না হয় তার জন্য সবসময় কাছাকাছি ঘুরঘুর করছিল। মনে পড়লো সেই মুহূর্তে আরও অনেকের কথা। বন্ধু জনি ফ্লিভার, এমনকি মৃত কাকা জিম মারভেলের কথা। হঠাৎ যেন তার মনে হল লাউঞ্জে বসে—টবে রাখা পাম গাছটার এক কোণে বৃদ্ধ জিম তার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন।

যাই হোক শেষ পর্যন্ত তত্ত্বাবধায়কের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে টনি নিচে নেমে এলো। ডেক থেকে উপরে ওঠা আবার নিচে নেমে আসার মধ্যে তিনি কোন যাত্রীর দিকে ঠিকমত মনোযোগ দেননি—তবে এটা ঠিক যারা রয়েছেন তারা এখন থেকে জাহাজে তার সঙ্গেই থাকবেন।

কেবিনের দরজা খুলে দোরগোড়াতে পৌঁছেই আবার থমকে গেল। শরীরটা নিস্পন্দন হয়ে গেল। জাহাজের পাখা তখন ঘুরতে শুরু করেছে। ফলে একটা তীব্র ঝাঁকুনি দিয়ে টলে উঠলো জাহাজটা। বলেছিল যাত্রা শুরু করেছি। এত জোরে ঝাঁকুনি দিল যে দরজা ধরে না দাঁড়ালে হয়ত সে পড়ে যেত। আবার বিছানার দিকে তাকালো। দেখতে পেল সাদা চাদর ঢাকা বিছানার উপর একটা স্বয়ংক্রিয় পিস্তল পড়ে রয়েছে। এটাতো আগে ছিল না—এটা আবার এলো কোথা থেকে।

গ্যাসের আগুনে হিটারের অ্যাজবেস্টারের পাটাগুলো তেতে লাল হয়ে উঠেছিল। সেন্ট জনস্ উডের বাড়িতে ছোট্ট ঘরটাতে ফের নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে। হারগ্রিভস অর্থাৎ পুলিশ বিভাগের অপরাধ তদন্তশাখার সহযোগি কমিশনার চার্লস হারগ্রিভস—নিচের দিকে ঝুঁকে হিটারের দিকটা একটু নামিয়ে দিলেন। গ্যাসের প্রবল হিস্‌হিস্ আওয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তার কণ্ঠস্বরটাও যেন পালটে গেল বলে মনে হল।

—দাঁড়ান। হাত তুলে হারগ্রিভস বললেন, আপনার মনে কোন ভুল ধারণার সৃষ্টি হয় এটা আমি চাই না। মনে করবেন না আতঙ্কটা—মানে যা ঘটতে যাচ্ছে তার স্তিমিত পূর্বাভাষ—বিশ্ব পরিভ্রমণের সমস্ত সময়টাই টনিকে তাড়া করে বেড়িয়েছে। আসলে ব্যাপারটা কিন্তু আদৌ তা নয়, এবং সেটাই সমস্ত ঘটনার মধ্যে সব চাইতে বিচিত্র অংশ। •

টনি আমাকে নিজেই বলেছেন, ওটা ছিল নিতান্তই সংক্ষিপ্ত একটা শিহরণ, 'কুইন অ্যান' যাত্রা শুরু করার আগে ও পরে সব মিলিয়ে তার মেয়াদ ছিল সব শুদ্ধু পনেরো মিনিট। কোন কিছুই বাস্তব নয়—এটা সে ধরনের কোন অলৌকিক অনুভূতি নয়। টনির মনে হয়েছিল এই হিংস্রতা, ঘৃণা অথবা বিপদ যাই কিছু একে বলা যাক না কেন, এটা হল তার নিশ্চিত উপস্থিতি। কিছুক্ষণ সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকার পব মনের ভিতরকার সমস্ত অনুভূতিটা তার বদলে গেল। মনে

হল তিনি যেন কুয়াশা থেকে বেরিয়ে এলেন। ব্যাপারটা আদৌ যুক্তিসংগত কিনা বলা শক্ত। কারণ দুষ্টু আত্মা আছে বলে যদি ধরে নেওয়া যায় তাহলে তারা দেশের একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে। আধ মাইল দূরে গেলেও তাদের প্রভাব নষ্ট হয়ে যায় আর সবচেয়ে বড় কথা তারা জল পেরুতে পারে না। এসব চিন্তা করা শক্ত। কিন্তু একটা সময় টনি সত্যি সত্যি ওই স্বয়ংক্রিয় পিস্তলটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। ইঞ্জিনের গর্জন তার কানে আঘাত করেছিল, ভয়ঙ্কর একটা প্রবৃত্তি তখন তার হাতটাকে ঝাঁকুনি দিয়ে বন্দুকের নলটাকে মুখের মধ্যে গুজে দিয়েছিল এবং তারপরেই কে যেন টনির ভিতর থেকে বলে উঠলো—আরে করো কি থামো থামো। টনি সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। সদ্য জ্বর থেকে ওঠা একটা মানুষের মত বলে মনে হচ্ছিল তার নিজেকে। তারপর ধীরে ধীরে একসময় তিনি বাস্তবে ফিরে এলেন। টনি বলেছেন, তিনি সুস্থ বোধ করার পর ভাবতে লাগলেন পিস্তলটা তার কেবিনে এলো কি করে? তবে মনে হয়েছিল হয়ত কোন আচ্ছন্নতার ঘোরে তিনি নিজেই ওটা সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। এখন নতুন চোখে ওটার দিকে তাকিয়ে সৌন্দর্য ও মাধুর্য সম্পর্কে এক নতুন অনুভূতি বোধ করলেন টনি। তার মনে হল, তিনি যেন একটা নির্মম মৃত্যুদণ্ড থেকে রেহাই পেয়েছেন।

"আপনি কি ভাবছেন পাছে পিস্তলটাকে ছুঁতে হয় সেই ভয়ে টনি ওটাকে সমুদ্রের জলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। না-না উনি মোটেই তা করেন নি। বরং অনেকক্ষণ ওটাকে হাতের মধ্যে নিয়ে নাড়াচাড়া করে বুঝেছিলেন ওটা বেলজিয়ামে তৈরি গুলিভরা একটা ব্রাউনিং—৩৮। প্রথমে ওটাকে কটা দিন ট্রাঙ্কের মধ্যে রেখে দিয়েছিলেন।

নিউইয়র্ক শুল্ক বিভাগীয় ছাউনিতে পিস্তলটা কোন বিস্ময় বা উত্তেজনা জাগালো বলে মনে হল না। ওটা সঙ্গে নিয়ে দিব্যি ঘুরে বেড়ালেন ক্লিভল্যাণ্ড, শিকাগো আর সল্টলেক সিটিতে। এরপর গেলেন সানফ্রান্সিসকোয়—সেখান থেকে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে হনলুলু। ইয়াকোহামায় এসে শুল্ক বিভাগ পিস্তলটা নিয়ে একটু ঝামেলা করেছিল, সেটা তিনি ডলার দিয়ে চাপা দিলেন। তারপর থেকে তিনি ওটা ট্রাঙ্কে না রেখে সর্বদা নিজের কাছেই রাখতেন এবং কোন সময় তাকে খানা-তল্লাসি করা হয়নি। তার সঙ্গে সঙ্গে পিস্তলটা পৃথিবীর অনেকটা অংশ ঘুরেছে। প্রথম শীতের দিনগুলোতে ঘুরে বেড়ালেন পার্টি সৈয়দ আর কায়বেরা তারপর নেপলস্, মার্সাই, জিব্রাল্টার। যাত্রা শুরু করার আটমাসের কিছু পরে টনি মারভেল নিজেকে একজন সতেজ সুস্থ এবং সাবলীল মানুষ বলে মনে করলেন। যখন তিনি এস. এস. চিপেনহ্যাম ক্যাসেল থেকে সাউদাম্পর্টনে এসে নামলেন, তখন ওই বিশ্রি ঠাণ্ডার মধ্যে পিস্তলটা তার পিছনের পকেটে গোঁজা ছিল।

সেদিন রাতে তুষারপাত হয়েছিল নিশ্চয় আপনার মনে আছে। টনি জানতেন

সাউদাম্পটনে কেউ তার জন্য অপেক্ষা করবে না। কারণ তিনি যে ফিরছেন একথা জানানো বারণ। কাজেই একটা পোস্টকার্ড পর্যন্ত তাই কাউকে লেখা হয়নি।

শুধু একটা কাজ করলেন ক্রিসমাসের সময় যাতে বাড়ি পৌঁছনো যায় সেইজন্য ভ্রমণ তালিকা বদল করে জাহাজে চেপে নিজের বাড়ির দিকে হাঁটা দিলেন। আসলে উদ্দেশ্য ছিল এক সপ্তাহ আগে বাড়িতে ফিরে তিনি সবাইকে একটু অবাক করে দেবেন। আটটা মাস বড় শূন্যতার মধ্যে কেটেছে। মন টানছিল জুডিথের জন্য।

জাহাজ থেকে নেমে ট্রেন ধরলেন। ট্রেনের স্বল্পালোকিত কামরাতে টনির সহযাত্রীরা কেউই বড় একটা কথাবার্তা বলছিল না। আসলে একে কঠিন সমুদ্র যাত্রা তার উপর তুষারপাত।

একজন বললেন—সত্যি, এবার যেন ক্রিসমাস বড় শয়তানি করছে।

—তা যা বলেছেন!

—কি বিশ্রি ধরনের এই ঠাণ্ডা। তৃতীয় ব্যক্তি একজন গজগজ করে বললেন। আচ্ছা, এরা কি ট্রেনগুলোকে কোনদিন একটু গরম রাখার ব্যবস্থা চালু করতে পারে না? এবার আমি সত্যি এই ব্যাপারে কাগজে অভিযোগ জানাবো।

টুকরো টুকরো কিছু কথাবার্তার পর যে যার হাতের পত্রিকায় আশ্রয় নিল।

পত্রিকায় মন দেবার ইচ্ছে ছিল না টনির। মনটা তখন তাকে বাড়িমুখো টানছে। তবু কাগজটা নিয়ে একটু পড়ার ভান করলেন। কাগজে চোখ থাকলেও মনে মনে ভাবছিলেন অন্য কথা। ট্রেন থেকে নেমে কি করবেন। বড়জোর দশটা হবে ওয়াটারলু পৌঁছতে। ওখানে পৌঁছেই একলাফে একটা ট্যাক্সি ধরে বাড়িতে আসবেন। বাড়িতে ফিরে স্নান সেরে মাথা আচড়াতে যতটুকু সময় তা দিয়ে সোজা হাজির হবেন হ্যাম্পস্টেডে—জুডিথের ফ্ল্যাটে। ভাবতে ভাবতে কাগজের পাতা দেখতে দেখতে হঠাৎ টনির চোখটা স্থির হয়ে গেল। পরিচিত একটা নাম। মাঝখানের পৃষ্ঠায় নেহাতই একটা বৈশিষ্ট্যহীন খবর।

খবরের কাগজে টনি তখন নিজের মৃত্যু সংবাদ পড়ছিলেন। খবরটা ঠিক এই রকমভাবে লেখা হয়েছে—

"মারকেল হোটেলস লিমিটেডের সত্ত্বাধিকারী, আপার এভিন্যু রোডের সেন্ট জনস উড নিবাসী মিস্টার অ্যান্টনি ডিন মারকেলকে তঁ'র নিজস্ব বাসভবনের শয়নকক্ষে গতকাল রাত্রে গুলিবিদ্ধ ও মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। একটা বুলেট তার মুখের তালু ভেদ করে মস্তিষ্কে ঢুকে গিয়েছিল। ছোট একটা স্বয়ংক্রিয় পিস্তল তার হাতেই পাওয়া যায়। মিস্টার মারকেলের গৃহপরিচারিকা মিসেস রিচই তার দেহটা আবিষ্কার করেন। তিনি...."

আত্মহত্যা।

জাহাজে থাকতে অনুভূতিটা একবার তাকে তাড়া করেছিল ঠিকই তারপর সেটা উবে যায়। কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের তখন টানাপোড়েন চলতে থাকে। আগেই বলেছি ট্রেনের কামরায় খুব অল্প আলো ছিল। যাত্রীও বেশি ছিল না। অনেকেই

ইতিমধ্যে নেমে পড়েছেন। শীতের দিনে লোকের ওঠানামার কোন ব্যস্ততা নেই। টনি তখন কামরায় প্রায় একাই বলা যায়।

অন্ধের মত উঠে দাঁড়ালেন টনি। তারপর করিডোরে যাওয়ার জন্য একটানে কামরার দরজাটা খুলে ফেললেন। তারপর কামরার আলোয় কাগজটা উঁচু করে তুলে ধরে আবার একবার পড়লেন।

না ঃ—ভুল হওয়ার সম্ভাবনা নেই। বর্ণনাটা যথেষ্ট বিষদ সবই তার অতীত আর বর্তমানের কথা।

তার সহোদর হার্লো স্ট্রিটের বিশিষ্ট শল্য চিকিৎসক মিস্টার স্টিফেন মারভেলকে দ্রুত সংবাদটা জানানো হয়। তার প্রেমিকা মিস জুডিথ গেটস...জানা গেছে যে গত সেপ্টেম্বর মাসে মিস্টার মারভেল স্নায়ু বিকলন রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন এবং তখন থেকেই তিনি দীর্ঘ বিশ্রামে ছিলেন, অথচ বিশ্রাম তাকে রোগমুক্ত করতে পারেনি।

ভয়ে ভয়ে তারিখটা দেখলেন টনি। পত্রিকায় সেই দিনেরই তারিখ অর্থাৎ ২৩শে ডিসেম্বর। তার অর্থ হল আটচল্লিশ ঘন্টা আগে তিনি গুলি খেয়ে আত্মহত্যা করেছেন।

এবাব পিছনের পকেটে হাত দিলেন টনি। পিস্তলটা সেখানেই আছে। এবার সে কাগজটা ভাঁজ করলো। ট্রেনের শিস বাজলো, এই শিস 'কুইন অ্যান' জাহাজের শিসটার কথা মনে করিয়ে দিল।

সমস্ত করিডোর নির্জন, শুধু একটি মাত্র মানুষ জানলার বেষ্টনিতে কনুই রেখে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছেন। ট্রেনটা ওয়াটারলুতে আসার আগে পর্যন্ত তার কিছুই মনে হয় নি। কিন্তু করিডোরে দেখা সেই যাত্রীটির সঙ্গে তার মনের একটা মিল, একটা অস্পষ্ট ছাপ, অবচেতন মনের কোন স্মৃতি, কেমন করে যেন মিলেমিশে এক হয়ে গেছে। প্রথমে মনে হয়েছিল লোকটির কাঁধের আকৃতির জন্য বুঝি এই রকম মনে হয়েছে। তারপর টনি বুঝতে পারলেন লোকটা প্রাচীন আমলের বাদামি রঙের ফারের কলার লাগানো লম্বা কোটটা পরে আছে বলে তার অমন মনে হচ্ছে। কিন্তু ওয়াটারলুতে লোকটাকে পাগলের মত ট্রেন থেকে ঝাপিয়ে নামতে দেখে তার মনে পড়লো বৃদ্ধ জিম মারভেলের কথা। মারভেল সবসময় এই ধরনের কলার পড়তেন।

কোনরকমে মালপত্তর গুছিয়ে নিয়ে টনি বাইরে বেরিয়ে এলেন। সেই লোকটা.....ঠিক সেই লোকটা তার আগে হাঁটছিল।

একটা কুলি টনিকে ট্যাক্সি ডেকে দিল। ট্যাক্সির চালককে ঠিকানা জানিয়ে কুলিকে তার পাওনা দিয়ে দরজা বেশ জোরেই বন্ধ করেছিলেন টনি।

ট্যাক্সির ভিতরটা ভীষণ অন্ধকার। এত ছোট মনে হচ্ছিল যেন একটা কফিনের গাড়ি চাদর ঢাকা দিয়ে তাকে নিয়ে যাচ্ছে।

আবার দুই এক মিনিটের জন্য থামলেন হারগ্রিভস। হাঁটুর উপর দস্তানায় মোড়া আঙ্গুলগুলোকে নিয়ে তিনি নাড়াচাড়া করছিলেন। এই প্রথমবার হারগ্রিভসের সঙ্গিনী—মিস জুডিথ গেটস, তাকে বাধা দিয়ে বললেন, আচ্ছা আমার কথাটা একটু শুনবেন, প্লিজ।

—কি বলুন।

—টনিকে যিনি অনুসরণ করছিলেন, জুডিথ কোন রকমে বললেন—আপনি নিশ্চয় আমাকে একথা বলছেন না যে তিনি—

—তিনি কি?

—মৃত।

—আমি জানি না তিনি কে? অপলক চোখে হারগ্রিভস তাকিয়ে থাকেন মহিলার দিকে। বললেন, শুধু এটুকু জানি যে তার কোটে ফারের কলার ছিল। আমি আপনাকে টনির কাহিনী বলছি, সেটা আমি নিজে বিশ্বাস করি।

—একই কথা। হাত দিয়ে নিজের চোখ দুটো আড়াল করলো জুডিথ।

আপনি যার কথা ভাবছেন উনি সেই ব্যক্তি হলেও কিছু এসে যায় না। জীবিত মৃত কোন অবস্থাতেই—তিনি টনির চারদিকে কোন দুষ্ট প্রভাব বিস্তার করবার চেষ্টা করবেন না। জিম মারভেল টনিকে অসম্ভব ভালবাসতেন। নিজের বিষয় সম্পত্তির প্রতিটি ডলার পর্যন্ত তিনি টনিকে দিয়ে গেছেন, স্টিফেনকে একটি কানাকড়ি পর্যন্ত দেননি। চিরদিনই তিনি টনিকে বলেছেন, তিনি টনির দেখাশুনো করবেন এবং করছেনও ঠিক তাই। বললেন হারগ্রিভস।

—কিন্তু।

—শুনুন। হারগ্রিভস ধীরে ধীরে বললেন, শুধু প্রভাবটার উৎস কিন্তু আপনি এখনও বুঝতে পারেননি। টনি নিজেও তা পারেন নি। তিনি শুধু এটুকু জানতেন, যে একটা ট্যাক্সির অন্ধকার জঠরে বসে তুষার ভেজা পিছল রাস্তা ধরে তার গাড়ি ছুটছে। ভাল বা মন্দ যেই তাকে অনুসরণ করুক না কেন, তিনি সেটা সহ্য করতে পারছিলেন না।...তবু ট্যাক্সিচালক যদি সতর্ক থাকতো তাহলে সবকিছুই হয়ত ভালভাবেই শেষ হত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ট্যাক্সির চালক একটু অসাবধানী হওয়ায়, আপার এভিন্যু রোড যেতে মাত্র দুশো গজ দূরে যখন, ঠিক তখনই সে প্রচন্ড গতিতে বাঁক নেবার চেষ্টা করে। সঙ্গে সঙ্গে চাকা হড়কে যায়। টনি একটা দোলানি অনুভব করে। কালো রঙের একটা কাঠের গুঁড়িতে গিয়ে ট্যাক্সিটা ধাক্কা মারে। কাঠের টুকরো চারদিকে ছড়িয়ে যায়। দাঁড়িয়ে পড়ে অচল হয় গাড়িটা।

ট্যাক্সিচালক চিৎকার করে জানালো—বাঁক না নিয়ে আমার কোন উপায় ছিল না। ফারের কলার পরা একটা বুড়ো ভদ্রলোক একবারে হঠাৎ সামনে এসে পড়ায়—।

অগত্যা টনিকে পায়ে হেঁটেই বাড়িতে ফিরতে হয়েছিল। পাঁচ সাত পা হাঁটার পরেই সে বুঝতে পারছিল, কেউ একজন তাকে অনুসরণ করছে। দুশো গজের দূরত্ব, শুনলে খুব একটা বেশি বলে মনে হয় না, তবু টনির কাছে দূরত্বটা অনেক বলে মনে হচ্ছিল। প্রথমে ডান দিকে বাঁক, তারপর প্রথম বাঁ দিকে, তারপর তার বাড়ি। অথচ এই সামান্য রাস্তাটা টনির কাছে সীমাহীন বলে মনে হচ্ছিল। ট্যাক্সি চালককে টনি ছেড়ে দিয়ে আসতে চাইছিল না। আর ট্যাক্সি চালক মনে করেছিল, উনি তার সততায় সন্দেহ করেছেন, ভাবছেন গাড়ির চাকা সারানো হলে সে মালপত্রগুলো পৌঁছে দেবে না। কিন্তু আসল কারণটা তা নয়।

রাস্তার প্রথম অংশটা টনি জোর কদমে চললেন। অনুসরণরত মানুষটিও তার সঙ্গে সমান ভাবে পাল্লা দিয়ে একই তালে হেঁটে চললো। রাস্তার আলোয় টনি লোকটার কোটের ভিজে ফারের কলারটিই শুধু দেখতে পাচ্ছিল, তাছাড়া আর সে কিছু দেখতে পাচ্ছিল না। টনি তখন হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিলেন। যাকে বলে দৌড়তে লাগলেন। অনুসরণরত লোকটিও ঠিক একইভাবে তাকে অনুসরণ করে চললো।

একমাত্র যে কথাটা তার মনে হচ্ছিল, তা হল, ওকে কিছুতেই পরিচিত হতে দেওয়া চলে না—কারণ তাহলেই সর্বনাশ।

পিছনের মানুষটার সঙ্গে টনির দূরত্ব কমে আসছিল। তুষারে গোটা রাস্তাটা ভিজে প্যাচ প্যাচ করছে। একটু ছুটেই রাস্তার পরিচিত বাঁকটা দেখতে পেলেন তিনি। কাছেই নিচু পাথরের দেয়াল, ওধারে তার বাড়ির সামনের দিককার বাগান। সমস্ত বাড়িটা তখন অন্ধকার। পকেট থেকে বরফের মত ঠাণ্ডা চাবিগুলো বার করলেন টনি। কিন্তু হাত পিছলে গেল। অন্ধকারের মধ্যেই হাতড়ে হাতড়ে চাবিটা খুঁজতে লাগলেন টনি আর সেই মুহূর্তে কে যেন সদর দরজা খুলে ভিতরে গিয়ে ঢুকলো। বাস্তবিক টনি দরজা খোলার ক্যাচক্যাচ শব্দটা শুনতে পেয়েছিল। যাই হোক টনি চাবির গোছাটা খুঁজে পেলেন এবং অলৌকিকভাবে তালাটারও সন্ধান পেলেন তারপর সোজা এলেন অন্দরমহলে।

কিন্তু অনেক দেরি করে ফেলেছিলেন টনি। কারণ পিছনের লোকটা ততক্ষণে সামনের সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে শুরু করেছে। টনি বলেছেন, অত কাছ থেকে রাস্তার আলোয় তার ফারের কলার আর বেশি ভিজে এবং পোকায় কাটা বলে মনে হয়েছিল। শুধু এটুকু বর্ণনা উনি দিতে পেরেছেন। যাইহোক তখন খোলা অন্ধকার হলঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে প্রথমে মনে করতে পাচ্ছিলেন না সুইচটা ঠিক কোথায়।

অন্য মানুষটা তখন ভিতরে ঢুকেছে।

টনির মনে পড়লো, তার পিছনের পকেটে এখনও সেই অস্ত্রটা আছে, যেটা

নিয়ে তিনি তামাম দুনিয়া বয়ে বেড়িয়েছেন। পকেট থেকে বার করতে গিয়ে সেটা আবার গালিচায় ছিটকে পড়লো। আগন্তুক তখন ছ'ফুট দূরত্বের মধ্য এসে পড়েছিল বলে টনি আর অনড় না থেকে দ্রুত পায়ে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে শুরু করলেন। সিঁড়ির মাথায় পৌছে একবার ঝুঁকি নিয়ে নিচের দিকে তাকালেন। আগন্তুকও তখন থমকে দাঁড়িয়েছে। সামনে খোলা দরজা দিয়ে ভিতরে আসা হালকা নীলাভ আলোয় টনি দেখলেন গালচে থেকে পিস্তলটা কুড়িয়ে নেবার জন্য সে নিচের দিকে ঝুঁকে রয়েছে।

দ্রুত বোতাম টিপে হলঘরের আলো জ্বাললেন টনি। চিৎকার করে কিছু একটা বললেন। তারপর নিজের শোবার ঘরের দরজা খুলে আরো একটা আলো জ্বাললেন। দুটো আলো জ্বালার পর বিছানার দিকে চোখ পড়লো তার—সেখানে কেউ একজন শুয়ে আছে বলে মনে হল।

বিছানায় শুয়ে থাকা মানুষটা কিন্তু আলো জ্বালা এবং চিৎকার করা সত্ত্বেও উঠে বসেনি। একটা চাদর দিয়ে তার আপাদমস্তক চাপা ছিল। আবরণের আড়াল থেকে বোঝা যায় লোকটির চেহারা নিতান্তই জীর্ণ আর শীর্ণ। টনি মারভেল তখন যা করলেন তা সম্ভবত তার জীবনের সবচেয়ে দুঃসাহসিক কাজ বলা যায়। এগিয়ে গিয়ে তিনি চাদরের ওপর দিকটা টেনে সরিয়ে দিলেন। তারপরেই চমকে উঠলেন। দেখলেন ঠিক তার নিজের মুখ, মনে হল তিনি যেন মৃত মুখ নিয়ে শূন্য দৃষ্টিতে বিছানায় শুয়ে উপরের দিকে তাকিয়ে আছেন।

আঘাত—না আঘাত বলবো না বরং একটা আতঙ্ক। কারণ ওই মৃত মানুষটা নিঃসন্দেহে বাস্তব—তাঁর নিজের মত ও-ও একটা রক্তমাংসের মানুষ। লোকটাকে দেখতে অবিকল টনির মত। লোকটা কোন অলীক স্বপ্নের নয়, মায়া বা কল্পনার নয় একেবারে বাস্তব। এবং তার অর্থ হল প্রতারণা এবং জুয়াচুরি।

ঘরের বাইরে থেকে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এলো—তাহলে তুমি বেঁচে আছো? টনি প্রশ্নটা শুনে ঘুরে তাকালেন। দেখলেন ভাই স্টিফেন দোরগোড়ায় তার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। স্টিফেনের পরণে তাড়াহুড়ো করে জড়িয়ে আসা একটা লাল রঙের বহির্বাস, চুলগুলো এলোমেলো, মুখে ভাঁজ পড়া একটা বয়স্ক মানুষের ছাপ।

স্টিফেন চিৎকার করে বললে, আমি এ কাজ করতে চাইনি।

ঠিকমতো বুঝতে না পারলেও টনি অনুভব করলেন কথাগুলো কোন অপরাধীর স্বীকারোক্তি।

এরপর যা শোনা গেল—স্টিফেন বললেন—জাহাজে আমি সত্যি সত্যি তোমাকে খুন করতে চাইনি। তুমি নিশ্চয় জানো যে আমি তোমাকে আঘাত করতে পারতাম না, তাই না?

শোনো—স্টিফেন তখন বহির্বাসটা গায়ে জড়িয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিল। কি কারণে সে দ্রুত মুখ ঘুরিয়ে পিছনের হলঘরের দিকে তাকালো, টনি তা জানে না। হয়ত পেছনে সে কোন শব্দ শুনতে পেয়েছিল। কিংবা হয়ত কিছু একটা দেখেছিল। তারপরেই সে আর্তকণ্ঠে চিৎকার করতে শুরু করলো।

টনি আর কিছু দেখতে পায়নি, কারণ হলঘরের আলোটা তখন নিভে গিয়েছিল। আতঙ্কটা ফের এসে হাজির হয়েছিল তার পিছনে। তিনি নড়াচড়া পর্যন্ত করতে পারলেন না। কারণ একটা হাত তিনি দেখতে পেলেন। ঠিক হাত নয়, বলতে গেলে হাতের একটা ঝটকানি। বাইরের অন্ধকার থেকে হাতটা তীর বেগে বেরিয়ে এসে শোবার ঘরের দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিল। তারপর বাইরে থেকে চাবি দিয়ে ঘরের মধ্যে টনিকে বন্দী করে ফেললো। হাতটা স্টিফেনকে ঘরে ঢুকতে না দিয়ে বাইরে হলঘরের দিকে ছিটকে দিয়েছিল। তারপর শোনা গেল স্টিফেনের আর্তকণ্ঠের চিৎকার।

টনিকে যে চাবি বন্ধ করে রাখা হয়েছিল, সেটা অবশ্যই ভালই হয়েছিল। তা না হলে বেচারা টনিকে পুলিশি ঝামেলায় পড়তে হত।

অবশিষ্ট যা প্রমাণাদি পাওয়া গেছে তা বাড়ির তত্ত্বাবধায়িকা মিসেস রিচের কাছ থেকে। দোতলার হলঘরের শেষ প্রান্তে স্টিফেনের পাশেই ওর ঘর। চিৎকারের শব্দ শুনে ওর ঘুম ভেঙে যায়।

মিসেস রিচের মনে হল চাপা গোঙানি আর ঘনঘন নিশ্বাস পড়ার শব্দটা ওর ঘরের দরজা পেরিয়ে স্টিফেনের ঘরের দিক থেকে আসছে। তাই তিনি স্টিফেনের ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন। বিছানা থেকে শেষে ওর ঘরের দিকে পা বাড়াবার সময় টনি স্টিফেনের ঘরের দরজা বন্ধ হবার শব্দ পেলেন। এবং বাইরে বেরিয়ে এসে আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে দ্বিতীয়বার পিস্তলের গুলির শব্দ শুনতে পেলেন।

করোনারের আদালতে মিসেস রিচ এই বলে বিবৃতি পেশ করেছেন যে গুলিটা ছোঁড়ার পর কেউই স্টিফেনের ঘর থেকে বেরিয়ে আসেনি বা বেরুতেই পারত না। কারণ যথেষ্ট সাহস করে তিনি দরজাটা খোলার আগে পর্যন্ত উনি এক দৃষ্টিতে ওই দরজার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। দরজাটা যখন খুললেন তখন সব শেষ। খুব কাছ থেকে স্টিফেনের কপালের ডানদিকে গুলি করা হয়েছিল। গুলিটা সম্ভবত সে নিজেই ছুঁড়েছিল, কারণ রক্তের ছোপ লাগানো বিছানার চাদরের ভাজ থেকেই আবিষ্কার করা হয়েছিল অস্ত্রটা। ঘরের মধ্যে অন্য কোন প্রাণী ছিল না। সবকটা জানলা পর্যন্ত বন্ধ ছিল। আর একটা বিচিত্র জিনিস মিসেস রিচ খেয়াল করেছিলেন, তা হচ্ছে ঘরের মধ্যে নরম কাপড় আর ভেজা কাপড়ের একটা তীব্র অরুচিকর গন্ধ।

হারগ্রিভস আবার স্তব্ধ হয়ে গেলেন। মনে হচ্ছিল তিনি কাহিনীর সমাপ্তিতে পৌঁছে গেছেন। বহিরাগত কেউ থাকলে হয়ত এ কথাই সে মনে করতে পারতো, কারণ বর্ণনা ছিল অত্যন্ত আতঙ্কময়। তার উল্টোদিকে বসে থাকা মেয়েটি দু'হাত দিয়ে নিজের চোখ দুটো চেপে রেখেছিল। হারগ্রিভস নিজের কাজ সম্পর্কে অবগত ছিলেন।

—তাহলে? হারগ্রিভস শান্ত কণ্ঠে বললেন, তাহলে ঘটনার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা আপনি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন—তাই নয় কি?

চোখ থেকে হাত সরিয়ে জুডিথ বললেন—ব্যাখ্যা?

—হ্যাঁ। স্বাভাবিক ব্যাখ্যা। পুনরাবৃত্তি করলেন হারগ্রিভস। ভয় নেই, টনি পাগল নয়। মস্তিষ্কের বিক্ষোভ বা চকিত অন্ধকার তার মধ্যে কোন দিন আসেনি—ওগুলো ছিল তার কল্পনামাত্র। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে ছিল স্টিফেনের সুচতুর পরিকল্পনা। যে ভাবে ব্যাপারটা সাজিয়েছিল, তা ছিল অত্যন্ত নিখুঁত—তবু সেটা ভেস্তে গিয়েছিল। যদি সেটা সফল হত তাহলে স্টিফেন অতি নিখুঁতভাবে একটা হত্যাকাণ্ড সেরে ফেলতে পারতো। জুডিথের মুখে একটা আশার ঝিলিক খেলে গেল। সেটা লক্ষ্য করে হারগ্রিভস বললেন, আসুন আট মাস পিছিয়ে গিয়ে ঘটনাটা আমরা একবার গোড়া থেকে শুরু করি।

হারগ্রিভস বলতে থাকলেন, টনি একজন প্রচুর সম্পদশালী যুবা। অন্যদিকে বিশিষ্ট ব্যক্তি স্টিফেন ধার দেনায় জর্জরিত। প্রায় তার দেউলিয়া হওয়ার মত অবস্থা। টনি যদি মারা যায়, তাহলে স্টিফেনই হবেন সমস্ত সম্পত্তির মালিক। কাজেই স্টিফেন স্থির করলো টনিকে মারতে হবে। এমন ভাবে মারতে হবে যেন কোন পুলিশি হুজ্জুত তাকে সামলাতে না হয়। আজ থেকে আট মাস আগে আচমকা সে আবিষ্কার করলো এমন একজনকে, যাকে অবিকল টনির মত দেখতে। তখন স্টিফেন সেন্ট জুডস হাসপাতালে বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করতো। একদিন সে রূপার্ট হেজ নামে একজন ভাঙাচোরা চেহারার মানুষকে আবিষ্কার করলো। ঠিক করলো নিজেকে সন্দেহের উর্ধ্বে রেখে এই হেজকে দিয়েই তাকে কাজটা হাসিল করতে হবে। কথায় বলে পৃথিবীতে ঠিক একই রকম দেখতে দুটি করে মানুষ আছে। হেজের সঙ্গে টনির সামান্যতম অমিল ছিল না। সত্যি কথা বলতে কি তার সঙ্গে টনির এমন সাংঘাতিক সব মিল দেখে স্টিফেন আঁতকে উঠেছিল। লোকটি তখন ক্ষয় রোগে ভুগছে। তার আয়ু বড় জোর সাত আট মাস হবে। লোকটি এসব জানতো। স্টিফেন তখন তাকে নিজের পরিকল্পনার কথা বলে। লোকটিও মৃত্যুর আগে একটু সুখে থাকার আশায় রাজি হয়ে যায়।

স্থির হল টনিকে গোটা পৃথিবীটা ঘুরে আসার জন্য নির্দেশ দেওয়া হবে এবং তাকে জাহাজ ছাড়ার দিনই কথাটা বলা হল। ঠিক ছিল ওই একই জাহাজে পকেটে

পিস্তল নিয়ে হেজ অপেক্ষা করবে। স্টিফেন বা অন্য বন্ধুবান্ধবেরা সুবিধে মত জাহাজ ছেড়ে নেমে আসার পর হেজ তাকে অন্ধকার বোট ডেকে এগিয়ে যাওয়ার প্ররোচনা যোগাবে এবং পরে সেখানে নিয়ে গিয়ে টনির মাথায় গুলি করে হেজ তার দেহটা জলে ফেলে দেবে।

আসলে ওই রকম একটা বড় জাহাজে এই ধরনের হত্যার পক্ষে নিখুঁত স্থান নির্বাচন। যাত্রীরা আসলে সকলেই যে যার নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। আর ওদিকে জলে পড়ার পর আপনার শিকারটির কি অবস্থা হবে? প্রথমে তলিয়ে যাবে তারপর সে চালক পাখার ভয়ঙ্কর খপ্পরে পড়ে একবারে বিকৃত হয়ে যাবে, তাকে আর চেনাই যাবে না। দেহটা আবিষ্কার করার পর স্বনাক্ত করা কঠিন হবে। আর ইতিমধ্যে হেজের কাজ হবে তত্ত্বাবধায়কের কাছে গিয়ে টনির মালপত্তরগুলো জাহাজ থেকে নামিয়ে দেবার নির্দেশ জানানো। সে বলবে, শেষ মুহূর্তে সে যাত্রা বাতিল করে দিচ্ছে। তারপর টনিকে খুন করে নেমে আসবে জাহাজ থেকে।

মেয়েটি অস্ফুট স্বরে আর্তনাদ করে উঠলো।

—তাহলে বুঝতেই পারছেন, হেজ জাহাজ থেকে নেমে আসবে এমন ভাবে যেন সেই টনি। বন্ধুবান্ধবদের বলবে, সে যাত্রাটা বাতিল করে দিয়েছে।

এরপর ভদ্রলোক যে কটাদিন বাঁচবেন তিনি টনির ভূমিকায় অভিনয় করবেন। বলা হবে তিনি খুবই অসুস্থ—আপনি তার প্রেমিকা—আপনার সঙ্গেও তার সাক্ষাৎ হবে না। কারণ যদি সে বেফাঁস কিছু বলে ফেলে। এদিকে চাউর করা হবে তার মাথাটা ঠিক নয়। অত্যন্ত কাজের চাপে তার স্নায়ুর রোগ হয়েছে।

মতলবটা চমৎকার ফেঁদেছিলেন স্টিফেন। খুন? খুন বলতে আপনি কি বলতে চাইছেন মশাই? ডাক্তাররা যত ইচ্ছে পরীক্ষা করে দেখুক না, পুলিশ যা খুশি বলুক, স্টিফেনকে কেউ ধরা ছোঁয়ার মধ্যে পাবে না। স্টিফেন মারভেল সম্পূর্ণ নিরাপদ। কারণ বিছানায় শুয়ে থাকা হতভাগ্য যে টনির অভিনয় করছে, তার মৃত্যু ঘটবে স্বাভাবিক নিয়মে।

কিন্তু ঘটনাটা গোলমাল হয়ে গেল। খুনের মানসিকতা হেজের ছিল না। লোক হিসেবে তিনি ছিলেন খুব ভাল। কাজটা করবেন বলে তিনি স্টিফেনকে কথা দিয়েছিলেন, কিন্তু পারলেন না। পিস্তলটা ফেলে দিয়ে জাহাজ থেকে নেমে গেলেন। আর স্টিফেনকে বললেন, তার কাজ শেষ। আসলে একটা বছর সুন্দর ভাবে বাঁচার ইচ্ছেটা হেজ ছাড়তে পারেন নি। একেকটা করে মাস কাটছিল, সে তো বিষণ্ণ হয়ে যাচ্ছিল। কারণ একমাত্র সেই জানে টনি মারা যায় নি। ব্যাপারটা প্রকাশ হয়ে যাবে—টনি যেদিন ফিরে আসবে বলে তার মনে হয়েছিল,তার এক সপ্তাহ আগেই সে সত্য ঘটনার মুখোমুখি হওয়ার বদলে একটা লম্বা চিঠি লিখে পুলিশের কাছে সব জানিয়ে যায় এবং পরে নিজেকে গুলি করে হত্যা করে।

এই পর্যন্ত বলে হারগ্রিভস বললেন, আমার ধারণা টনির সম্পর্কে সমস্ত কিছুই আপনাকে গুছিয়ে বলা হল।

জুডিথের ঠোঁট জোড়া কাঁপছিল। সে শুধু বললে হে ভগবান, আমার ভয় ছিল...

—হ্যাঁ, হারগ্রিভস বললেন, আমি তা জানি।

—তবে এতেও কিন্তু সবকিছু বোঝা গেল না। ওই...

—আমি তো বলেছি টনি সম্পর্কে সবকিছু বুঝিয়ে বলা হয়েছে। শুধু যেটা নিয়ে আপনার মাথা ঘামানোর প্রয়োজন তা হলো টনি মুক্ত। আপনিও মুক্ত। আর স্টিফেন মারভেলের মৃত্যুটা আত্মহত্যার ঘটনা—সরকারি নথিপত্রে তাই লেখা আছে।

এবার জুডিথ চিৎকার করে বললেন, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না। এটা একেবারে অসম্ভব ব্যাপার। আমি কোনদিন স্টিফেনকে পছন্দ করতাম না। আমি চিরদিন জানতাম ও টনিকে ঘৃণা করে। ওর নিজের কীর্তিকলাপ প্রকাশ হয়ে পড়লেও আত্মহত্যা করার মত মানুষ সে নয়। আসলে আতঙ্কের ব্যাপারটাই যে আপনি ব্যাখ্যা করেননি, তা কি বুঝতে পারছেন না। এই ব্যাপারে আমার যা ধারণা আপনারও তাই ধারণা কিনা সেটা তো আমায় জানতে হবে। বাদামি রঙের ফারের কলার পরা সেই লোকটি কে? কে সেদিন রাত্রে টনিকে বাড়ি পর্যন্ত অনুসরণ করে এসেছিল? শয়তানের প্রভাব থেকে ওকে সরিয়ে রাখার জন্য কে সর্বক্ষণ ওর কাছে কাছে ছিল? কে ওর সেই অভিভাবক? প্রতিহিংসা নেবার জন্য কে গুলি করেছিল স্টিফেনকে।

স্যার চার্লস হারগ্রিভস ঠিক ঠিক করে জ্বলন্ত গ্যাসের আগুনের দিকে চোখ রেখে কি যেন ভাবলেন। অনেকক্ষণ নীরব থাকার পর তিনি শুধু বললেন—আপনি আমাকে বলুন না তিনি কে হতে পারেন?

ডেড ওক ইন এ ডার্ক উডস

হাল এলসন

আবার সেই ফোন।

কোন স্বাভাবিক মানুষ এইভাবে কাউকে ফোন করতে পারে না। এটা নিছক একটা খেলা। একেক ধরনের মানুষ আছে না, যাদের মাথায় মাঝে মাঝেই উদ্ভট সব পরিকল্পনা আসে, এ হলো এই রকম কোন এক ধরনের বাতিকগ্রস্ত লোকের কাজ। তা না হলে কেউ এভাবে ফোন করে।

—না এবার ফোনটা বাজলেও, তুললো না—কিছুতেই তুললো না। জানি ফোনটা তুললেই ভদ্রলোক কি বলবেন। সেই এক কথা। কে মশাই নিজের স্ত্রীর কেচ্ছা শুনতে চায়—একি শুনতে ভাল লাগে কারোর। ভারি অদ্ভুত! সেই এক কথা ভদ্রলোক রোজ বলবেন। আমার স্ত্রী, তিনি নাকি আমার অবর্তমানে কোন এক প্রতিবেশির সঙ্গে প্রণয়ে লিপ্ত থাকেন।

ঠিক ঘড়িতে এগারোটা বাজলো।

প্রতিদিনের মত ফোনটা বাজলো। ধরবো না ধরবো না করেও শেষ পর্যন্ত ফোনটা তুললেন জন।

—হ্যালো।

জন, আমি আপনার স্ত্রীর কথা বলছিলাম। যদিও জানি আমার ঠিক এসব ব্যাপার নিয়ে কিছু বলা উচিত নয়, তবু আমি না বলে থাকতে পারি না। চোখের উপর আপনার মত একজন ভালমানুষকে তার স্ত্রী ঠকাবেন এটা ঠিক মানতে মন চায় না।

—আপনি কে কথা বলছেন?

—আচ্ছা তা জেনে কোন দরকার নেই। শুধু এইটুকু বলতে পারি আমি আপনার একজন শুভাকাঙ্ক্ষী। তা ছাড়া প্রতিবেশি হিসাবে আমার মনে হয়েছে আপনাকে আমার সতর্ক করার দরকার তাই করলাম।

—আপনার নামটা জানাতে অসুবিধা কোথায়?

—সুবিধারও কিছু নেই। বরং প্রতিবেশিদের মধ্যে তিক্ততা বাড়বে। আপনি আমার নাম শুনে তাকে গিয়ে আমার নাম করে ধরবেন। তারপর গোটা অঞ্চল জুড়ে হুজ্জুতি হবে। ছিঃ-ছিঃ মশাই এসব আমার একদম ভাল লাগে না। ব্যাপারটা

সবাই জেনে যাক, এটা আমি চাই না বলেই আমি গোপনে আপনাকে জানাচ্ছি।

—ঠিক আছে আপনি আপনার নাম নাই বা বললেন, যে লোকটি আমার অবর্তমানে আমার স্ত্রীর কাছে আসে, তার নামটা শুনতে পারি তো?

—না মশাই তিনিও আমার একজন প্রতিবেশি।

—প্রতিবেশি। কিন্তু তার তো একটা নাম আছে।

—উহু, তা বলতে পারবো না। আমার শুধু আপনাকে সাবধান করার দরকার বলে মনে হয়েছে তাই আপনাকে ফোন করে জানালাম।

জন ভীষণ চটে গেল এবার, বললেন—তাতে আমার কি লাভ হল। আপনি নিজের নাম বলছেন না, এমন কি যার সঙ্গে আমার স্ত্রীর গোপন মেলামেশা তার নামটাও বলছেন না, তাতে আমার কি লাভ হবে।

—নজর রাখবেন। নিজে নজর রাখলে সব ধরতে পারবেন, বুঝতে পারবেন।

জন রেগে গিয়ে বললেন—আপনি এত কথা জানলেন কি করে?

—কি করে, আমার দুটো চোখ আছে তাই আমি দেখতে পাই। এই তো গত বৃহস্পতিবার আপনার স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে সে চুমু খাচ্ছিল। ইস্ কি বিশ্রিভাবে জড়িয়ে ধরেছিল দুজন দুজনকে। খোলা জানলা দিয়ে দেখা যায় কি না।

—শুনুন এসব কথা শুনতে আমার একদম ভাল লাগছে না।

—জানি, এমন সব কথা কোন পুরুষ সহ্য করতে পারে না। আমি হলেও চটে যেতাম। তবু যা বাস্তব সত্য, তাকে তো আর এড়িয়ে যেতে পারবো না। একদিন না একদিন আপনার চোখে পড়ে যাবে, তখন ব্যাপারটা গড়িয়ে যাবে অনেকটা দূর। আমি আপনার একজন বিশেষ বন্ধু, তাই আপনাকে একটু সতর্ক করে দিলাম, যাতে বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে বড় ধরনের ধাক্কাটা না খান।

জন ফোনটা নামিয়ে রাখলেন।

কি বিশ্রি উৎপাত শুরু করেছে লোকটা। জানলার সামনে এসে দাঁড়ালো জন। সামনে সার সার বাড়িগুলো দেখা যাচ্ছে। তার মানে এই বাড়িগুলোর ভিতর থেকে কেউ একজন তাকে ফোন করছেন। আবার এই বাড়িগুলোর মধ্যেই আছেন সেই ব্যক্তি যার সঙ্গে তার স্ত্রীর গোপন প্রণয় আছে বলা হচ্ছে।

জন সাধারণতঃ খুব বেশি রাত করেন না। রাত হয় বৃহস্পতি আর শনিবার। এই দুদিন তার কাজের চাপ একটু বেশি থাকে।

শুক্রবার রাতে ভদ্রলোক ফোন করে বলেছিলেন বৃহস্পতিবার কি ঘটেছিল। জন অনেকক্ষণ ভাবতে থাকেন। সত্যি কি ভদ্রলোক যা বলছেন, তা ঠিক। বৃহস্পতিবার দিন জন বাড়ি ফেরার দশ মিনিট আগে সে পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়। সাতটায় সে ঢুকেছিল বাড়িতে। শয়নকক্ষে ছিল প্রায় আড়াই ঘণ্টা, ছিঃ—ছিঃ ভাবতে গিয়ে কান দুটো গরম হয়ে ওঠে। গলাটা শুকিয়ে যায়। জল খায়।

ঠিক করলেন শনিবার একটা হেস্তনেস্ত করবেন।

সাধারণত শনিবার বাড়ি আসতে জনের দশটা হয়।

ঐদিন তিনি চলে এলেন ঠিক নটায়। বাড়ির কাছে এসে উল্টোদিকে গাড়িটা অন্ধকারে দাঁড় করিয়ে নজর রাখলেন নিজের বাড়ির উপর। দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা করেও তিনি বাড়ি থেকে কাউকে বেরুতে দেখলেন না। শেষে নিজের কাছে নিজেকেই তার অপরাধী বলে মনে হচ্ছিল অকারণে স্ত্রী গ্রেসকে সন্দেহ করার জন্য। বাড়িতে ঢুকে দেখলেন, তার স্ত্রী দূরদর্শনে একটা ছবি দেখছিল।

জনকে বললে, তুমি যেন আজ একটু আগে এসে গেছ।

জন তার পাশ ঘেঁষে বসলেন। মনে মনে লজ্জিত হচ্ছিলেন। তার স্ত্রীর প্রতি অকারণ সন্দেহের জন্য রাগ হচ্ছিল ওই লোকটির প্রতি।

ঠিক এগারোটা আবার দূরভাষটা বেজে উঠলো।

গ্রেস গিয়ে টেলিফোনটা ধরতেই, ওটা কেটে গেল।

বোঝা গেল গ্রেসের গলা পেয়ে কেটে দেওয়া হল।

গ্রেস বিরক্ত হয়ে বললে, আবার সেই ধরনের ফোন।

কি যে বিচ্ছিরি লাগে আমার। ফোনটা ধরলেই কেটে দেয়। যেন একটা খেলা করে। আচ্ছা, আমরা কি এই ব্যাপারে কিছু করতে পারি না।

জন বললেন, কিছু করার নেই। আর এসব নিয়ে ভাববারও দরকার নেই। ছেলে ছোকরা'রা এসব করতে ভালবাসে।

জনের কথায় গ্রেস শান্ত হল। কয়েক মিনিট পরেই গ্রেস শুতে গেল আর জন এসে বসলেন বৈঠকখানায় একটু কাগজটা পড়ার জন্য। সারাটা দিন কাজের মধ্যে থাকায় পত্রিকা ভাল মত পড়া হয় না।

বেশ মন দিয়েই কাগজটা পড়ছিলেন, আবার দূরভাষটা বেজে উঠলো। জন প্রচণ্ড রাগে উঠে গিয়ে টেলিফোনটা ধরলেন। ও পাশ থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে এলো—আজ রাতে তেমন কিছু ঘটেনি। আজ আপনার স্ত্রীর বন্ধুটির অন্য এক জায়গায় নিমন্ত্রণ ছিল। তাই আসেনি। তবে আজ আসেনি বলে ভাববেন না যে সে আর আসবে না। সে ঠিক আসবে। আজ যেমন আপনি তার জন্য অপেক্ষা করেছিলেন—এই ভাবে অপেক্ষা করবেন—ঠিক দেখা পেয়ে যাবেন।

—তার মানে আপনি আমাকে দেখেছেন?

—বারে দেখেছি বইকি। আমার জানলা দিয়ে সব দেখা যায়। যাক এখন অনেক রাত হল, শুয়ে পড়ুন। শুভ রাত্রি।

জন নামিয়ে রাখলেন রিসিভার। আশ্চর্য লোকটা তার মানে ভীষণ ভাবে নজর রাখে। কে হতে পারে এই প্রতিবেশি ভদ্রলোক যিনি ফোন করেন? আর কে হতে পারে সেই লোক, যিনি গোপনে আমার স্ত্রীর সঙ্গে প্রেম করেন।

একটা মিথ্যে নিয়ে নিশ্চয় কেউ এইভাবে রসিকতা করতে পারে না। ভদ্রলোক নিশ্চয় কিছু দেখেছেন মানে সন্দেহজনক কিছু। এতদিন যা যা বলেছেন তা যদি সত্যি হয় তাহলে নিজের স্ত্রীর প্রতি বিশ্বাস রাখাটা তার দায় হয়ে উঠবে। মনের মধ্যে আবার নতুন করে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। গ্রেস কি সত্যি কোন প্রতিবেশিকে ভালবাসে! জনের অবর্তমানে সে এখানে আসে? তার ঘরে বসে তার স্ত্রীকে নিয়ে যা খুশি তাই করে। অবশ্যই স্ত্রীর আপত্তি নিশ্চয় থাকে না। ভদ্রলোক বলেছেন, যার সঙ্গে আমার স্ত্রীর প্রণয় আছে, তাকে নাকি জন খুব ভাল চেনেন।

ঠিক আছে দেখাই যাক। শনিবারে আসেনি। ভদ্রলোকের কথা যদি ঠিক হয় যে আজ তার অন্যত্র নিমন্ত্রণ ছিল বলে আসতে পারেনি, তাহলে আগামী বৃহস্পতিবার নিশ্চয় সে আসবে।

অবশেষে বৃহস্পতিবার দিনটা এলো।

শনিবারের মত বাড়ির উল্টোদিকে অন্ধকারে গাড়িটা থামিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন জন।

প্রচণ্ড উত্তেজনা বোধ করছিলেন। মনে মনে ভাবছিলেন আজ একটা কিছু নিশ্চয় ঘটবে। আজ রাত্রে একজন মানুষ তার হাতে খুন হবে।

কিন্তু কাকে খুন করবেন জন? যদি জানা যেত লোকটি কে তাহলে ব্যাপারটা অনেক সহজ হত। ঠিক আছে...

দেখাই যাক না, কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। এতটা সময় অপেক্ষা করা গেল, তখন আর একটু দেখতে দোষ কোথায়। ঘড়ির কাঁটা ঘুরে যায়। তবে কি আজও কিছু ঘটবে না। শনিবারের মতই তাকে নিরাশ হতে হবে। যদি তাই হয় তাহলে যে লোকটি তার জানলা দিয়ে সব কিছু দেখতে পায় তাকে আজ যাচ্ছেতাই ভাবে কিছু বাজে কথা শুনিয়ে দিতে হবে।

হঠাৎ করে আচমকা দরজা খোলার শব্দ হল। রাস্তার উল্টোদিকে অন্ধকারে একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে জন। দেখতে পেল তার বাড়ির সিঁড়ি বেয়ে একজন লোক নিচে নেমে আসছে। ছায়ার আড়াল থেকে ঠিক ভাল বোঝা যাচ্ছে না। একটু আলোতে আসতেই জন চিনতে পারলো।

জর্জ।

থমকে দাঁড়ালো লোকটি। চারদিকে তাকালো। জন আবার তাকে ডাকলো। জর্জ সরাসরি তার দিকে তাকালো। কিন্তু একটু যেন ইতস্তত করছিল। তারপর রাস্তাটা পার হয়ে চলে এলো জনের সামনে।

—তো তুমি, এখানে, কি ব্যাপার?

জর্জের দিকে তাকিয়ে রইলেন জন। কোন কথা বললেন না।

এই জর্জ তার সবচেয়ে নিকটতম বন্ধু। শেষে কি না সে তার স্ত্রীর সঙ্গে—

ভাবতে গিয়ে একরাশ রক্ত যেন মাথায় লাফিয়ে উঠে বিদ্যুতের মত তরঙ্গ ছড়িয়ে দিল।

—কি বলছো জন।

—গাড়িতে ওঠো।

—কেন?

—কোন জবাব আমি তোমায় দেব না, আমি যা বলছি তাই করো।

—কি করতে হবে?

—বললাম তো গাড়িতে উঠে বসো। তারপর পকেট থেকে পিস্তলটা বার করে দৃঢ়কণ্ঠে বললেন—চালকের আসনে গিয়ে বসো। দরজা খুলে স্টিয়ারিংয়ের সামনে গিয়ে বসলো জর্জ। পিছনে বসলেন জন। হাতের পিস্তলটা ধরা জর্জকে লক্ষ্য করে।

—নাও এবার চালাও।

—কোথায় যেতে হবে? জর্জ ফ্যাসফ্যাসে গলায় প্রশ্ন করলো। মনে হল গলায় যেন অনেক দিনের পুরনো কফ্ জমে আছে।

—তা আমি জানি না, তবে তুমি চালাতে থাকো।

—আমি...কিছু বলার চেষ্টা করলো জর্জ। কিন্তু দেখতে পেল পিস্তলটা কানের পাশে রগ ছুঁয়ে আছে।

রাস্তাটা কি অসম্ভব অন্ধকার। নির্জন। একটা মানুষজন পর্যন্ত নেই। মনে হচ্ছে অন্ধকার এক গহ্বরের মধ্যে দিয়ে যেন সে গাড়িটাকে নিয়ে ছুটে চলেছে। চিৎকার করে কাউকে সে কিছু বলবে এমন কোন উপায় নেই।

একসময় জর্জ প্রশ্ন করলো—আমরা কোথায় চলেছি?

—জিজ্ঞাসা করে কোন লাভ নেই। শুধু যেখানে থামতে বলবো সেখানে গাড়িটা দাঁড় করাবে।

উফ্ কি প্রচণ্ড একটা মৃত্যু ভয় তখন জর্জকে ঘিরে ধরেছে। সমস্ত শরীরটা ঘামছে। চারদিকে কোন আলো নেই। চিৎকার করলেও কেউ এখানে বাঁচাতে আসবে না। সামনে বিশাল বনভূমি।

—এখানে থামো। জন বললেন।

জর্জ ব্রেক করলো। গাড়ি থেকে নেমে উল্টোদিকের দরজার সামনে দাঁড়ালেন জন। বললেন কঠিন গলায়।

—বেরিয়ে এসো।

—তুমি এভাবে কথা বলছো কেন জন?

—কোন কথা না, কোন প্রশ্ন না। শুধু যা বলছি তাই করো। গাড়ি থেকে নামলো জর্জ।

একটা মিথ্যে নিয়ে নিশ্চয় কেউ এইভাবে রসিকতা করতে পারে না। ভদ্রলোক নিশ্চয় কিছু দেখেছেন মানে সন্দেহজনক কিছু। এতদিন যা যা বলেছেন তা যদি সত্যি হয় তাহলে নিজের স্ত্রীর প্রতি বিশ্বাস রাখাটা তার দায় হয়ে উঠবে। মনের মধ্যে আবার নতুন করে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। গ্রেস কি সত্যি কোন প্রতিবেশিকে ভালবাসে! জনের অবর্তমানে সে এখানে আসে? তার ঘরে বসে তার স্ত্রীকে নিয়ে যা খুশি তাই করে। অবশ্যই স্ত্রীর আপত্তি নিশ্চয় থাকে না। ভদ্রলোক বলেছেন, যার সঙ্গে আমার স্ত্রীর প্রণয় আছে, তাকে নাকি জন খুব ভাল চেনেন।

ঠিক আছে দেখাই যাক। শনিবারে আসেনি। ভদ্রলোকের কথা যদি ঠিক হয় যে আজ তার অন্যত্র নিমন্ত্রণ ছিল বলে আসতে পারেনি, তাহলে আগামী বৃহস্পতিবার নিশ্চয় সে আসবে।

অবশেষে বৃহস্পতিবার দিনটা এলো।

শনিবারের মত বাড়ির উল্টোদিকে অন্ধকারে গাড়িটা থামিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন জন।

প্রচণ্ড উত্তেজনা বোধ করছিলেন। মনে মনে ভাবছিলেন আজ একটা কিছু নিশ্চয় ঘটবে। আজ রাত্রে একজন মানুষ তার হাতে খুন হবে।

কিন্তু কাকে খুন করবেন জন? যদি জানা যেত লোকটি কে তাহলে ব্যাপারটা অনেক সহজ হত। ঠিক আছে...

দেখাই যাক না, কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। এতটা সময় অপেক্ষা করা গেল, তখন আর একটু দেখতে দোষ কোথায়। ঘড়ির কাঁটা ঘুরে যায়। তবে কি আজও কিছু ঘটবে না। শনিবারের মতই তাকে নিরাশ হতে হবে। যদি তাই হয় তাহলে যে লোকটি তার জানলা দিয়ে সব কিছু দেখতে পায় তাকে আজ যাচ্ছেতাই ভাবে কিছু বাজে কথা শুনিয়ে দিতে হবে।

হঠাৎ করে আচমকা দরজা খোলার শব্দ হল। রাস্তার উল্টোদিকে অন্ধকারে একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে জন। দেখতে পেল তার বাড়ির সিঁড়ি বেয়ে একজন লোক নিচে নেমে আসছে। ছায়ার আড়াল থেকে ঠিক ভাল বোঝা যাচ্ছে না। একটু আলোতে আসতেই জন চিনতে পারলো।

জর্জ।

থমকে দাঁড়ালো লোকটি। চারদিকে তাকালো। জন আবার তাকে ডাকলো। জর্জ সরাসরি তার দিকে তাকালো। কিন্তু একটু যেন ইতস্তত করছিল। তারপর রাস্তাটা পার হয়ে চলে এলো জনের সামনে।

—তো তুমি, এখানে, কি ব্যাপার?

জর্জের দিকে তাকিয়ে রইলেন জন। কোন কথা বললেন না।

এই জর্জ তার সবচেয়ে নিকটতম বন্ধু। শেষে কি না সে তার স্ত্রীর সঙ্গে—

ভাবতে গিয়ে একরাশ রক্ত যেন মাথায় লাফিয়ে উঠে বিদ্যুতের মত তরঙ্গ ছড়িয়ে দিল।

—কি বলছো জন।

—গাড়িতে ওঠো।

—কেন?

—কোন জবাব আমি তোমায় দেব না, আমি যা বলছি তাই করো।

—কি করতে হবে?

—বললাম তো গাড়িতে উঠে বসো। তারপর পকেট থেকে পিস্তলটা বার করে দৃঢ়কণ্ঠে বললেন—চালকের আসনে গিয়ে বসো। দরজা খুলে স্টিয়ারিংয়ের সামনে গিয়ে বসলো জর্জ। পিছনে বসলেন জন। হাতের পিস্তলটা ধরা জর্জকে লক্ষ্য করে।

—নাও এবার চালাও।

—কোথায় যেতে হবে? জর্জ ফ্যাসফ্যাসে গলায় প্রশ্ন করলো। মনে হল গলায় যেন অনেক দিনের পুরনো কফ্ জমে আছে।

—তা আমি জানি না, তবে তুমি চালাতে থাকো।

—আমি...কিছু বলার চেষ্টা করলো জর্জ। কিন্তু দেখতে পেল পিস্তলটা কানের পাশে রগ ছুঁয়ে আছে।

রাস্তাটা কি অসম্ভব অন্ধকার। নির্জন। একটা মানুষজন পর্যন্ত নেই। মনে হচ্ছে অন্ধকার এক গহ্বরের মধ্যে দিয়ে যেন সে গাড়িটাকে নিয়ে ছুটে চলেছে। চিৎকার করে কাউকে সে কিছু বলবে এমন কোন উপায় নেই।

একসময় জর্জ প্রশ্ন করলো—আমরা কোথায় চলেছি?

—জিজ্ঞাসা করে কোন লাভ নেই। শুধু যেখানে থামতে বলবো সেখানে গাড়িটা দাঁড় করাবে।

উফ্ কি প্রচণ্ড একটা মৃত্যু ভয় তখন জর্জকে ঘিরে ধরেছে। সমস্ত শরীরটা ঘামছে। চারদিকে কোন আলো নেই। চিৎকার করলেও কেউ এখানে বাঁচাতে আসবে না। সামনে বিশাল বনভূমি।

—এখানে থামো। জন বললেন।

জর্জ ব্রেক করলো। গাড়ি থেকে নেমে উল্টোদিকের দরজার সামনে দাঁড়ালেন জন। বললেন কঠিন গলায়।

—বেরিয়ে এসো।

—তুমি এভাবে কথা বলছো কেন জন?

—কোন কথা না, কোন প্রশ্ন না। শুধু যা বলছি তাই করো। গাড়ি থেকে নামলো জর্জ।

সামনে বিস্তৃত বনভূমি। তার মধ্যে দিয়ে আঁকাবাঁকা পথ চলে গেছে। বনের যত ভিতরে যাওয়া যাচ্ছে ততোই অন্ধকার বাড়ছে।

—আর কত দূর যেতে হবে?

—আর কিছুটা দূর।

পায়ে চলার পথ ধরে চলতে থাকে। কারো মুখে কোন কথা নেই। গাছপালাগুলো ক্রমশ যেন কাছাকাছি হয়ে আসছে। আদিম অন্ধকার যেন ক্রমশ ডুবিয়ে দিচ্ছে ওদের দুজনকে। তারপর একসময় চোখে পড়লো একটা বেশ পুরনো ওক গাছ। মনে হল গাছটা বহু প্রাচীন। বিশাল বড় আর প্রচণ্ড মজবুত। গাছটার গা থেকে বাকল খসে গেছে, তবু গাছটা দাঁড়িয়ে আছে। শেষ ডালপালা আর পাতাটা খোয়ানো সত্ত্বেও মৃত্যুর মধ্যেও মহান হয়ে রয়েছে গাছটা।

—এখানে। জন বললেন।

থেমে গেল জর্জ।

গাছগাছালির ফাঁক ফোকর দিয়ে অনেক দূরে বিন্দুর মত বহু দূরের ঘর-বাড়িগুলোকে দেখা যাচ্ছে। জনের মনে হল, এটাই হল মৃত্যুদণ্ডের উপযুক্ত স্থান।

জর্জ একটু এগিয়ে গিয়েছিল। তার বারবার মনে হচ্ছিল জনকে কিছু একটা বুঝিয়ে বলার দরকার আছে। কিন্তু যতবার চেষ্টা করেছে কিছু বলার ততোবারই জন তার হাতের পিস্তলটা উঁচু করে ধরেছে ওর সামনে। ওর হাতে পিস্তল আছে, অতএব ওকে খ্যাপানো চলবে না। যত কম কথা হয় ততোই মঙ্গল।

জর্জ ফিরে এলো আবার জনের কাছে। অন্ধকারে তার চোখ জোড়া ক্ষুধার্ত হায়নার মত জ্বলছিল। কাছে আসতেই জন তাকে নির্দেশ দিল—"ঘুরে দাঁড়াও।"

শরীর শিরশির করে উঠলো জর্জের। কেমন যেন ভয় ভয় করছিল। বললে—কেন?

—তোমাকে বলছি, তাই তুমি আমার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াবে। জনের নির্দেশ না মানলে বিপদ বাড়বে। কিন্তু কি করে জর্জ এর প্রতিবাদ করবে। পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়ালো জর্জ। ঝরঝর করে কাঁপছিল তার শরীরটা। তার মনে হচ্ছিল চিৎকার করে সে জনকে কিছু বলবে। কিন্তু তার আগেই গর্জে উঠলো জনের হাতের পিস্তল। অন্ধকারে বনের মধ্যে সেই শব্দ হারিয়ে গেল। মৃত ওক গাছটার উপর মুখ থুবড়ে পড়লো জর্জ। মুখ থেকে একরাশ থুতু ছিটিয়ে ধীর পদক্ষেপে বনের পথ ধরে আবার নিজের গাড়িটা যেখানে দাঁড় করানো ছিল, সেইখানে এসে দাঁড়ালেন জন।

বাড়ির আলোগুলো তখন অনেক বেশি উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। গাড়ি থামিয়ে এক লাফে বারান্দায় উঠে এলো জন। জঙ্গলের ঘটনাটা সম্পর্কে এখন আর তার মনে

কোন অনুভূতি খেলা করছে না। মনে হচ্ছে সেটা যেন কোন দূর অতীতের স্মৃতি। মৃত বন্ধুর জন্য তার মনে কোন অনুশোচনা নেই, কোন অনুভূতি নেই।

বন্ধ তালার গায়ে নিজের চাবিটা গলিয়ে দিল জন।

—ওই এসেছে। তোমার এত দেরি হল কেন জর্জ।

বৈঠকখানায় এসে ঢুকলো জন। গ্রেসের মুখটা নিচের দিকে নামানো। জর্জের স্ত্রী রবার্টার দু'চোখে প্রচণ্ড উৎকণ্ঠা।

ঘরের আলোগুলো যেন উজ্জ্বলতা আগের থেকে হঠাৎ অনেকটা হারিয়ে ফেলেছে। দোকানের সাজানো পুতুলের মত গ্রেস আর রবার্টার ছবি যেন জনের দিকে—যেন তারা এই সময় দুজনে জনকে নয় জর্জকে চাইছিল।

—আমরা ভাবলাম তুমি জর্জ। গ্রেস বললে, জর্জ সেই কখন রাস্তার মোড়ে গিয়েছে আমাদের জন্য আইসক্রিম আনতে, এখনও ফিরে এলো না।

কি করে ফিরবে জর্জ? সে তো এখন জঙ্গলের মধ্যে বুড়ো ওক গাছটার উপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। মরে গেছে। এখবর তো জন ভিন্ন আর কেউ জানে না। ভুল...সাংঘাতিক ভুল করে ফেলেছে জন। জর্জ কক্ষনো গ্রেসের প্রেমিক হতে পারে না।

—তুমি একটু রাস্তার মোড়ে গিয়ে দেখবে, প্লিজ, জর্জ যা আড্ডাবাজ। হয়ত আইসক্রিম আনার কথা ভুলেই গিয়েছে।

জন কোন কথা না বলে বেরিয়ে গেলেন। কোন উপায় নেই। এই অভিনয়টুকু তাকে করতেই হবে? তারপর ফিরে এসে বললেন—জর্জ আইসক্রিমের দোকানে আদৌ যায়নি।

—তাহলে ওর নিশ্চয় কিছু হয়েছে। জর্জের স্ত্রীর দু'চোখে তখন প্রচণ্ড এক ভয়ার্ত আশংকা।

মেয়েটা অঝোরে কাঁদছে।

কষ্ট হচ্ছে জনের। সে তো জর্জের খুনী। সে তো আজ খানিক আগে জর্জকে খুন করেছে। এখন কি হবে। ভাবতে গিয়ে জনের সব কিছু গোলমাল হয়ে যায়। সে কি পুলিশকে গিয়ে বলে দেবে? না, নিজে থেকে ধরা দেবে কেন? কাউকে কিছু বলবে না। যতদিন না সে নিজে থেকে কাউকে কিছু বলবে ততোদিন পর্যন্ত পুলিশের পক্ষেও জানা সম্ভব নয় এই খুনের কথা। তাছাড়া জন একজন বিশিষ্ঠ ভদ্রলোক, কেউ তাকে সন্দেহ করবে না। অতএব জন নিরাপদ।

পরক্ষণে মনে হল—সেই লোকটা—যে জানলা দিয়ে সব কিছু দেখতে পায়। যদি সে আজকের ঘটনাটা দেখে থাকে, তাহলে? তখন তো সবাই তার কাছ থেকে ঘটনাটা জানতে পারবে। সেই অজানা লোকটা হয়ত আজও ফোন করবে। ওকে বলবে, জন কাজটা তুমি ভাল করোনি। আমি কিন্তু সব দেখেছি। তুমি জর্জকে

গাড়িতে তুলে জঙ্গলের পথে নিয়ে গিয়েছিলে। একমাত্র আশা, যদি সেই লোকটা আজ কিছু না দেখতে পেয়ে থাকে।

রাত এগারোটার সময় দূরভাষটা বাজে। জন তাকিয়ে ছিল। বুকের ভিতর তার কেউ যেন হাতুড়ি পিটিয়ে চলেছে। অথচ যন্ত্রটা আজ নীরব। স্থানু হয়ে বসে রইলেন। নিবিড় উদবিগ্নতার মধ্যে কাটলো আরও কিছুটা সময়। ফোনটা আজ আর বাজলো না।

কারণ সে জানে না—যে তাকে ফোন করতো, সে চিরদিনের মত নিশ্চুপ হয়ে গেছে। তার ঠাণ্ডা এবং শক্ত হয়ে ওঠা দেহটা অন্ধকার অরণ্যে মরা ওক গাছের পাশে পড়ে আছে টান টান হয়ে। ফোন আর এখন তাকে করবে কে!

তবু প্রতিদিন রাত এগারোটা বাজলেই জনের অপরাধী মনটা ভয়ে কুঁকড়ে যায়। মনে হয় এই বুঝি ফোনটা বেজে উঠলো।

থিভস ওনার

জন লুৎজ

দড়িটা শক্ত করে ধরে ভাণ্ডারহার্স্টের শোবার ঘরের জানলার কার্নিশে নেমে এলো নেড স্প্যাংলার। আটতলার নিচে নাইনথ এভিন্যুতে তখনও অবিরাম ধারায় লোকজন, গাড়ি চলছে। জনবহুল অঞ্চল। অথচ বাড়িটার উল্টোদিকের অফিস বাড়িটা সম্পূর্ণ অন্ধকার—কাজেই কারো নজরে তার পড়ার সম্ভাবনা নেই। ভাণ্ডারহার্স্টের ঘরের ভিতরটা দেখে নেবার জন্য একবার নিজের মাথাটা এগিয়ে নিল স্প্যাংলার।

শোবার ঘরে আলো জ্বলছিল। শূন্য ঘর। স্প্যাংলার যা খুঁজছিল তা সযত্নে সাজানো ছিল বিশাল খাটটার উপর। সাবধানে জানলার কাচটা তোলার চেষ্টা করলো সে। সামান্য একটু শব্দ করে শার্সিটা উপরে উঠে গেল।

ঘরের অপর প্রান্তে বন্ধ দরজার ওদিকে তখন অসংখ্য নারীকণ্ঠের অনুযোগ, হাসির শব্দ, গ্লাসের ঠুং ঠাং শব্দ পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছিল বেশ। আসলে মজলিশ জমে উঠেছে। স্প্যাংলার দেখতে পেল খাটের উপর ছড়ানো আছে অতিথি অভ্যাগতদের ফারের মহার্ঘ পোশাকগুলো। এবার সে তার জামার আড়াল থেকে কোমরে গোঁজা একটা বড় থলে বার করে পোশাকগুলোর দিকে এগিয়ে গেল। তারপর একে একে পোশাকগুলো ভাঁজ করে দ্রুত হাতে পুরতে লাগলো থলিতে। এরপর একটা কালো পোশাকে সবেমাত্র হাত দিয়েছে, অমনি ভেজানো দরজাটা খুলে গেল। অসাধারণ সুন্দরী এক যুবতী চমৎকার একটা ফারের পোশাক পরে তাকালো তার দিকে। তাকে দেখা মাত্র স্প্যাংলার চেষ্টা করলো জানলার কাছে পৌঁছনো। একবার জানলার কাছে পৌঁছতে পারলে তাকে আর পায় কে। কিন্তু স্প্যাংলার নড়তে পারলো না। কারণ জানলার দিকে পা বাড়ানো মাত্র মেয়েটি তার হাতব্যাগ থেকে একটা ছোট অটোমেটিক রিভালবার বার করে নিয়েছে। স্প্যাংলার বুঝলো এখন নড়াচড়া করা মানে প্রচণ্ড বিপদ।

সে ভিতরে ভিতরে কাঁপছিল। জীবনে এইভাবে কোন ঘটনার মুখোমুখি তাকে হতে হয়নি।

মেয়েটি দেখতে নিখুঁত সুন্দরী। পরণে সাদা পোশাক, একমাথা সোনালি চুল টানটান করে বাঁধা। মুখে অদ্ভুত একটা হাসির ঝিলিক। স্প্যাংলার তাকিয়েছিল

মেয়েটির দিকে। মেয়েটি হাতের রিভালবার উঁচিয়ে রেখেই তার দিকে তাকিয়ে বললে—একে বলে হাতেনাতে ধরা—কি তাইতো?

মেয়েটির হাবভাবে বোঝা গেল মেয়েটি আর দশটা মেয়ের মত হটকারি নয়। সে চিৎকার করবে না অথবা এই মুহূর্তে গুলিও ছুঁড়বে না।

আড়চোখে স্প্যাংলার একবার দেখে নিল জানলার থেকে তার দূরত্বটা। না—অনেকটা দূরেই আছে। লাফ মেরে বেরিয়ে যাওয়া তার পক্ষে সহজ নয়।

মেয়েটি এবার দরজাটা বন্ধ করে পিঠ ঠেস দিয়ে স্প্যাংলারের দিকে তাকিয়ে বললে—কি নাম তোমার?

ভারি অদ্ভুত তো, এমন প্রশ্ন কেউ কোন চোরকে করে নাকি, বিশেষ করে সে যখন হাতেনাতে ধরা পড়েছে। তাই স্প্যাংলারের কাছে ব্যাপারটা ভীষণ অদ্ভুত লাগলেও, প্রশ্নটা তার পুরুষত্বকে ধাক্কা মারলো। একটা মেয়ের কাছে আত্মসমর্পণ। সেই তো পুলিশকে খবর দেবে। তার চেয়ে পুলিশের কাছে নামধাম, বাপের নাম, ঠিকানা অর্থাৎ সব কিছু জানানো যাবে। তাই নেড স্প্যাংলার কঠিন গলায বললে—সেটা পুলিশের কাছ থেকে না হয় পরে জেনে নেবেন।

মেয়েটি আবার হাসলো। বললে—সেরকম পরিস্থিতিতে আমি যেতে চাই না। পুলিশ-টুলিশ ওসব করে কিছু লাভ নেই। তার চেয়ে আমি চাই আপোষে একটা বোঝাপড়া করে নিতে।

মেয়েটির কথা ভারি অদ্ভুত শোনালো। আপোষ করে নিতে চাই মানে। কি বোঝাপড়া করতে চায়। এবার স্প্যাংলার বললো—আমি কি আদৌ কোন বোঝাপড়ার মত অবস্থায় আছি। মনে হয় না আমার।

মেয়েটি বললে—আমার মনে হচ্ছে তুমি ঠিক বোঝাপড়ার মত অবস্থায় আছো, আর সেই কারণেই আমি তোমাকে প্রস্তাবটা দিয়েছি। দেখ, তোমার মত একটা মানুষ, যার কাজ হল চৌর্যবৃত্তি—যার মুখের ডানদিকে ওরকম একটা লম্বা কাটা দাগ আছে, তাকে যে কোন সময় পুলিশ সনাক্ত করতে পারবে।

স্প্যাংলার নিজের গালে হাত বোলায়। মনে পড়ে সার্কাসে আসার সময় দলের একজনের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল, এটা হল তারই চিহ্ন। মেয়েটা ঠিক বলেছে। এমন একজন দাগী আসামীকে খুঁজে বার করা পুলিশের পক্ষে খুব কঠিন কাজ নয়।

মেয়েটি বললে—আমার কথাটা ভেবে দেখো। তুমি এখন যে অবস্থায় আছো, আমার মনে হয় আমি তোমাকে এই ঘর থেকে চলে যেতে দিলেও, তুমি ঠিক ধরা পড়ে যাবে। বরং আমার তো মনে হয় তোমার আমার সঙ্গে বোঝাপড়া করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই।

মেয়েটি ঠায় দরজায় পিঠ ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে খুব মৃদুভাবে কথা বলছিল।

স্প্যাংলার এবার মেয়েটিকে দেখলো। কি বলতে চায় মেয়েটি তার মাথায় এলো না। কি ধরনের বোঝাপড়ার কথা সে বলছে। তাই কোনরকমে বললে—ঠিক বলুন কি বলতে চান।

—শোন আমার টেলিফোন নম্বর হল ইয়র্কটাউন ৫-০৩০৫। মেয়েটি শান্তভাবে পুনরায় টেলিফোনের নম্বরটা উচ্চারণ করলো। তারপর বললে, তিনদিনের মধ্যে তুমি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে। আর যদি তা না করো, তাহলে—

—আপনি সব ফাঁস করে দেবেন তাই তো?

—ঠিক তাই। তারপর পিস্তলটা স্প্যাংলারের দিকে অবিচল রেখে খাটের উপর থেকে একটা ফার চাদর তুলে নিয়ে বললে—পার্টিটার্টি থেকে আমি একটু চিরদিনই আগেভাগে সরে পড়ি। তারপর হাতের ব্যাগে পিস্তলটা রেখে স্প্যাংলারকে বললে, আমার ধারণা দশ মিনিটের মধ্যে অন্তত এই ঘরে কেউ আসবে না। এই সময়টুকুর মধ্যে তোমার যা যা করনীয় তা তুমি করে নিতে পারো। তবে আমার চুক্তির কথাটা যেন মনে থাকে।

মেয়েটি এবার দরজা বন্ধ করে চলে গেল।

স্প্যাংলার সামান্য সময় স্থানুর মত দাঁড়িয়েছিল। তারপর দ্রুত কাজে হাত লাগালো। ভাল ভাল দামী পোশাকগুলো দ্রুত হাতে ভাঁজ করে ব্যাগে পুরে নিল। তারপর পোশাকের আলমারি খুলে সেখান থেকে কয়েকটা মূল্যবান পোশাক নিয়ে নিজের ব্যাগে গুছিয়ে রাখলো। তারপর কাজ শেষ হলে থলির মুখটা বেঁধে এক লাফে জানলার কার্নিসে এসে দাঁড়ালো। তারপর ফুলে ফেঁপে ওঠা থলিটাকে কোমরবন্ধের সঙ্গে বেঁধে, দড়ি বেয়ে ছাদে উঠে পড়লো। এবার সে দড়িটাকে ছাদ থেকে বাড়ির পিছনের দিকে ঝুলিয়ে দিল। তারপর সেটার সাহায্যে জরুরি প্রয়োজনের সিঁড়িতে নেমে, সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো একেবারে পিছনের সরু গলিটাতে। এই গলির মুখেই দাঁড় করানো ছিল তার গাড়ি। বড়জোর অপারেশনটা করতে সময় নিল পঁয়তাল্লিশ মিনিট। তারপর বাড়িতে ফিরে পানীয়তে চুমুক দিতে দিতে ভাবলো রোজগার কতটা হল—পাঁচ হাজার ডলার তো হবেই।

প্রথমদিনে মেয়েটির কথা মনে ছিল না। মনে পড়লো দ্বিতীয় দিন। আচ্ছা কি সুন্দর দেখতে মেয়েটি। কিন্তু একটা কথা ভেবে পেল না স্প্যাংলার মেয়েটি তার সঙ্গে কি ধরনের বোঝাপড়া চায়।

তৃতীয়দিনে মেয়েটিকে ফোন করলো স্প্যাংলার। নিজের নামটা এবার তাকে

বলতেই হল। অবাক হল অপর প্রান্ত থেকে যখন শুনলো মেয়েটি বলছে—আমার নাম ভেরোমিকা অ্যাকলিং। এবার স্প্যাংলার বুঝতে পারলো মিসেস ভাণ্ডারহার্স্টের মত একজন ধনবতী এবং কারুশিল্পের পৃষ্ঠপোষকের বাড়ির অনুষ্ঠানে মেয়েটি কেন উপস্থিত হয়েছিল। কারণ সামাজিক দিক থেকে ভেরোমিকাও কম যায় না। তার স্বামী হার্বার্ট অ্যাকলিং—একজন নামজাদা প্রাচীন পুথিপত্রের গবেষক। খবরের কাগজের প্রথম পাতায় প্রায়ই তার নাম ছাপা হয়। কাজেই এমন একজনের স্ত্রী ভেরোমিকার কথাবার্তা যে স্পষ্ট হবে এটা বুঝতে পেরেছিল স্প্যাংলার। কাজেই তিনি পরিষ্কার ভাবে বোঝাপড়াটা যে হবে তা জানিয়ে দিলেন স্প্যাংলারকে। বললেন, আমার স্বামীর অজ্ঞাতে তোমাকে আমার অলংকারগুলো চুরি করতে হবে। এরজন্য যে বিমা তার দশ শতাংশ ছাড়া, অলংকারগুলো বেঁচে যে ডলার পাওয়া যাবে তারও দশ শতাংশ পাবে। ভেরোমিকা তাকে আরও জানালো, ওর স্বামী একজন নামী লোক হলেও অত্যন্ত কৃপণ। প্রতিটা ডলার টিপেটিপে খরচ করেন। তাকে যে হাত খরচ দেন, তাতে ভেরোমিকার কুলোয় না, তিনি তার রুচিমাফিক চলতে পারেন না। অতএব তার ডলারের প্রয়োজন আর এই কারণেই তার স্প্যাংলারের সঙ্গে বোঝাপড়া। স্প্যাংলারকে ভেরোমিকা এই বলে আশ্বস্ত করলো, এই চুরি এবং বিমা কোম্পানির সঙ্গে ব্যাপারটা তিনি তার স্বামীর অজ্ঞাতসারেই সেরে ফেলবেন কারণ আসছে মাসে তিনি ইউরোপে থাকবেন একটা দুর্লভ বইয়ের সন্ধানে।

স্প্যাংলার গোটা ব্যাপারটা শুনলো কিন্তু করনীয় কিছুই ছিল না। তার কাছে ব্যাপারটা ভাল বলে মনে হচ্ছিল না। স্প্যাংলার নিজে খুব সুশৃঙ্খল প্রকৃতির মানুষ। কাজকর্ম যা করে তা সে একাই করে। সঙ্গে কোন সাকরেদ নেওয়া তার পছন্দ নয়। অন্য কেউ হলে ব্যাপারটা এড়ানো যেত কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যাপারটা এড়িয়ে যাওয়া তার পক্ষে মুশকিল। অথচ তার মন চাইছিল না ভেরোমিকার মত মহিলা তার কোন কাজের সঙ্গিনী হোক।

এই সব ধরনের মেয়েদের মনের নাগাল পাওয়া মুশকিল, কিন্তু মুশকিল হলেও কাজটা তাকে করতে হবে। মেয়েটা তাকে ফাঁদে ফেলে দিয়েছে।

অলংকারগুলোর নব্বুই হাজার ডলার বিমা করা আছে শুনে অনেকটা স্বস্তি পেল স্প্যাংলার। তার মানে সুনিশ্চিত ন' হাজার ডলার। তারপর গয়না বিক্রি...ওগুলো বিক্রি করে যে ডলার পাওয়া যাবে তাতে আয়টা খুব একটা কম হবে না।

চুরিটা কিভাবে করা হবে তারও একটা সহজ পথ বাতলে দিল ভেরোমিকা। গোটা ব্যাপারটা মাথায় নিয়ে টেলিফোন বুথের বাইরে বেরিয়ে এলো স্প্যাংলার।

রাত দুটোর সময় রবারের তালি লাগানো জুতো পরে নিঃশব্দে পাঁচ সারির সিঁড়ি বেয়ে ফ্রিমণ্ট অ্যাপার্টমেণ্ট বিল্ডিংয়ের সব চাইতে উঁচুতলার উপরে উঠে এলো স্প্যাংলার। পাশের বার্টন আর্মসেই অ্যাকলিংদের বাস। সে বাড়ির মত এ বাড়িটা অতোটা জমকালো নয়। এ বাড়িতে কোন দারোয়ান নেই। দ্রুত পায়ে লম্বা বারান্দা পেরিয়ে ভেরোমিকার কথা মত ছাদে ওঠার পথ খুঁজে পেল স্প্যাংলার। পথ আগলে রাখা সস্তার চাবিটা সহজেই খুলে ফেললো।

বার্টন আর্মস এবং ফ্রিমণ্ট অ্যাপার্টমেণ্টের মাঝখানের রাস্তাটা দশ ফুটের মত চওড়া। স্প্যাংলার সহজেই একলাফে বার্টন আর্মসের ছাদে এসে পড়লো। একমুহূর্ত সময় নষ্ট না করে ছাদের ধার ঘেঁষে ঠিক অ্যাকলিংদের জানলার কাছাকাছি গিয়ে সে দাঁড়ালো। তারপর ছাদ থেকে একটা দড়ি ঝুলিয়ে দিল যাতে ওপরের তলার জানলাগুলো দিয়ে দেখা না যায়। এরজন্য তাকে ফুট চারেক সরে যেতে হল। এবার স্প্যাংলার তার দড়িটার একটা প্রান্ত বেঁধে দিল বাজ আটকাবার লোহার ডাণ্ডাটার সঙ্গে, বাতাসে যাতে দড়িটা না দোলে সেইজন্য একটা ভারি ওজন নিচের দিকে বাঁধা ছিল।

ভেরোমিকার কথা মত হাবার্ট অ্যাকলিংয়ের জানলাটা বন্ধ ছিল। সঙ্গে কাচ কাটার একটা যন্ত্র থাকায় স্প্যাংলার দ্রুত হাতে কাজটা সেরে ফেললো। তারপর দস্তানা হাতে দিয়ে জানলা টপকে হাবার্ট অ্যাকলিংয়ের ঘরে প্রবেশ করলো।

বাড়িতে অবশ্য কেউ ছিল না। অ্যাকলিং ইউরোপে এবং বিমা কোম্পানির যে সম্ভাব্য সন্দেহ উড়িয়ে দেবার জন্য একটা জোরদার অজুহাত তৈরি করতে ভেরোমিকাও ওই দিন ছিল বাড়ির বাইরে। ঘটনাটা যে প্রকৃত ডাকাতি তা বোঝাবার জন্য টর্চের স্বল্প হলদে আলোয় সমস্ত ফ্ল্যাটটা আতিপাঁতি করে হাতড়ালো স্প্যাংলার। তারপর শোবার ঘরে গিয়ে পোশাকের আলমারির সব কটা দেরাজ টেনে খুললো। শেষ দেরাজে একগাদা রুমাল আর নাইলনের মোজাগুলো পর্যন্ত বার করে ছড়ালো চারদিকে। তারপর বার করলো গয়নার বাক্সটা।

বাক্সটা মেঝেতে রেখে খুব সহজে তালাটা খুলে স্প্যাংলার টর্চের আলোয় অলংকারগুলো দেখল। প্রতিটা অলংকার যে দামী তাতে কোন সন্দেহ ছিল না। তারপর পরিতৃপ্ত মনে চারিদিক ভাল করে দেখে শুনে নিয়ে সে ঘর ছাড়লো। ও—হ্যাঁ যাওয়ার সময় স্প্যাংলার ইচ্ছে করেই একটা দামী লাইটার পকেটস্থ করলো।

তারপর সোজা চলে নিজের এলো ঘরে।

ঘরে ঢুকে আলোটা জ্বালালো স্প্যাংলার। অমনি আদুরে গলায় চাদরটা চিবুক

অব্দি তুলে স্প্যাংলারের বিছানায় শুয়ে থাকা ভেরোমিকা বললে—আলোটা নিভিয়ে দাও লক্ষ্মীটি।

আলোটা নিভিয়ে দিল স্প্যাংলার। ভেরোমিকার মাথার কাছে বসলো। আদুরে ভাব করে ভেরোমিকা বালিশ থেকে মাথা সরিয়ে স্প্যাংলারের কোলের উপর রাখলো। সমস্ত শরীরটা শিরশির করছিল স্প্যাংলারের। এক সময় লোভ সামলাতে না পেরে স্প্যাংলার একটা চুমো দিল ওর কপালে।

ভেরোমিকা এমনভাব করলো যেন সে ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে আছে।

সারারাত নিজের সৌভাগ্যের কথা ভাবছিল স্প্যাংলার, ভোর হল।

নিজের বেশবাস পরে ভেরোমিকা বেরিয়ে গেল। স্প্যাংলার নিজের ঘরে বসে বসে ভাবলো সে সত্যি ভেরোমিকাকে ভালবেসে ফেলেছে।

কয়েকদিনের মধ্যেই ভেরোমিকার কাছ থেকে ডলারের ভাগটা পেল। তারপর দুজনে বসে মদ গিললো। এইদিন প্রথম ভেরোমিকা নিজেই একটা চুমু দিয়েছিল স্প্যাংলারকে। বলেছিল আজ রাতটা আমি তোমার কাছে থাকবো।

যেন নেশা লেগেছে।

স্প্যাংলার আপত্তি করলো না। রাতে শুয়ে শুয়ে স্প্যাংলারকে জড়িয়ে ধরে ভেরোমিকা আবদারের সুরে বললে, আমার ইচ্ছে, তুমি আবার আমার ঘরে আর একবার ডাকাতি করো।

—কি বলছো তুমি? আবার তোমার বাড়িতে?

—হ্যাঁ। বারে তুমি এমনভাব করছো যেন তুমি এক জায়গায় দুবার কখনও চুরি করোনি। এমন তো বহুবার করেছ। মতলবটা একেবারে খারাপ দিচ্ছি না তোমায়।

আমার মনে হয় ধরা পড়ার তোমার কোন অবকাশ নেই। এবারও আমরা বীমা কোম্পানির চোখে অনায়াসে ধুলো দিতে পারবো। কাজটা যে চোরের কাজ লোকের সে বিষয়ে কারো মনে কোনো সন্দেহ থাকবে না।

—কিন্তু এত লোভ মনে হয় ঠিক নয়।

—তোমার আপত্তি আছে।

—না মানে। স্প্যাংলার কিছু বলতে পারে না।

ভেরোমিকা বললে, হার্বার্ট ফের প্যারিতে যাচ্ছে আগামী সপ্তাহে। তখন ফের যদি চুরি হয় এবং এবারের মত সেবারেও যদি আমি এতগুলো ডলার পাই তাহলে আর ওর কাছে থাকবো না। গয়নাগুলো আমার। হার্বার্ট না হয় বিমার ডলারটা ফেরৎ পাওয়ার চেষ্টা করবে—অবশ্য তখন যদি আমাকে সে খুঁজে পায়।

—তো তুমি তাহলে কোথায় যাবে?

—কেন তোমার কাছে আসবো।

—আমার কাছে?

—হ্যাঁ তোমার সঙ্গে থাকবো।

কয়েক মুহূর্ত নিশ্চুপ থাকলো স্প্যাংলার। বুঝতে পারলো গতবারের মত এবারেও তার নিজস্ব মতামতের কোন দাম নেই। ভেরোমিকা ফাঁসাতে চাইলেও, সে কোন ভাবেই ভেরোমিকাকে এরমধ্যে জড়াতে পারবে না।

—তোমার নতুন গয়নাগুলোয় কত ডলার বিমা করা আছে।

—আশি হাজার। বিমা কোম্পানির কাছ থেকে পাওয়া ডলারের মধ্যে আমার অংশ দিয়ে আমি আবার নতুন গয়না করেছি। হার্বাট এর বিন্দু বিসর্গ জানে না। আসলে লোকটা দিনরাত পড়াশুনো নিয়ে থাকে, কোনদিকেই তার খেয়াল নেই।

স্প্যাংলার একটা সিগারেট ধরালো।

—এবারে গয়না বিক্রি করে যা পাবো তার অর্ধেক তোমার।

স্প্যাংলার নতুন করে ভাবতে শুরু করলো। এবার এই মোটা ডলারটা পেলে সে আর এসব কাজ করবে না। তাছাড়া ভেরোমিকার মত সুন্দরীও তার সঙ্গে চলে আসবে—আহা, এমন একটা সুযোগ হাতছাড়া করা ঠিক উচিত হবে না।

—কি হল কি ভাবছো? তুমি রাজি?

—রাজি।

মৃদু হাসলো ভেরোমিকা। তারপর স্প্যাংলারকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে খুব আলতো করে একটা চুমু দিয়ে ভেরোমিকা বললে—ডলারটা আমরা দুজনে একসঙ্গে মিলে খরচ করবো।

স্প্যাংলার কোন কথা বলতে পারলো না। তার দেহমন তখন ভেরোমিকার স্পর্শে স্থবির হয়ে গেছে। হারিয়ে গেছে সমস্ত অনুভূতি।

এক সপ্তাহ বাদে ফের কাজে নামল স্প্যাংলার। একই কায়দায় সে পাশের বাড়ির ছাদ থেকে লাফিয়ে দড়ি নামিয়ে দিল আগের কায়দায়। দড়ি বেয়ে নিচে নেমে জানলার কাছে পৌঁছে সে অবাক হয়ে গেল। দেখতে পেল ঘরে আলো জ্বলছে। প্রথমে ভাবলো হয়ত ভেরোমিকা আলোটা নেভাতে ভুলে গেছে। এবার সে অতি সন্তর্পণে কার্নিশের কোণে দাঁড়িয়ে, ঘরের ভিতরটা দেখলো। যা দেখলো তাতে শিউরে উঠলো স্প্যাংলার। দেখতে পেল ঘরে বসে আছেন স্বয়ং হার্বার্ট অ্যাকলিং। সামনের টেবিলে রাত জাগা পড়ুয়া ছেলেমেয়েদের মত তার মাথাটা নুয়ে আছে মোটা বইয়ের উপর। সমস্ত টেবিলটা, বইগুলো রক্তে ভিজে লাল

হয়ে গেছে। আর মেঝেতে পড়ে আছে একটা কালো চকচকে অটোম্যাটিক—যেটা ভেরোমিকার ব্যাগে সব সময় থাকে।

ব্যাপার দেখে হতভম্বলিত স্প্যাংলার কি করবে ভেবে পেল না। সে হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ তার সম্বিত ফিরে এলো ভেরোমিকার তীব্র আর্তনাদে। তারপর দু'হাতে মুখ ঢেকে উচ্চস্বরে কেঁদে উঠলো ভেরোমিকা। তারপর পিছনে ঘরের বাইরে ছুটে গেল।

স্প্যাংলার আর কালবিলম্ব না করে ফের দড়ি বেয়ে ছাদে উঠে পড়লো। মনে মনে ভাবছিল এমন একটা সম্ভাবনার কথা সে তো আগে চিন্তা করেনি? এখন ভেরোমিকা তো ডলারটা একাই সবটা পেয়ে যাবে। কিন্তু এসব চাইতে এখন তার নিজের প্রাণ বাঁচানোর প্রয়োজন। তাকে পালাতে হবে। ভেরোমিকা নিশ্চয় পুলিশকে তার হদিশ বলে দেবে।

পাশের বাড়ির ছাদে লাফ মারার সময় শুনতে পেল সাইরেনের কাঁপা স্বর। দ্রুতপায়ে নিচে নামতে থাকে স্প্যাংলার। শব্দটা ক্রমশ এগিয়ে আসছে। একেবারে কাছে এসে পড়েছে শব্দটা। স্প্যাংলার এক লাফে গলিতে এসে নামলো। তারপর ছুটতে লাগলো। স্প্যাংলার স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিল একটা অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর—স্প্যাংলার থামো...গুলির শব্দটা সে শুনতে পাইনি, তবে লক্ষভ্রষ্ট গুলিটা দেয়াল থেকে একরাশ চাকলা তুলে দিল।

পাশের সরু গলিটা ধরে যখন স্প্যাংলার উর্ধশ্বাসে ছুটছে, তখন পাশের বাড়ির উঁচুতলা থেকে এক মহিলা চিৎকার করে উঠলেন—ওই যে, ওই যে খুনিটা পালাচ্ছে। পরক্ষণে গলির যে দিকে স্প্যাংলার ছুটছিল সেদিক থেকে এক লাল আলো ঠিকরে বেরিয়ে এলো। গোড়ালিতে কি যেন আঘাত করলো। একটা চক্কর খেয়ে অসম্ভব যন্ত্রণায় মাটিতে লুটিয়ে পড়লো স্প্যাংলার। এবারের শব্দটার সঙ্গে শরীরের মধ্যে একটা তীব্র যন্ত্রণা সে অনুভব করলো।

তখনও স্প্যাংলার সম্পূর্ণ সচেতন। দু'ধারে উঁচু উঁচু বাড়ি। মাঝখানে শীতের একফালি উজ্জ্বল আকাশ। পিঠের নিচে শান বাঁধানো পথের কঠিন অথচ ঠাণ্ডা একটা স্পর্শরেখা টের পাচ্ছিল। হাত দুটো মনে হল উষ্ণ এবং আঠালো কোন পদার্থের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। স্প্যাংলার বুঝতে পারলো, তার শরীর থেকে রক্ত ঝরে যাচ্ছে।

ঠিক সেই সময় সে শুনতে পেল এক গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর ঃ—আপনারা সব সরে যান, সরে যান এখান থেকে।

অ্যাম্বুলেন্স না আসা পর্যন্ত কাউকে গলিতে ঢুকতে দেওয়া হবে না।

অ্যাম্বুলেন্সের জন্য আর পরোয়া করে না স্প্যাংলার। সে শুধু ভাবছিল একটা

স্বপ্নের কথা। সে স্বপ্নের মধ্যে যে দেখতে পাচ্ছিল ভেরোমিকাকে। ভারি অদ্ভুত মেয়ে এই ভেরোমিকা। চোরের উপর বাটপারি করে বেরিয়ে গেল মেয়েটা। কেউ জানলো না তার কথা। একমাত্র তার কথা জানে স্প্যাংলার। স্প্যাংলার মনে মনে হাসে...ভাবে ভালবাসা নিছক একটা খেলা।

এটা একটা খেলাই ছিল বলে ধরে নিল স্প্যাংলার। মনে মনে তার ভেরোমিকার উপর রাগ হল না, বরং মনে মনে সে ভেরোমিকার বুদ্ধিকে তারিফ করলো। হাজার হোক একটা বুদ্ধির খেলায় ভেরোমিকা তাকে হারিয়ে দিয়েছে। বরং মেয়েটা ভাল থাকুক। সমস্ত ডলার সে একাই উপভোগ করুক। ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। অস্পষ্ট স্বরে একবার ভেরোমিকার নামটা উচ্চারণ করে, তার চোখ জোড়া বন্ধ হয়ে আসে।

দ্য এম্পটি রুম

ডোনাণ্ড হনিগ

দরজার পাল্লা দুটো ধরে বন্ধ করার সময় ভারি অদ্ভুত একটা শব্দ হল। অন্য কেউ হলে এই অন্ধকারে ওই রকম একটা নাকি কান্নার শব্দ শুনে নিশ্চয় চমকে উঠতো। কিন্তু কার্ল চমকালো না। বরং সে বাড়িটার দিকে একবার তাকালো। একটা বিসন্ন মূর্তির মত অন্ধকারের মধ্যে বাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। কার্ল ভাবছিল লারার হয়ত ঘুম ভেঙ্গে গেছে এই রকম একটা শব্দে। অবশ্য তাতে কার্লের আর কিছু এসে যায় না। ব্যাপারটা এখন এমন একটা পর্যায়ে চলে গেছে যে তার আর নতুন করে কিছু ভাবনার নেই, কিছু বলার নেই।

বারান্দার সিঁড়িতে উঠে দরজা খুললো কার্ল। তারপর ভিতরে ঢুকে বন্ধ করে দিল দরজাটা। কিন্তু চাবিটা পকেটে রেখে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে উঠতে অন্ধকারের ভিতর থেকে সংযত স্বরে কার্ল নামটা একবার উচ্চারিত হল।

সিঁড়ির শেষ প্রান্তে হাত রেখে থমকে দাঁড়ালো কার্ল। সে জানতো লারা কোথায়। কোণের দিকে প্রাচীন আমলের বিরাট ঘরটার পাশে, দরজার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে ও। কার্লের জন্য অপেক্ষা করার সময় ও সর্বদা ওখানেই থাকে।

—এতদিনে এতে আমার অভ্যস্ত হওয়া উচিত ছিল কিন্তু এখনও তুমি আমাকে রীতিমত চমকে দাও। কার্ল বললো—তুমি ওখানে রয়েছ তা আমায় বুঝতে দাওনি কেন? অন্তত একটা আলো তো জ্বেলে রাখতে পারো।

—কেন জ্বালাবো আলো। অন্ধকার ভেদ করে লারার মসৃণ কণ্ঠস্বর কানে এলো। বাস্তবে ওকে সত্যি সত্যি না দেখতে পেলেও তার তীক্ষ্ণ ঠোঁট চেপে রাখা মুখ আর সেই সঙ্গে ঠিক ঠিক করে জ্বলতে থাকা আগুনের মত ছোট একজোড়া চোখ যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল কার্ল।

—তুমি কি আলোর মধ্যে কোনদিনও কোন কাজ করো?

—তুমি তো জানো আমি এতক্ষণ কোথায় ছিলাম। শান্ত কণ্ঠে উত্তর দিল কার্ল। ঘড়ির দোকানটার ঠিক পাশেই এখন সে লারাকে স্পষ্ট দেখতে পেল।

—না জানি না। আমি চাই তুমি নিজে আমাকে তা বলবে। যতদিন তোমার

বিবেকবোধ জেগে না ওঠে, ততদিন আমি চাই তুমি যখনই যেখানে যাবে আমাকে জানাবে।

—প্লিজ লারা, আর ওসব বলো না।

—হ্যাঁ আবার বলবো। বারবার বলবো, হাজারবার বলবো, যতদিন না তুমি এসব থামাচ্ছ ততদিন বলবো। কিংবা যতদিন না আমি তোমাকে ছেড়ে যাচ্ছি ততদিন বলবো।

—তুমি কোনদিন তা করবে না।

এবারে ও বলবে—আমি তোমায় ছেড়ে গেলে তুমি কি করবে? কোথায় যাবে? তোমার না আছে ডলার, না আছে চাকরি। একদিন আমি তোমাকে বিশ্বাস করেছিলাম, ভালবেসেছিলাম। তাই আজও আমি নিজের ডলার খরচ করে তোমাকে পুষছি, যে ডলারের জন্য তুমি আমাকে বিয়ে করেছিলে...

লারাকে কথাগুলো শেষ করতে না দিয়ে কার্ল প্রায় চিৎকার করা গলায় বললো—থামো বলছি।

—কেন থামবো। আমি যা বলছি ঠিক বলছি।

—আচ্ছা কোন জিনিস যেমন যেমন ভাবে রয়েছে, তুমি কি সেগুলোকে ঠিক সেই ভাবে মেনে নিতে পারো না?

—আমি তোমাকে মেনে নিয়েছি কার্ল, কিন্তু তুমি যা করছো—সেগুলোকে মেনে নেওয়া যায় না। আমার মনে হয় শুধু আমি কেন, কোনদিনই কোন মেয়েমানুষের পক্ষে মানা সম্ভব নয়।

—তুমি কি জানো, কত পুরুষ মানুষ কত অন্য মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করে।

—তুমি কি নিজেকে সমর্থন করার চেষ্টা করছো?

—নিজেকে সমর্থন করার কোন প্রয়োজন নেই আমার। তোমার কাছেও না বা অন্য কারুর কাছেও না। কথাটা একদমে প্রায় বললো কার্ল। নিজের মধ্যে অদ্ভুত একটা প্রশান্তি অনুভব করলো। বোঝা গেল এটা হল প্রচণ্ড একটা ঝড়ের পূর্ব লক্ষণ। নিজেকে কি মনে করে লারা? ওর কি ধারণা ওর ওই হতচ্ছাড়া অর্থ সম্পদ দিয়ে ও কার্লের দেহ-মন সমস্ত কিছু কিনে নিয়েছে।

রক্ত গরম হয়ে ওঠে। তবু কিন্তু রাগ মুখ চোখে প্রকাশ করলো না। ভিতরে ভিতরে একটা প্রচণ্ড ধূমায়িত ক্ষোভ নিয়ে কার্ল এগিয়ে গেল লারার দিকে। যে ভাবে ও অন্ধকারে এগিয়ে আসছিল তাতে লারা একটু সচকিত হয়ে উঠলো।

—কার্ল। লারার কণ্ঠস্বর অদ্ভুত ধরনের শোনালো। বেজে উঠলো একই সঙ্গে তীক্ষ্ণ আতঙ্ক।

অন্ধকারের মধ্যে লড়াই করতে করতে পুরনো আমলের ঘড়িটার ওপরে ছিটকে পড়ে ওরা অথচ ঘড়ির দোলনাটা পরম সহিষ্ণুতায় একইভাবে দুলতে থাকে, একই ছন্দে...কোন পরিবর্তন হয় না। ঘড়ির কাছ থেকে একটা পাক খেয়ে সরে যায় ওরা। পরক্ষণে কার্ল ফের ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর উপরে। হাঁটু মুড়ে বসে পড়ে লারা। কার্লের শক্ত হাত দুটো ওর কণ্ঠনালীতে চেপে বসে আছে। বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকে লারা কার্লের দিকে, শব্দহীন মুখটা অসম্ভব অসহায় বলে মনে হয়। ওদের দুজনের চোখের দূরত্ব মাত্র কয়েক ইঞ্চি— কার্লের চোখ দুটো হিম শীতল, লারার দু'চোখে মৃত্যুর ঘন নীল আভা।

একসময় ওকে ছেড়ে দেয় কার্ল। আশ্চর্য কোনকিছুই এতোটুকু এলোমেলো হয়নি, পরিবেশটা আগের মতই ঠিকঠাক আছে—শান্ত এবং নিঝুম। অথচ এইমাত্র এখানে একটা খুন হয়ে গেল অথচ সেই খুনের মধ্যে কোন কিছুই এতটুকু পালটালো না। তার হাত দুটো যা পরম বিশ্বস্ত ভাবে কাজটা সেরে ফেলেছে। তাছাড়া তার কোন অনুভূতি নিজের মধ্যে বোধ হল না। এমন ভাবে সে দাঁড়িয়ে আছে যেন কিছুই হয়নি, কোন কিছুই ঘটেনি।

হয়ত সত্যিই কিছু হয়নি। খুনী ধরা পড়লে তবে শাস্তির কথা। কার্ল নিশ্চয়ই জনে জনে বলে বেড়াবে না সে তার স্ত্রী লারাকে খুন করেছে। লারাও তা কাউকে বলতে যাবে না। আর ওই বুড়ো ঘড়িটা তো আর মানুষ নয় যে কিছু বলবে, অতএব ও কোনদিন কাউকে কিছু বলবে না।

বৈঠকখানার ঘরে গিয়ে জানলার পর্দাগুলো টেনে দেয় কার্ল। আলোটা জ্বালে। তারপর গায়ের জ্যাকেট খুলে একটা সিগারেট ধরিয়ে নেয়। বৈঠকখানার আরাম কেদারায় বসে সে লারার দুমড়ে মুচড়ে যাওয়া শরীরের খানিকটা অংশ দেখতে পাচ্ছিল। ওখানে বসেই গভীর ভাবে বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করতে লাগলো। এখন লারার দেহটা নিয়ে কি করবে সে?

কিছুদিন আগে খবরের কাগজে পড়া একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল কার্লের। একটা পুরনো বাড়ি ভাঙার সময় বাড়িটার একতলার মেঝে খুড়ে একটা কঙ্কাল বার করা হয়েছে। কঙ্কালটা কোন এক মহিলার এবং অনুমান করা হয়েছে অন্তত পঞ্চাশ বছর ধরে সেটা ওখানেই ছিল...তার মানে কার্ল নিজেকে বললো, তার মত আর একজনও তাহলে এমনধারা একটা কাজ করে দিব্যি বহাল তবিয়তে জীবন কাটিয়ে গেছে এবং শেষ পর্যন্ত নিষ্পাপ নির্দোষ মানুষ হিসাবেই কবরস্থ হয়েছে।

অতএব মাটির নিচের ঘরে নেমে গিয়ে একটা গাঁইতি দিয়ে মেঝে খুঁড়তে শুরু করলো কার্ল। প্রথমে উঠলো কংক্রিটের বড় বড় চাঙ্ তারপর নরম কালো

মাটি। উত্তেজনায় শরীরটা থরথর করে কাঁপছিল। সাবধানে একটা জায়গায় গর্ত করলো সে। তারপর তখন রাত প্রায় শেষ হয়ে আসছে...উপর তলায় গিয়ে মৃত স্ত্রীকে বয়ে নিয়ে এসে কবরে শুইয়ে দিল।

সেলারে পুরনো এক বস্তা সিমেন্ট ছিল। সিমেন্টগুলো আবার সেই ধরনের, যেগুলোতে কাজের সুবিধার জন্য আগে থেকেই বালি মেশানো থাকে। ওগুলোতে জল মিশিয়ে মেঝের ক্ষতস্থানটা সারিয়ে তুললো কার্ল। ততক্ষণে সেলারের ছোট ছোট জানলাগুলো দিয়ে সূর্যের আলো খুশির মেজাজে ভিতরে প্রবেশ করতে শুরু করেছে। কাজ শেষ করে কার্ল লক্ষ্য করলো ভালভাবে জায়গাটাকে। তারপর হলঘরের গালচে দিয়ে ঢেকে দিল সমস্ত জায়গাটা।

তাহলে লারা বিদায় হল। এবার ওর উধাও হয়ে যাওয়া সম্পর্কে মনে মনে একটা গল্প ফেঁদে ফেললো। অবশ্য সেটা খুব একটা শক্ত হবে না কারণ প্রতিবেশিদের সঙ্গে লারার ভাল সম্পর্ক নেই, কারণ সে বড় একটা কারো সঙ্গে মেলামেশা করতো না। তাছাড়া এটা এমন একটা সম্ভাব্য ব্যাপারও নয়, যেখানে প্রত্যেকটা পরিবার তার প্রতিবেশিদের বংশ কুলুজি এবং রুজি রোজগারের যাবতীয় সব খবর রাখবে। মেয়েছেলে নিয়ে কার্লের ছেনালি করে বেড়ানোর ব্যাপারটা লারা একদম পছন্দ করতো না। ওর ধারণা ছিল সবাই কার্লের এই ব্যাপারটা জানে। (কিন্তু কার্ল সেদিক দিয়ে প্রচণ্ড চালাক) এবং সেই কারণেই নিজেকে লারা প্রত্যেকের কাছ থেকে এতোটা বিচ্ছিন্ন করে রাখতো যে ওর এই আকস্মিক অনুপস্থিতিটা কেউ লক্ষ্য করবে না।

কালিফোর্নিয়ায় লারার এক সম্পর্কের আত্মীয়া আছে, কার্ল চিঠি লিখে দিল। চিঠিতে লিখলো লারা অসুস্থ। তবে চিঠি লেখার সময় এমন হুঁশিয়ার হয়ে লিখলো যাতে তারা খুব বেশি উদবিগ্ন না হয়ে পড়ে। কারণ সে চায় না, লারাকে দেখার জন্য তারা আচমকা এখানে ছুটে আসুক।

আসলে এই আত্মীয়টি খুবই বড়লোক। বস্তুত চারখানা চিঠি একসঙ্গে লিখলো কার্ল। প্রথমে অসুখ, অবস্থার উন্নতি, ফের রোগে আক্রান্ত এবং অবশেষে মৃত্যু। পৃথক পৃথক চারখানা চিঠি লিখে ঠিক করলো এক সপ্তাহ অন্তর অন্তর একটা করে চিঠি সে ডাকে ফেলবে।

কটা দিন কেটে গেল। তৃতীয় দিনে কার্লের খেয়াল হল খুনের রাত্তির থেকে এ যাবৎ সে বাড়ি থেকে একদম বেরোয়নি। নিজেকে মনে মনে খুব গালমন্দ করলো প্রথমে। অবশ্য তার জন্য ভয়ের কিছু নেই—সে বাড়ি থেকে বেরুলে, কেউ যে বাড়িতে ঢুকে তল্লাসী করবে, লাশ খুঁজে বার করবে এমন নয়। তবু এই ধরনের একটা অনুভূতিই যেন তাকে পেয়ে বসেছিল।

ঠিক তখনই দূরভাষ যন্ত্রটা বেজে উঠলো। কার্ল উঠে গিয়ে ফোনটা তুললো। ফোনটা লারার। মাংসের দোকানি বললে, মিসেস বোগান মাংস নিতে আসেননি, ওর কি কিছু হয়েছে?

—না, সেরকম কিছু নয়। শরীরটা ভাল নেই।

মাংসের দোকানির মুখ থেকে সহানুভূতি সূচক দুচারটে কথা যা শোনার কার্ল শুনে নিল তারপর রিসিভারটা নামিয়ে রাখলো।

তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে ভাবলো ফোনে ঠিক যেভাবে ও কথা বললো, সেই ভাবে কথা বলাটা ঠিক উচিত হয়নি। প্রথমে বললে সেরকম কিছু নয় তার পরে বলেছে "ও অসুস্থ।" এই ধরনের জিনিস লোকের মনে সন্দেহ জাগিয়ে তুলতে পারে। শত হলেও কার্লের যেমন ধারণা, প্রতিবেশিরা হয়ত ঠিক ততোটা অন্ধ বা উদাসীন নয়! শেষ অব্দি কারুর না কারুর ঠিক খেয়াল হবে মিসেস বোগানকে দেখা যাচ্ছে না, ওর কি কিছু হয়েছে?

হয়ত লারার কোন বন্ধুবান্ধব থাকতে পারে। কথাটা মনে হতেই কার্ল অনুভব করলো স্ত্রীর স্বভাব ও প্রকৃতি সম্পর্কে সে খুব একটা ওয়াকিবহাল নয়। কাজেই লারা কি করতো না করতো, কাদের সঙ্গে সে কথাবার্তা বলতো—তা সে নিজেও ভাল জানে না। আর জানবেই বা কি করে বাড়িতে সে নিজেই বা থাকতো কতক্ষণ।

সেদিন বিকেলের দিকে একটু ঘুমিয়ে নিল কার্ল। ঘুমের মধ্যে একটা বিশ্রি ধরনের দুঃস্বপ্ন দেখলো। তার অবচেতন মন মরিয়া হয়ে লড়াই করতে লাগলো তাকে ঘুমের বাঁধন থেকে জাগিয়ে তোলার—কিন্তু পারলো না। দেখলো, লারা কবর থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে। মেঝের নিচ থেকে সে নখ দিয়ে আঁচড় কাটছে, তার শব্দটা স্পষ্ট শুনতে পেল কার্ল। তাছাড়া ক্রোধ আর আতঙ্ক মেশানো একটা আর্তনাদ। আঁচড়ের শব্দটা ক্রমশ বেড়ে উঠতে থাকে, তারপর সেটা অসহ্য শব্দ হয়ে যায়। সেলারের শান বাঁধানো মেঝেটা দুলে ওঠে। তারপর একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। ওই বিস্ফোরণে মনে হল গোটা বাড়ির ভিত পর্যন্ত কেঁপে উঠলো। জানলা দরজাগুলো ঠক্‌ঠক্‌ করে উঠলো পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে।

লাফিয়ে উঠে বসে কার্ল। মুখে চোখে আতঙ্ক। চারদিকে তাকায়। না সমস্ত পরিবেশটা ঠিকঠাক আছে, নিঝুম—নিস্তব্ধ। শুধু মাত্র মোজা পরা পায়ে নিচের ঘরটায় ছুটে যায় সে। তারপর নিচু হয়ে দু'হাত দিয়ে গালচেটা সরায়। জায়গাটা ঠিক আগের মতই আছে। গালচেটা আবার টেনে ঠিক করে বিছিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায় কার্ল। তারপর নিজের হাত দুটো দিয়ে নিজেকে নিজের গালে গোটা কয়েক

চড় মারলো। কি বিশ্রি সব চিন্তা। আসলে এই ভাবে দিনরাত বাড়িতে থাকার জন্য, নিজেই নিজের মনকে দুঃস্বপ্নে ভরিয়ে তুলছে।

অতএব একটু বাড়ির বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন। একটু সতেজ মনোভাব নিয়ে বেশ ফুর্তির মেজাজেই বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এলো কার্ল। দুপা এগুতেই তার সামনে দাঁড়ালেন এক মহিলা—এই যে মিঃ বোগান! সঙ্গে সঙ্গে কার্লের হৃদপিণ্ডটা লাফিয়ে উঠলো। প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে সহজ রাখার চেষ্টা করলো।

পাশের বাড়ির মোটাসোটা মহিলাটি নীল রঙের একটা জিনস আর শার্ট পড়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে। কার্লের মনে হল সেই মুহূর্তে যেন একটা ভয়ংকর অজগর তাকে পেঁচিয়ে ধরেছে।

—কেমন আছেন মিঃ বোগান?

—ভাল।

—আপনার মিসেসকে প্রায় হপ্তা খানেক হল একদম দেখছি নাতো?

চমকে উঠলো কার্ল। মাত্র তো তিনদিন হয়েছে ব্যাপারটা এর মধ্যে হপ্তাখানেক। বলে কি মহিলা। এরপর হয়ত কানাকানি শুরু হবে। তারপর তাকে হত্যার দায়ে অভিযুক্ত হতে হবে?

—ওর শরীরটা ঠিক ভাল নেই।

—কি হয়েছে।

—না, তেমন কিছু নয়।

—খুব অসুস্থ কি?

—মনে হয় না।

—ডাক্তার এনেছিলেন?

মহিলার চোখে ইতিমধ্যে অভিযোগের একটা কালোছায়া ফুটে উঠতে দেখলো কার্ল। মহিলা এমন ভাব করছেন যেন কত দরদি। মায়ের চেয়ে মাসির দরদ বেশি কথায় বলে না—তোর কি খোজের দরকাররে মাগী। তবু একটা উত্তর দিতে হল কার্লকে।—হ্যাঁ। উনি বলেছেন ওর এখন সম্পূর্ণ বিশ্রামের প্রয়োজন। একেবারে পুরো বিশ্রাম।

—আমি কি একবার ওর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি। ধরুন ওর জন্য কিছু ভাল রান্না করে পাঠিয়ে দিতে।

—না. না, ওসব আপনাকে করতে হবে না। আমি নিজেই ওর যত্নআত্তি করছি।

—কিন্তু আপনি যখন বেরোন তখন তো ওকে দেখার জন্য একটা লোকের দরকার।

মুখ থেকে একটা খিস্তি বেরিয়ে আসছিল। তবু সামলে নিল কার্ল। বললে—

একটা নার্স রেখে দেব। কথাটা বলেই তার মনে হল, যেন খুব দ্রুত বলা হয়ে গেল।

মহিলা হাসলেন। এখন আর ওর মনের মধ্যে কোনরকম সন্দেহ আছে বলে মনে হল না।

কার্ল আবার বাড়িতে ফিরে দরজায় চাবি লাগিয়ে দিল। তারপর এক জায়গায় বসে গোটা ঘটনাটা পর্যালোচনা করলো। মহিলাকে সে কি কথা বলেছে। আচ্ছা মহিলা কি কোন সন্দেহের কারণে তাকে প্রশ্ন করছেন। মনে হয় না, সৎ অন্তঃকরনের তাগিদেই হয়ত বলেছেন। নার্স ভাড়া করতে না পারলেও একটা লোকের বন্দোবস্ত সে করতে পারে। মানে রান্নাবান্না করবে, ঘরদোর সাফসুফ করবে—তাহলে হয়ত ওই মহিলা আর তাঁকে বিরক্ত করবেন না। এমন ভাব করতে হবে যাতে তিনি ভয়ানক মুমূর্ষ। কাজেই পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য খানিকটা নিশ্বাস ফেললো কার্ল।

ঠিক করলো কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেবে। বিজ্ঞাপনে লেখা হল ঃ গৃহকর্ত্রী অসুস্থ থাকায় ঘর-সংসার দেখাশুনো ও রান্নাবান্না এবং সাফসুফ করার জন্য একজন লোকের দরকার।

বিজ্ঞাপনটা বেরুবা ' কয়েকদিন পর হঠাৎ সকালে দরজায় ঘণ্টা বাজলো। কার্ল দরজা খুলে দিল। মহিলার হাতে একটা ভাঁজ করা কাগজ। কার্ল ভিতরে নিয়ে গিয়ে বসালো। মহিলার লম্বা চেহারা, মুখটা ফ্যাকাশে—সুন্দরী নয় আবার একেবারে সাদামাটা বলা যায় না। এক কথায় বলা যায় প্রায় সুন্দরী, ফ্যাকাশে রঙ, সুন্দর পাতলা ঠোঁট, আর স্বচ্ছ চিন্তাশীল দুটো চোখ। কার্লের অভিজ্ঞ চোখ বলে দিল মহিলার বয়স এখনও চল্লিশ পার হয়নি এবং এই ধরনের মহিলাদের উপর আস্থা রাখা যায়। তাছাড়া মহিলার পেটের মধ্যে অনেক রহস্য ঠাসা আছে, যা হাজার চেষ্টা করেও পেট থেকে বার করা যাবে না।

মহিলার নাম বেট্রাকুল।

মিসেস কুল জানালেন তার স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়ে যাওয়ার পর তিনি শহরের অন্য প্রান্তে একাই বাস করেন। দু-এক কথায় কার্লের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিল। তার ইংরাজি বলার ভঙ্গিমা দেখে মনে হল আইরিশ হবে মেয়েটি।

—রান্নাবান্না জানা আছে?

—হ্যাঁ।

—ঘর-সংসার দেখাশুনো করা?

—হ্যাঁ। তাছাড়া সেবা শুশ্রুষাও করতে পারি—মানে যদি আমাকে তা করতে হয়।

—না, না, তার দরকার হবে না। শুধু মাত্র সংসারের কাজ। মিসেস বোগানের একেবারে নিরিবিলিতে সম্পূর্ণ বিশ্রামের প্রয়োজন। কথাটার গুরুত্ব বোঝাবার জন্য বললে, ওকে ডাক্তার এসে এক সপ্তাহ অন্তর দেখে যায়।

অনেকক্ষণ ধরে স্থির দৃষ্টিতে কার্লের দিকে তাকিয়ে ছিল কুল। মনে হল ও যেন কিছু জানতে চায়। কার্ল ব্যাপারটা বুঝতে পেরে কথার মধ্যে যথেষ্ট আন্তরিকতা আর আবেগ ঢেলে বললে—ওর বাচ্চা হওয়ার কথা ছিল।

মিসেস কুল সহানুভূতি জানালো।

—ও এখন ভীষণ দুর্বল, প্রচণ্ড দুর্বল। সমস্ত আশা না ছেড়ে জিনিসটাকে অমঙ্গলজনক করে তোলার প্রচেষ্টায় হতাশায় চোখ নামালো কার্ল।

কার্লের সঙ্গে মহিলার সব কথাবার্তা পাকা হয়ে গেল।

মিসেস কুল সকালবেলা এসে ঘরদোর সাফ করবে—শুধু নিচতলাটা, আর মিসেস বোগানের রান্নাবান্না করে দেবে। কার্ল সেই খাবারটা ওপর তলায় নিয়ে গিয়ে লারাকে পৌছে দেবে—মানে নিজে খাবে, এবং মিসেস বোগানের মন্তব্য সহ শূন্য থালাগুলো ফের নিচে নামিয়ে আনবে।

এই ভাবেই চলছিল।

—মিসেস কুল আপনি দারুণ রান্না করেন।

—ধন্যবাদ স্যার।

কার্ল ওকে লক্ষ্য করে। দেখতে শুনতে মন্দ নয়। মাঝে মাঝে আবার কার্লের দিকে চোরাচোখে তাকায়। কার্ল বুঝতে পারে তার জন্য একটা গভীর দুঃখ অনুভব করে কুল। তার জন্য আলাদা করে বিশেষ বিশেষ খাবার তৈরি করে দেয় মিসেস কুল এবং জোর করে সেগুলোকে গিলতে হয় কার্লের।

এটাই এখন তার দৈনন্দিন জীবন। একটা সপ্তাহ এমনি চললো, তারপর দু'সপ্তাহ। প্রতিদিন সকালে আর বিকেলে কর্তব্যপরায়ণ স্বামীর মত কাপড় চাপা দেওয়া খাবারগুলো ট্রেতে সাজিয়ে কার্ল উপর তলায় নিয়ে যায় লারার জন্য, তারপর ঘরের দরজা বন্ধ করে নিজে খায়।

প্রতিদিন বিকেল চারটের সময় বিদায় নেয় মিসেস কুল। একদিন কার্ল ওকে বাস স্টপ পর্যন্ত এগিয়ে দিল।

—ওর কি কোন উন্নতি হচ্ছে? মিসেস কুল প্রশ্ন করলেন।

—না, ওই একই রকম। কার্ল মাথা নাড়ল। খুব একটা ভাল নয়।

—নিশ্চয় উনি বাচ্চাটার কথা ভাবেন।

—খুব সম্ভব তাই।

বাস স্টপ এসে গিয়েছিল। কার্লের দিকে তাকালো মিসেস কুল তারপর বললে—আপনাকে একটা কথা খোলাখুলি ভাবে জিজ্ঞাসা করবো?

—কি কথা?

—আপনার কি মনে হয় ওর সেরে ওঠার কোন সম্ভাবনা আছে?

—কথাটা যেন শুধু আমার আর আপনার মধ্যে থাকে মিসেস কুল বলেই কার্ল বললে—মনে হয় না। ডাক্তারের কথাবার্তা শুনে তাই মনে হয়।

—ইস্ কি সাংঘাতিক করুণ অবস্থা আপনার। এই ধরনের নিঃসঙ্গতা যে কি জিনিস তা আমি জানি। আমার নিজের জীবন দিয়েই সেটা ভালভাবে বুঝেছি।

—আপনি বুঝতে পারেন?

—পারি।

পরের কথাটা আর চেপে রাখতে পারে না কার্ল।

বলে ফেলে—হয়ত আমরা একজন অন্যজনকে খানিকটা আনন্দ দিতে পারি।

কার্ল কোন জবাব প্রত্যাশা করেনি। কিন্তু মিসেস কুল তাকে অবাক করে দিয়ে বললে—একদিন সন্ধ্যেবেলা কোন একজন প্রতিবেশিকে ওর কাছে বসিয়ে আমরা দুজনে তো একটা সিনেমা দেখতে পারি। তাতেও হয়ত আপনার মন কিছুটা হাল্কা হবে।

—হ্যাঁ। তা হতে পারে এবং মনটা যে ভাল হবে তা আমি বলতে পারি। কার্লের মুখটা খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।

অতএব একজন করে প্রতিবেশি প্রতি সন্ধ্যায় আসতে শুরু করলো আর কার্ল আবার শুরু করলো তার সেই ছেনালিপানা। শুরু হল মেয়েমানুষ নিয়ে ঘাটাঘাটি। আনন্দে ডগমগ হয়ে উঠলো ওদের সন্ধ্যেগুলো।

কার্লকে দেখে তখন মনে হয় না ওর স্ত্রী মৃত্যু পথযাত্রী। তার জন্য তার মনে কোন বেদনা আছে। মিসেস কুলকে নিয়ে সিনেমায় যাচ্ছে, একসঙ্গে নাচ, গান এবং পান—সবই চলছে তারপর তাকে আবার বাড়িতেও পৌছে দিতে আরম্ভ করলো কার্ল।

কুল বললে একদিন, জানো কার্ল আমার নিজেকে কি মনে হয়।

—কি।

—মনে হয় আমি যেন একটা স্কুলের মেয়ে হয়ে গেছি।

কার্ল বললে, আমার ধারণা আমাদের দুজনের একটা পরিবর্তনের প্রয়োজন ছিল।

—তুমি নিশ্চয় মনে করো না যে আমরা কাজটা অন্যায় করছি।

—মোটেই না। ও সব চিন্তা মাথা থেকে সরিয়ে ফেল। এখন থেকে স্রেফ আমরা দুজন মানুষ, পরস্পরের জন্য তৈরি। জীবনে কোন দুর্ভাগ্য আমাদের আনন্দ থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না।

—আচ্ছা কার্ল মিসেস বোগান আর কতদিন এই ভাবে জীবনটা বয়ে বেড়াবেন বলে তোমার ধারণা?

—সেটা কি করে বলি বলো। ও শুধু একভাবে শুয়ে থাকে।

—মনে হয় ওর জীবন অনন্ত তাই না।

—ঠিক তাই। মরেও যেন মরে না।

কার্ল ঠিক এই জিনিসটাই চাইছিল। এবার কি করা উচিত। তা আবার সে নতুন করে ভাবতে লাগলো। হ্যাঁ লারা মারা গেছে—এমন একটা কথা রটিয়ে দিতে পারে। কিন্তু তাতে ফের নতুন সমস্যা দেখা দেবে। সমাধিস্থ করার ব্যাপারটা গোপন রাখা তো চলবে না। তার জন্য লোকজনের দরকার। মৃত্যু সম্পর্কিত একটা প্রমাণ পত্র সংগ্রহ করা প্রয়োজন। তাছাড়া অন্ত্যোষ্টিক্রিয়ায় ঠিকাদারের ব্যাপারটাও রয়েছে।...নানা ধরনের জটিলতা...

বেট্টাকুলকে সমস্ত কথাটা একবার খুলে বলার কথা ভাবলো। সে সত্যি ভালবেসে ফেলেছে মেয়েটাকে। আর ভালবাসা মেয়েদের খুব তাড়াতাড়ি ক্রীতদাসী করে তোলে।

সম্ভবত একটা কাজই কার্লের পক্ষে করা সহজ...সেটা হচ্ছে স্রেফ উধাও হয়ে যাওয়া। হয়ত সেই কঙ্কালটার মত পঞ্চাশটা বছর লারার কেউ কোন হদিশ পাবে না। নিরুদ্দেশ হওয়ার আগে শুধু রটিয়ে দিতে হবে, স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য লারাকে নিয়ে সে বিদেশ যাচ্ছে। সেখানেই ব্যাপারটার পরিসমাপ্তি ঘটবে। তখন কে আর ভূগর্ভের ঘরটার মেঝে খুঁড়ে দেখার কথা ভাববে?

ওপরের ঘরে বসে এসব কথা চিন্তা করতে করতে লারার জন্য তৈরি করা খাবারগুলো খাচ্ছিল কার্ল। বাড়িটা সে বিক্রি করতে পারে। তাতে কিছু ডলার পাওয়া যাবে। অবশ্য লারার নাকি সমস্ত বাকি সম্পত্তি খোয়ানোর জন্য দুঃখ হচ্ছিল...।

ঠিক তখনই কার্লের মাথায় একটা নতুন পরিকল্পনা খেলে গেল।...কে সে লারার সম্পত্তি হারাবে?

লারার জায়গায় বেট্টাকে রাখতে পারলেই সমস্ত ঝামেলা মিটে যায়। সমাধিস্থ করার সময় বাইরের কোন লোকজনকে না বলে শুধু মাত্র ঠিকাদারদের দিয়ে কাজটাকে চুকিয়ে ফেলা—ঠিকাদারেরা তো আর লারাকে চেনে না। কিন্তু সাবধানে কাজটা করতে হবে। খালি থালাগুলো নিয়ে রান্নাঘরে আসে কার্ল।

—উনি ঠিক মত খেয়েছেন তো?

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা কার্ল তুমি আমাকে ভালবাস?

—তুমি তো জানো বেট্টা। সত্যি কথা বলতে কি ওপর তলায় বসে আমি সারাক্ষণ তোমার কথায় ভাবি।

—উনি যখন থাকবেন না তখনও তুমি আমাকে ভালবাসবে?

—আরও বেশি করে ভালবাসব।

—তা হলে শীঘ্রই সেই দিনটা এসে গেছে কার্ল।

—তার মানে।

শূন্য থালাগুলোর দিকে তাকিয়ে বেট্টা বললে—ব্যাপারটা ওর পক্ষে যাতে সহজ হয়, সেইজন্য আজ ওর খাবারে আমি যথেষ্ঠ পরিমাণ বিষ মিশিয়ে দিয়েছিলাম।

কথাটা কানে যেতেই কার্লের মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তার পরেই অনুভব করলো একটা গুরুতর জিনিস, যেন তার সমস্ত চেতনা ঘিরে মেঘের মত একটু একটু করে ছড়িয়ে যাচ্ছে! বেট্টা বিস্মিত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকায়। তার সামনে মাটিতে পড়ে হিংস্রভাবে নিজের শরীরটাকে মোচড়াতে থাকে কার্ল, ঠিক যেমন করে লারা মৃত্যুর সময় বাঁচতে চেয়েছিল। কেবল একটা মাত্র শব্দ তার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো—মুর্খ। বেট্টা অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে মৃতদেহটার দিকে।

সিলভার ব্লেজ

শার্লক হোমস

সেদিন সকালে চা খেতে খেতে হঠাৎ হোমস বললে, ওয়াটসন এবার হয়ত আমাকে শহর ছাড়তে হবে।

আমি ওর দিকে তাকিয়ে বললাম—শহর ছেড়ে যাবে কোথায়?

—ডর্টমুর অথবা কিংস পাইল্যাণ্ড।

ওর কথায় আমি একদম অবাক হলাম না। আসলে তখন একটা ঘটনা গোটা ইংল্যাণ্ড জুড়ে প্রচণ্ড আলোড়ন তুলেছে। এতদিন যে হোমস কেন এই ঘটনার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেনি এটাই ছিল আমার কাছে পরম বিস্ময়।

আমি তাকিয়ে দেখলাম আমার বন্ধুটি অস্থির ভাবে ঘরময় পায়চারি করে বেড়াচ্ছে। পাইপে কড়া তামাক পুরে ঘন ঘন টান দিচ্ছে। আমার কোন কথা তার কানে এখন পৌঁচ্ছবে বলে মনে হল না।

আমরা খবরের কাগজের প্রতিটি সংস্করণ পেয়েছি, কিন্তু তা থেকে খুশি হবার মত কোন খবর ছিল না। সকলের মুখে তখন একটা খবর—ওয়েসেক্স কাপের বাজিতে প্রথম পদক পাবার মত ঘোড়া সিলভার ব্লেজ নিখোঁজ হয়েছে আর তার ট্রেনার হয়েছে নিহত।

ঘটনাটার গুরুত্ব ছিল এত বেশি যে গোটা ইংল্যাণ্ড জুড়ে প্রচণ্ড ঝড় উঠলো।

আমি বললাম—আমি কি তোমার সঙ্গে যেতে পারি।

—আপত্তি করবো না। তুমি সঙ্গে থাকলে আমার ভালই লাগবে। আর তাছাড়া আমার বিশ্বাস, তোমার দিক দিয়েও মনে হয় সময়টাকে অপব্যবহার করেছ বলে মনে হবে না। এই ব্যাপারটার মধ্যে এমন কতগুলো জিনিস লক্ষ্য করার আছে, যা মানুষের মনে কৌতূহল সৃষ্টি করতে পারে। তবে এখন আর তোমাকে এর বেশি কিছু বলতে পারবো না, যা বলার ট্রেনে যেতে যেতে বলবো।

আমরা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লাম। স্টেশনে এসে গাড়ি ধরলাম। বসলাম একটা প্রথম শ্রেণির কামরায়। গাড়ি ছুটতে শুরু করলো। আমি চুপচাপ বসে চুরুট টানছিলাম আর হোমস পেডিংটন স্টেশন থেকে কেনা একগুচ্ছ খবরের কাগজের উপর চোখ বোলাচ্ছিল। রিডিং পার হয়ে যাওয়ার পর হঠাৎ আমার বন্ধুটি বললে, এখন

আমরা ঘন্টায় চুয়ান্ন মাইল বেগে যাচ্ছি তাই না। বেশ জোরেই ছুটছে গাড়িটা। আমি মাইল স্টেশনগুলোর দিকে লক্ষ্য করিনি।

আমিও দেখিনি। কিন্তু পথের ধারে পোঁতা টেলিগ্রাফের তারগুলো দেখলেই তো বোঝা যাবে সব। আমার হিসাবটা ওখান থেকেই করা। আচ্ছা ওয়াটসন, তুমি জন স্টেকারের মৃত্যু আর সিলভার ব্লেজের নিরুদ্দেশের খবরটা নিশ্চয় ইতিমধ্যে জেনে গেছ?

—তেমন কিছু নয়, যেটুকু টেলিগ্রাফ আর ক্রনিকলে বেরিয়েছে, সেইটুকু পড়েছি।

হোমস বললে—এই ধরনের ঘটনা খুব একটা বেশি ঘটে না, তবে তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করার থেকে আমাদের নজর দিতে হবে ছোট ছোট ঘটনাগুলোর উপর। ঘটনাটাকে আমরা সাধারণ ভাবে দুর্ঘটনা বলতে পারি। আবার অনেকের কাছে এটা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে সত্যিকারের খবর পাওয়া খুব মুশকিল। তবে তথ্যগুলো সঠিক ভাবে জানতে পারলে তার উপর নির্ভর করে আমরা একটা সিদ্ধান্তে আসতে পারি।

হোমস বলতে লাগলো। মঙ্গলবার সন্ধ্যেবেলা ঘোড়ার মালিক কর্ণেল রস আর তদন্তকারী ইন্সপেক্টর গ্রেগরি আমাকে একটা তার করেছেন। ওরা এই ব্যাপারে আমার সাহায্য চায়।

আমি বললাম—সেকি, মঙ্গলবার তার পেয়েছ আর আজ তো বৃহস্পতিবার। গতকালই তো তাহলে তোমার রওনা হওয়া উচিত ছিল।

উচিত তো অনেক কিছুই ছিল। হয়ত তোমার মত সকলেই একথায় বলবে। আর তোমার লেখা পড়ে যারা আমার সম্বন্ধে একটা বানানো ধারণা করেছে তারা ছাড়া, সবাই বলবে এটাই স্বাভাবিক। আসলে কি জানো বন্ধু, উত্তর ডর্টমুরের মত একটা জনবিরল জায়গায় সারা ইংল্যাণ্ডে আলোড়নকারী একটি বিশিষ্ট ঘোড়াকে যে এতক্ষণ লুকিয়ে রাখা যাবে এটাই আমি ভাবতে পারিনি। কাল আমি প্রতিটা মুহূর্তে আশা করেছি যে খবর পাবো ঘোড়াটাকে খুঁজে পাওয়া গেছে। আর যিনি ঘোড়াটি চুরি করেছেন, তিনি হচ্ছেন জন স্টেকারের হত্যাকারি। কিন্তু আরও একটা দিন কেটে গেল, পুলিশ কিছুই হদিশ করে উঠতে পারেনি। তারা শুধু কেবল সিম্পসন বলে একজন ছোকরাকে আটক করেছে এই যা মাত্র খবর, তাই ভাবলাম এবার আমার আসরে অবতীর্ণ হওয়ার সময় হয়েছে। তবু নানা কারণে আমি বলবো যে গতকালের দিনটা বৃথা যায়নি।

—তাহলে তুমি নিশ্চয় কিছু একটা সিদ্ধান্ত করেছ?

—সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছি এমন কথা বলবো না, তবে তথ্যগুলো হাতের মুঠোর মধ্যে এসেছে। আর এই ব্যাপারে তোমাকে আমার সবিস্তারে কিছু বলার দরকার।

তুমি তো জানোই আমি সব সময় তোমাকে গোটা ব্যাপারটা সবিস্তারে গুছিয়ে আগেভাগে বলে রাখি, এর কারণ হলো এই ধরনের বলার মধ্যে দিয়ে ঘটনাটা অনেক সময় পরিষ্কার হয়ে যায়। আর তাছাড়া আমি ঠিক কোন অবস্থা থেকে কাজটা শুরু করেছি সেটা যদি তোমাকে না জানাই তাহলে তোমার সহযোগিতা পাবো কি করে বলো।

আমি মৃদু হাসলাম। মুখে কোন জবাব না দিয়ে চুরুটে টান দিতে লাগলাম। হোমস আমার দিকে সামনে ঝুঁকে বাঁ হাতের চেটোর উপর তার ডানহাতের লম্বা শীর্ণ তর্জনীটা পেনসিলের মত করে দাগ টেনে মূল কারণগুলো সংক্ষেপে বলতে লাগলো।

সিলভার ব্লেজ হল ইসোনমি বংশ জাত। প্রসিদ্ধি ও অভিজাতপূর্ণ পুরুষদের মতই সে তার মালিকের ভাগ্য খুলে দিয়েছে। বয়স তার পাঁচ বছর অথচ এই পাঁচ বছর বয়সে সে ঘোড়াদৌড়ের প্রায় সবগুলো পুরস্কার জিতে গেছে। দুর্ঘটনা ঘটার আগে পর্যন্ত ওয়েসেক্স কাপের খেলায় ওটাই ছিল পয়লা নম্বর। আর বাজি ছিল তিনপাউণ্ডে একপাউণ্ড।

যারা রেসুরে তারা সকলেই সিলভার ব্লেজ বলতে পাগল। তাই এই রকম বেয়াড়া দর থাকা সত্ত্বেও ওর পিছনে লোকে মোটা মোটা পাউণ্ড বাজি ধরে। কাজেই পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে আসছে মঙ্গলবার ঠিক সময় যাতে সিলভার ব্লেজ মাঠে হাজির হতে না পারে তার জন্য চেষ্টা বা আগ্রহ ছিল অনেকের।

কর্ণেলের শিক্ষণ আস্তাবল কিংস পাইল্যাণ্ডে-এ সবাই ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝে গিয়েছিলেন। তাই ঘোড়াটার উপর বিশেষ নজর রাখা হয়েছিল। জন স্ট্রেকার আগে ছিলেন জকি। কর্ণেল রসের হয়েই তিনি বহুবার ঘোড়দৌড়ে নেমেছিলেন। এরপর ওজন ভারি হয়ে যাওয়ায় জকির কাজ ছেড়ে দিয়ে ট্রেনার হয়ে আছেন। তিনি পাঁচ বছর কর্ণেলের জকি আর সাত বছর ট্রেনার হিসাবে কাজ করছেন। জকি এবং ট্রেনার উভয় দিকেই ভদ্রলোক যথেষ্ট সুনাম পেয়েছেন। বাজারে তার কোন দুর্নাম নেই। সবাই জানে লোকটি অত্যন্ত সৎ। কর্ণেলের আস্তাবলে মাত্র চারটে ঘোড়া আছে, কাজেই আস্তাবলটা খুব একটা বড় নয়। তার আস্তাবলে কাজ করে তিনটি ছোকরা। প্রতি রাতে তারা পালা করে পাহারা দেয়। এই যে তিনজন ছোকরা—এরাও খুব ভাল স্বভাবের। এবার স্ট্রেকারের কথা বলি—লোকটির অবস্থা যথেষ্ট স্বচ্ছল। সংসার বলতে কেবল স্ত্রী। ছেলেপুলে নেই। ঘরের কাজকর্ম করার জন্য একটা ঝি নিয়ে ওরা থাকেন আস্তাবলের দুশো গজ দূরে। এই অঞ্চলটা খুবই নির্জন। আশপাশে বাড়িঘর বলে কিছু নেই। তবে আধমাইল উত্তরে ট্যাভিস্টকের এক ঠিকাদার, স্বাস্থ্যন্বেষীদের বা ডর্টমুরের বিশুদ্ধ বায়ুসেবীদের ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত কয়েকটা ছোটখাটো ভিলা তৈরি করেছেন। ফলে মাঝে

মধ্যে ওখানে বহু বিদেশী এবং অসুস্থ ব্যক্তিরা এসে শান্তিতে আরামে কিছু দিন থেকে যায়। আর প্রান্তরটির ওপারে, প্রায় দু মাইল দূরে কেপলটন গ্রাম। এখানে লর্ড ব্যাঙ্ক ওয়াটারের একটা বেশ বড় ধরনের শিক্ষণ আস্তাবল আছে। এটার দেখাশুনা করেন সাইলাস ব্রাউন। এখানে ওখানে দুএকঘর ভবঘুরে বেদে ভিন্ন আর কোন বসতি নেই। চারদিক সীমাহীন নিস্তব্ধ নির্জনতা। সোমবার দুর্ঘটনার রাতে এই রকমই ছিল ওখানকার অবস্থা।

ঘোড়াগুলোকে দস্তুর মত চড়িয়ে এনে সন্ধ্যেবেলাতেই নিয়মিত ঘাসজল খাইয়ে রাত নটার মধ্যে তালা বন্ধ করে দেওয়া হয়। ছোকরা তিনজনের মধ্যে লেড হান্টার পাহারা দেবার জন্য থেকে গেল আর অন্য দুজন গেল স্ট্রেকারের রান্নাঘরে খেতে। নটার পর ঝি এডিথ একটা বাস্কে লেডের খাবার জন্য রুটি-মাংস নিয়ে এলো, আস্তাবলে জলের ব্যবস্থা থাকায় ঝিকে পানীয় কিছু আনতে হয়নি। কারণ রাত পাহারার ছোকরা জল ছাড়া অন্য পানীয় কিছু খায় না—এটাই হল কানুন। রাতের অন্ধকারে লণ্ঠন হাতে নিয়ে এডিথ আস্তাবলের দিকে যখন আসছিল, তখন সে আস্তাবলের তিরিশ গজ দূরে একজন ভদ্রলোককে দেখতে পায়। লণ্ঠনের মৃদু আলোয় এডিথ দেখেছিল ভদ্রলোকের পরণে ছিল ছাই রঙের পোশাক, মাথায় কাপড়ের টুপি—ছিমছাম এবং মার্জিত। তার ধারণায় ভদ্রলোকের বয়স তিরিশের বেশি হবে না। কিন্তু লোকটার মুখ চোখ ছিল অত্যন্ত ফ্যাকাশে আর কেমন যেন উসখুসে ভাব। হঠাৎ করে এডিথের মুখোমুখি হওয়ায় লোকটি একটু থতমত খেয়ে গিয়ে তাকে বললে, এ আমি কোথায় এসে পড়েছি বলতে পারো? আমি তো ঠিক জায়গাটা চিনতে পাচ্ছি না। আমার মনে হচ্ছে এই উম্মুক্ত প্রান্তরের মধ্যেই আমাকে রাতটা কাটাতে হবে।

এডিথ বললে—আপনি কিংস পাইল্যাণ্ড শিক্ষণ আস্তাবলের কাছে এসেছেন।

শুনে যেন তিনি আস্বস্ত হলেন এবং বললেন—তাই নাকি। কি সৌভাগ্য আমার। এরপর ভদ্রলোক বললেন, শুনেছি ওখানে নাকি রোজ রাত্রে একটা ছোকরা একাই শোয়।

এডিথ তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। ভদ্রলোক হঠাৎ তাকে বললেন, তোমার যদি একটা ভাল নতুন পোশাক কেনার জন্য পাউণ্ডের দরকার হয় তো আমি তোমাকে তা দিতে পারি—এতে কি তুমি খুব রাগ করবে? এই বলে একটা টুকরো ভাঁজ করা কাগজ বার করে তিনি বললেন, এইটা গিয়ে আজ রাতে যে ছোকরা পাহারায় আছে তাকে দিও, সত্যি বলছি কাল আমি তোমায় বাজার থেকে একটা সেরা জামা কিনে এনে দেব।

খোলা জানলার ধারে হাণ্টার একটা টেবিলে বসে ছিল। ভদ্রলোকের আগ্রহ দেখে এডিথ খুব ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে রোজকার মত সেই জানলায় খাবার নিয়ে দাঁড়ালো এবং তারপর যা যা ঘটেছে সব কথা হাণ্টারকে বলছিল।

ঠিক সেই সময় ভদ্রলোকও সেখানে গিয়ে পৌচ্ছলেন।

জানলার ধারে দাঁড়িয়ে তিনি শুভেচ্ছা জানিয়ে বললেন, তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা ছিল। এডিথ দিব্যি দিয়ে বলেছে, যে ভদ্রলোক কথা বলার সময় হাতের মুঠোর থেকে কাগজের একটা কোণা সে বার হয়ে থাকতে দেখেছে। রাতের পাহারাদার ছোকরা লোকটিকে বললে—আপনার এখানে কি দরকার মশাই।

ভদ্রলোক বললেন, স্রেফ দুটো কথা ভাই তোমায় জিজ্ঞাসা করবো, যাতে তোমার পকেটে দুটো পা উশু আসে এই আর কি! ওয়েসেক্স কাপে তো তোমাদের দুটো ঘোড়া খেলবে—সিলভার ব্রেজ আর বেয়ার্ড তাই না? আমাকে পাকা খবরটা দিলে তোমার কোন ক্ষতি হবে না। আচ্ছা এটা কি সত্যি যে ওজন নেবার সময় বেয়ার্ড নাকি সিলভার ব্রেজকে পাঁচ ফার্ল-এ একশো গজ মেরে দিতে পারতো? আর তোমরা নাকি তার পিছনেই সমস্ত ডলার বাজি ধরেছ?

ছেলেটি চিৎকার করে বললে—ও বুঝেছি, তুমি হচ্ছ ওই টাউটদের দলের একজন। দাঁড়াও তাদের সঙ্গে আমরা কিংস পাইল্যাণ্ডের লোকেরা কি রকম ব্যবহার করি এক্ষুণি টের পাইয়ে দিচ্ছি। এই বলে সে লাফ দিয়ে গেল কুকুরটাকে খুলে দিতে। এডিথ ছুটে বাড়ি পালালো। যেতে যেতে একবার পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখতে পেল যে ভদ্রলোক জানলা দিয়ে ঘরের দিকে ঝুঁকে আছেন। খানিকবাদে হাণ্টার কুকুর নিয়ে তেড়ে এসে দেখলো লোকটা পালিয়েছে। চারদিক ঘুরেও সে তার টিকিটি পর্যন্ত দেখতে পেল না।

এই পর্যন্ত শোনার পর আমি বললাম, আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, হাণ্টার কুকুর নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় কি দরজা খুলে গিয়েছিল?

আমার সঙ্গী আমার প্রশ্ন কে তারিফ করে বললে—ওয়াটসন এটা চমৎকার বলেছ। এই ব্যাপারটা এতই গুরুত্বপূর্ণ যে আমার মাথায় খেলবার সঙ্গে সঙ্গেই ডর্টমুরে বিশেষ জরুরী তার পাঠিয়ে আমি বিষয়টার মীমাংসা করে নিয়েছি। তারপর বললে, হ্যাঁ ছোকরা বাইরে যাওয়ার আগে দরজা বন্ধ করেই গিয়েছিল। আর এ'ও সত্যি যে জানলাটা এতটা চওড়া যে একটা মানুষ সেখান দিয়ে গলে ভিতরে যেতে পারে।

হাণ্টার অপেক্ষা করতে লাগলো। তার সঙ্গীরা ফেরার পর যা যা ঘটে ছিল সব বলে তারা ট্রেনারের কাছে গেল। হাণ্টার অবশ্য যায়নি। সমস্ত ঘটনা শুনে ট্রেনার স্ট্রেকার অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। তবে তিনি যে খুব একটা গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন এটা ঠিক মনে হল না। তবু তিনি যেন অস্বস্তিবোধ করছিলেন। রাত একটার সময় তার ঘরে আলো জ্বলতে দেখে শ্রীমতী স্ট্রেকার সবিস্ময়ে তার ঘরে ঢুকে দেখেন তিনি জামা-কাপড় পরে তৈরি হচ্ছেন।

—কোথায় যাচ্ছ এত রাতে? এই প্রশ্নটা শ্রীমতী স্ট্রেকার জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন, ঘোড়াগুলোর জন্য তার ঠিক ঘুম হচ্ছে না কাজেই আস্তাবলটা একবার ঘুরে দেখার দরকার। শুনে শ্রীমতী স্ট্রেকার তাকে বললেন, এত রাতে কি তোমার না গেলেই নয়। কিন্তু স্ট্রেকার বললেন, এই ব্যাপারে তার একটা দায়িত্ব আছে। এই দায়িত্বকে তিনি কিছুতেই অস্বীকার করতে পারেন না। কাজেই তিনি তার স্ত্রীর সমস্ত অনুরোধ উপেক্ষা করে একটা বর্ষাতি টেনে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন।

পরের দিন সকাল সাতটায় ঘুম ভেঙ্গে শ্রীমতী দেখলেন তার স্বামী তখনও ফেরেন নি। তিনি এডিথকে ডেকে তাড়াতাড়ি পোশাক বদল করে নিয়ে আস্তাবলের উদ্দেশে গেলেন। সেখানে গিয়ে দেখতে পেলেন দরজাখানা আলগা, আর ভিতরে একটা চেয়ারে হাণ্টার জড়সড় হয়ে আচ্ছন্নের ঘোরে বসে আছে। আর গোটা আস্তাবলটা খাঁ খাঁ করছে। সর্বজন বাজি মাৎকারি ঘোড়া সিলভার ব্লেজ এবং তার ট্রেনার কারো কোন চিহ্ন নেই।

সাজঘরের উপরে খড়কাটার ঢঙে যে ছোকরা দুটো ঘুমিয়েছিল তিনি তাদের ডেকে তুললেন। না তাদের ঘুম নাকি এত গাঢ় হয়েছে, তাই তারা রাতে কি ঘটেছে কিছুই বলতে পারলো না। আর হাণ্টার তো ওষুধের ঘোরে আচ্ছন্ন, তার কাছে কোন কিছু হদিশ পাওয়া সম্ভব নয়। এই অবস্থায় মহিলা ওই ছোকরাকে নিয়ে স্ট্রেকারের উদ্দেশে ছুটলেন। তাদের তখনও আশা ছিল যে হয়ত তারা দেখবেন যে কোন কারণেই ঘোড়াটাকে হয়ত তিনি ভোরবেলা ঘোরাতে নিয়ে গেছেন। বাড়ির কাছে টিবিটায় উঠলে প্রান্তরের সবটাই প্রায় পরিষ্কার দেখা যায়। সেই কারণেই তারা টিবিটার উপরে উঠলেন। চারদিকে নজর দিতেই তারা বুঝতে পারলেন কোন একটা দুর্ঘটনার মুখোমুখি তারা হতে চলেছেন। আস্তাবলের সিকি মাইল দূরে একটা হলদে ফুলের ঝোপ গোছের পাশে দেখা গেল স্ট্রেকারের কোটটা ঝুলছে। তার ঠিক পিছনে প্রান্তরের একটা খাদের তলায় হতভাগ্য ট্রেনার স্ট্রেকার পড়ে আছেন। তার মাথাটা মনে হয় কোন ভারি অস্ত্রের আঘাতে চুর্ণ হয়ে গেছে। আর দাবনাতে দেখা গেল একটা ধারালো অস্ত্রের গভীর চিহ্ন। স্ট্রেকারের সঙ্গে যে আততায়ী সমানে যুজেছেন, তার প্রমাণ পাওয়া গেল তার হাতের মুঠোয় ধরা ছোট ছুরিটার বাঁট পর্যন্ত রক্ত জমে থাকতে দেখে। তার বাঁ হাতে একটা লাল কালো রেশমি গলাবন্ধ ছিল, সেটা দেখে এডিথ চিনতে পারলো গতকাল সন্ধ্যায় সেই ভদ্রলোক এটা পরেই আস্তাবলে এসেছিলেন। হাণ্টারের আচ্ছন্নতা কাটার পর সেও সনাক্ত করলো ওই রেশমি গলাবন্ধটাকে। উপরন্তু গলায় জোর দিয়ে বললে, ঐ ভদ্রলোকই জানলার সামনে দাঁড়িয়ে তার খাবারে ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছিলেন যাতে সে রাতভোর আচ্ছন্ন থাকতে পারে। ধস্তাধস্তির সময় যে নিরুদ্দেশ ঘোড়াটি

সেখানেই ছিল তার যথেষ্ট প্রমাণ খাদের তলায় কাদার মধ্যে ছিল। মোটা পুরস্কার সত্ত্বেও, ডর্টমুরের বেদেরা সর্তক থাকা সত্ত্বেও ঘোড়াটির কিন্তু কোন হদিশ নেই। শেষ পর্যন্ত হান্টারের খাবার পরীক্ষা করে জানা গেল, যে তার খাবারে প্রচুর পরিমাণ আফিমের গুঁড়ো মেশানো হয়েছিল কেননা, ওই একই রান্না খেয়ে বাড়ির অন্য কারো কিছু হয়নি। অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে, তার খাবারে আলাদা করে আফিমের গুড়ো মিশিয়ে দেওয়া হয়। এই হল গোটা ঘটনা আর পুলিশ এই ব্যাপারে কতটা কি করেছে এবার সেটা বলছি শোন।

এই বলে হোমস বলতে লাগলেন। এই দুর্ঘটনার তদন্তের ভার পড়েছে ইন্সপেক্টর গ্রেগরির উপর। লোকটি অত্যন্ত চৌকস। তবে কল্পনাশক্তির অভাব। যদি ওর মধ্যে কল্পনাশক্তি কিঞ্চিৎ থাকতো তাহলে এতদিনে প্রভূত উন্নতি করতে পারতো। অকুস্থলে উপস্থিত হয়ে প্রথমেই সে সন্দেহজনক ব্যক্তিটিকে খুঁজে বার করে গ্রেপ্তার করে। লোকটি ভিলাতেই বাস করছিলেন। কাজেই তাকে খুঁজে বার করতে কোন অসুবিধে হয়নি। ভদ্রলোক শিক্ষিত, সদ্বংশজাত। নাম হচ্ছে ফিটজরয় সিম্পসন। একসময় তিনি বিশাল সম্পত্তির মালিক ছিলেন, কিন্তু ঘোড়ার লেজে প্রায় সব পাউণ্ড উড়িয়ে দিয়ে আপাততঃ তিনি লণ্ডনের স্পোর্টিং ক্লাবগুলোর হয়ে গোপনে ভদ্রভাবে বুকির কাজ করছেন। তার খাতাপত্তর দেখে জানা গেল যে সম্ভাব্য বিজয়ী ঘোড়ার নামে পাঁচ হাজার পাউণ্ড বাজি তিনি নথিভুক্ত করেছেন। তাকে ধরা হলে তিনি পরিষ্কার জানালেন কিংস পাইল্যাণ্ডের দুনম্বর ঘোড়া বেয়ার্ডের সম্পর্কে তিনি খবর সংগ্রহের জন্য ডর্টমুর অঞ্চলে এসেছিলেন। আগের রাতের ঘটনা সম্পর্কে কোন কথাই তিনি বিন্দুমাত্র অস্বীকার করলেন না। কিন্তু বারবার বলতে লাগলেন ঘোড়াটার খাঁটি খবর জানা ছাড়া তার আর কোন দুরভিসন্ধি ছিল না।

গলাবন্ধ ব্যাপারটা জিজ্ঞাসা করতেই তার মুখ চোখ ফ্যাকাশে হয়ে যায় আর কি করে যে সেটা মৃতব্যক্তির হাতে গেল তার কোন সন্তোষজনক কৈফিয়ত তিনি দিতে পারেন নি। বরং তার ভিজে জামা কাপড় দেখে বোঝা গেল গতকাল রাতে ঝড় বৃষ্টির সময় তিনি বাইরে ছিলেন আর তার মাথামোটা পেলাঙ লাইনার লাঠিটা এমন একটা অস্ত্র যার কয়েকটা ঘায়েই মৃতের চেহারা বীভৎস ও কদর্য হয়ে উঠতে পারে। অপরপক্ষে স্ট্রেকারের হাতের ছুরি দেখে মনে হয় যে তার আততায়ীকে অত্যন্ত গুরুতরভাবে আহত হতে হয়েছে। কিন্তু সিম্পসনের শরীরে কোন আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায় নি। লোকটাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে—এই হল সংক্ষেপে পুলিশের কাছের বিবরণ।

হোমস যখন সমস্ত ঘটনাটা আমাকে খুঁটিয়ে বলছিল, তখন আমি হাঁ হয়ে শুনছিলাম। ঘটনাটা যদিও মোটামুটি ভাবে আমার জানা ছিল, তবু সেগুলির মধ্যে

কোন যোগসূত্র আমি খুঁজে পাইনি বা কোন গুরুত্ব ঠিক উপলব্ধি করিনি, কাজেই আমি মন্তব্য করলাম, আচ্ছা এমনও তো হতে পারে মাথায় চোট লাগার পর যন্ত্রণায় ছটফট করার সময় ভদ্রলোক নিজের ছুরিতে নিজেই নিজের দাবনা কেটে ফেলেছেন?

হোমস হাসলো। বললে—সেটাই সম্ভব। তাহলে অবশ্য অভিযুক্তের স্বপক্ষে একটা জোরালো যুক্তি খাড়া করা যায়।

আমি বললাম, তবু পুলিশের এই ব্যাপারে কি অভিমত তাই আমি বুঝে উঠতে পারছি না।

আমার কথায় হোমস বললে—আমার তো সন্দেহ হচ্ছে আমরা যে কোন সিদ্ধান্তই খাড়া করি না কেন, তার বিরুদ্ধেই জোরালো যুক্তি খাড়া করা যাবে। ধরে নিলাম যে পুলিশ মনে করছে সিম্পসন ছোকরাটাকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে যে করেই হোক একটা চাবি জোগাড় করে আস্তাবল খুলে ঘোড়াটাকে চুরি করার মতলবে সেটাকে বাইরে বার করে নিয়ে গেছে। ঘোড়ার জিনটাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, মনে হয় সেটা ঘোড়াটার সঙ্গেই লাগানো আছে। দরজাটা খুলে রেখে ঘোড়াটাকে প্রান্তরের দিকে নিয়ে যাওয়ার সময় হয়ত তার সঙ্গে পথে স্ট্রেকারের দেখা হয়। তারপর ঝগড়া কথা কাটাকাটি এবং পরে সিম্পসনের মোটা লাঠির ঘায়ে স্ট্রেকারের মাথায় আঘাত করা—এই আর কি। এমনকি দেখা যাচ্ছে আত্মরক্ষার জন্য স্ট্রেকার ছুরিটা ব্যবহার করা সত্ত্বেও সিম্পসনের কোন চোট লাগেনি। এরপর হয়ত ঘোড়াটাকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে, হয়ত ওদের দুজনের ঝগড়া বা ধস্তাধস্তির সময় ঘোড়াটা বিশাল প্রান্তর ধরে যে দিকে ইচ্ছে ছুটে গেছে। পুলিশ এই রকম অসম্ভব অসম্ভব যুক্তি আঁচ করে রেখেছে অথচ কোন জোরালো যুক্তি খাড়া করতে পারছে না। যাই হোক আমাদের যত শিগ্গি সম্ভব অকুস্থলে হাজির হয়ে সর্বাগ্রে ব্যাপারটা বুঝে নিতে হবে। তাছাড়া এখন যা পরিস্থিতি তাতে অন্য কোন পন্থা দেখতে পাচ্ছি না।

ডর্টমুরের কেন্দ্র স্থল স্ট্যাভিস্টক শহরে পৌছতে বেশ খানিকটা বেলা গড়িয়ে গেল। স্টেশনে আমাদের জন্য দুজন ভদ্রলোক অপেক্ষা করছিলেন। একজনের চেহারার গড়ন লম্বা ধরনের, সিংহের কেশরের মত চুল আর দাড়ি। হাল্কা নীল চোখ। অন্য জন দেখতে ছোটখাটো হলেও বেশ চটপটে হাবভাব, ছিমছাম তার পোশাক। চোখে চশমা। গালপাট্টা দাড়ি ছোট করে কাটা, গায়ে ফ্রক কোট পায়ে পরা গুলি-ঢাকা বুট। ইনি হলেন বিখ্যাত ক্রীড়াবিদ কর্ণেল রস অন্যজন ইন্সপেক্টর গ্রেগরি, বিলিতি গোয়েন্দা মহলে ইতিমধ্যে বেশ কিছু নামযশ করে ফেলেছেন।

কর্ণেল বললেন, মিস্টার হোমস আপনি আসায় আমি খুব খুশি হয়েছি। যা করা সম্ভব ইন্সপেক্টর সাহেব করেছেন বটে, তবু স্ট্রেকারের হত্যার প্রতিশোধ নেবার

জন্য আমি এখনও সম্পূর্ণ নিশ্চিত হতে পারিনি। এরজন্য আমার দিক দিয়ে চেষ্টার কোন ত্রুটি থাকবে না। পাউণ্ডের জন্য ভাববেন না।

—শুধু আপনার স্ট্রেকারের হত্যাকারিকে দরকার?

—না, না ঘোড়াটাকেও আমায় ফিরে পেতে হবে।

হোমস বললে, নতুন কিছু ঘটেছে নাকি?

ইন্সপেক্টর বললেন, না, কাজ যে খুব একটা এগিয়েছে একথা বলবো না। চলুন গাড়িতে যেতে যেতে কথা বলা যাবে খন।

আমরা ল্যাণ্ডো চেপে ঘড়ঘড় শব্দে এগিয়ে চললাম। ঘটনার খুঁটিনাটি বিবরণ গ্রেগরির কণ্ঠস্থ। তিনি অনর্গল বকে চললেন। হোমস চোখ বুজে শুনছিল আর মাঝে মাঝে দু একটা প্রশ্ন করছিল। কর্ণেল রস কোন কথা বলছিলেন না, আমি ওদের পাশে বসে সব কথা শুনছিলাম। তিনি বললেন, সিম্পসনই আসামী। আর তাকে বেড়াজালে ঘিরে ফেলাও হয়েছে। তবু মনে হয় ওর বিরুদ্ধে প্রমাণপত্র সবই আনুমানিক, তাই কোন ব্যাপার ঘটলে সব কিছু উল্টে পাল্টে যেতে পারে।

—স্ট্রেকারের ছুরিটার ব্যাপারে কিছু ভেবেছ?

—আমরা এরকম ধরে নিয়েছি যে সে পড়ে যাওয়ার মুখে নিজের ছুরিতে নিজেই ঘা খেয়েছে।

হোমস বললে, বন্ধু ওয়াটসন আসতে আসতে এই কথাই বলছিল। ঘটনাটা তাহলে তো সিম্পসনের বিরুদ্ধেই যাচ্ছে।

—নিশ্চয়ই। তার হাতে ছুরিও নেই, গায়ে কোন আঘাতের চিহ্নও নেই। তার বিরুদ্ধে প্রমাণ খুবই জোরালো। তবে ঘোড়াটা অদৃশ্য হওয়ার পিছনে আছে তারই স্বার্থ। আস্তাবলের ছোকরার খাবারে সে-ই বিষ মিশিয়ে ছিল বলে মনে হয়। ঝড়জলের রাতে সে যে নিঃসন্দেহে বাইরে বেরিয়েছিল এবং তার হাতে যে মোটা মাথাওয়ালা লাঠিটা ছিল এটা একেবারে নির্ভুল। আর সেই সঙ্গে তার গলার রেশমী রুমালটাও হত্যাকারীর হাতে পাওয়া গেছে। আমার তো মনে হয় একে নিশ্চয়ই জুরির বিচারে পাঠানো যাবে।

হোমস বললে—যে কোন চতুর ব্যারিস্টার নস্যাৎ করে দেবে? ঘোড়াটাকে তার আস্তাবলের বাইরে নিয়ে যাওয়ার দরকার কি ছিল? কোন ক্ষতি করার থাকলে সে তো ওখানেই করতে পারতো। তার কাছে কি কোন অতিরিক্ত চাবি পাওয়া গেছে? আচ্ছা, কোন্ ওষুধের দোকান থেকে সে আফিমের গুড়ো কিনেছে? সবচেয়ে বড় কথা হল সে হল এই অঞ্চলের একজন অপরিচিত আগন্তুক—তার পক্ষে ঐ রকম একটা নামজাদা ঘোড়াকে কোথাও লুকিয়ে রাখা কি সম্ভব? আস্তাবলের ছোকরাটাকে দেবার জন্য যে কাগজটা সে এডিথকে দিয়েছিল, সে সম্পর্কে ওর বক্তব্য কী?

ও বলেছে, ওটা নাকি একটা দশ পাউণ্ডের নোট। তার ব্যাগে অবশ্যি আরও একটা দশ পাউণ্ডের নোট পাওয়া গেছে। কিন্তু আর যে যে যুক্তিগুলো ছিল সেগুলো কাটানো খুব একটা শক্ত নয়। এই অঞ্চল যে তার খুব অপরিচিত তা নয় এর আগেও সে দু'একবার এখানে এসেছে। আর আফিমের ব্যাপারটা মনে হয় লণ্ডন থেকে আনতে পারে।

আর চাবি—চাবির কাজ শেষ করে সেটাকে সে ছুঁড়ে কোথাও ফেলে দিয়েছে। ঘোড়াটাকে প্রান্তরের কোন পুরনো গলির খাদে লুকিয়ে রাখতে পারে।

—রুমালটার কথা কি বললে?

—সে বলেছে ওটা হারিয়ে ফেলেছিল। কিন্তু একটা নতুন সমস্যা এসে হাজির হয়েছে, যাতে মনে হচ্ছে সে আস্তাবল থেকে ঘোড়াটাকে বার করে নিয়ে গিয়েছিল। কারণ একটু দূরেই একটা বেদেদের আস্তানা ছিল। মঙ্গলবার ঘটনাটা ঘটার পরেই দেখা গেল বেদের দল উধাও, এখন মনে হচ্ছে বেদেদের সাহায্যে সে ঘোড়াটাকে অন্যত্র কোথাও সরিয়ে থাকবে।

হোমস অদ্ভুত একটা মুখভঙ্গি করলে। ইন্সপেক্টর বললেন, বেদেদের সন্ধানে প্রান্তরটা তন্ন তন্ন করে খোঁজা হচ্ছে। তাছাড়া স্ট্যাভিস্টকের দশ মাইলের মধ্যে প্রত্যেকটা আস্তাবল এবং ঘরবাড়ি সব খোঁজা হচ্ছে।

হোমস বললেন—নিকটেই একটা শিক্ষণ শিবির আছে না?

—হ্যাঁ সে কথাও ভুলিনি। বাজি ধরার দিন থেকে ওদের ডেসবরো ছিল দু'নম্বরে। কাজেই পয়লা নম্বর ঘোড়াকে হারানোর মধ্যে ওদের স্বার্থ আছে। ওদের ট্রেনার সাইলাস ব্রাউন ঐ দৌড়ে অনেক পাউণ্ড বাজি ধরেছেন বলে শুনেছি। স্ট্রেকারের সঙ্গে ওর প্রীতির সম্পর্ক ছিল না। যাই হোক আমরা আস্তাবলটা খুঁজেও এ ব্যাপারে কোন সূত্র খুঁজে পাইনি।

সিম্পসনের সঙ্গে কেপলটন আস্তাবলের কোন স্বার্থঘটিত যোগসাজসের সন্ধান পাওনি তো?

—না, কিছু না।

হোমস গাড়িতে হেলান দিয়ে বসে রইলো। চোখ বন্ধ।

কয়েক মিনিট পরেই আমরা একটা লাল ভিলার সামনে এসে দাঁড়ালাম। ছোট মাঠটার ওধারে ছাইছাই রঙের টালি দিয়ে ছাওয়া লম্বা ছাদের একধারে বাড়ি। অন্য চারদিকে মরে আসা ঘাসপাতায় ছাওয়া ধূসর প্রান্তর আকাশের প্রান্তসীমা ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলছে—মাঝখানে দাঁড়িয়ে স্ট্যাভিস্টকের গির্জার চূড়া। আর পশ্চিমে কেপলটন আস্তাবলের ঘর-বাড়ির সারি। আমরা গাড়ি থেকে সবাই নামলাম। হোমস তখনও চোখ বন্ধ করে নিশ্চুপ হয়ে বসেছিল। আমি হাত ধরে টানতেই তার সম্বিত ফিরলো। আমার হাত ধরে নামলো গাড়ি থেকে।

কর্ণেল রস তার দিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে তাকিয়ে ছিলেন বলে হোমস বললে—কিছু মনে করবেন না আমি একটু দিবাস্বপ্ন দেখছিলাম।

হোমস'এর ধরন ধারন আমার জানা থাকায় তার চোখের উজ্জ্বল চাউনিতে বুঝলাম কিছু একটা সূত্র সে নিজের মধ্যে খুঁজে পেয়েছে।

ইন্সপেক্টর গ্রেগরি বললেন—মিঃ হোমস, আপনি নিশ্চয়ই এক্ষুণি অকুস্থানে যেতে চাইবেন?

হোমস বললেন—তাতো যাবোই। তার আগে দু'একটা কথা জেনে নিই, স্ট্রেকারকে তো এখানেই নিয়ে আসা হয়েছিল তাই না?

হ্যাঁ, উপরের তলায় তার দেহটা রাখা আছে। কাল করোনার বিচার হবে।

—আচ্ছা কর্ণেল রস আপনার কাছে তো উনি বেশ কিছুদিন চাকরি করেছেন?

—হ্যাঁ কর্মচারি হিসাবে অত্যন্ত ভাল।

—ওর পকেটে যা যা জিনিস পাওয়া গেছে, তার একটা ফর্দ করেছেন না ইন্সপেক্টর?

—হ্যাঁ, সেগুলো সব বসবার ঘরেই রাখা আছে। আপনি ইচ্ছে করলে দেখতে পারেন।

—একবার জিনিসগুলো দেখলে ভাল হয়।

আমরা একে একে সামনের একটা ঘরে ঢুকলাম। দেখলাম টেবিলের উপর একটা টিনের বাক্স পড়ে আছে। ইন্সপেক্টর বাক্সটা খুলে একেকটা জিনিস বার করে টেবিলে রাখতে লাগলেন। মোম মাখানো দেশলাই কাঠি একবাক্স, ছোট একটুকরো মোমবাতি, চুরুট খাবার একটা এ.ডি.পি. পাইপ, এল সীল—চামড়ার থলেতে লম্বা করে কাটা কিছু তামাক, সোনার চেন লাগানো একটা রূপোর ঘড়ি, পাঁচটা সোনার গিনি, একটা পেনসিল বাক্স, কিছু কাগজপত্তর, লন্ডন উইস কোম্পানির দামি খোদাই করা সূক্ষ্ম অনমনীয় ফলার হাতির দাঁতের বাটের একটা ছুরি—

হোমস প্রত্যেকটা জিনিস অত্যন্ত খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে বললেন, ছুরিটা অসাধারণ। এর ফলায় রক্তের দাগ দেখে মনে হচ্ছে মৃত স্ট্রেকারের হাতে এটাই পাওয়া গিয়েছিল। তারপর থেমে তিনি ছুরিটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, ওয়াটসন, একবার ছুরিটা দেখতো মনে হয় এই ধরনের ছুরি তোমাদের ডাক্তারি বিদ্যার আওতার মধ্যে পড়ে কিনা।

আমি বললাম—হ্যাঁ এই ধরনের ছুরি দিয়ে ছানি কাটা হয়।

—হ্যাঁ আমিও তাই ভাবছিলাম। ছুরিটাকে পকেটের মধ্যে বন্ধ করার জো নেই। অথচ একটা ঝক্কির ব্যাপারে এ ধরনের একটা অস্ত্র সঙ্গে নিয়ে যাওয়া খুবই অদ্ভুত।

ইন্সপেক্টর বললেন—এর ডগায় একটা কর্ক লাগানো ছিল। ওর স্ত্রী বলেছেন কদিন থেকেই ছুরিটা টেবিলের ওপর পড়েছিল, সেদিন রাত্রে বেরোবার সময় ওটা ও তুলে নেয়। অস্ত্র হিসাবে ওটা তুচ্ছ বটে। কিন্তু আমার মনে হয় হাতের কাছে যা পেয়েছে তাই নিয়েই রওনা হয়ে গিয়েছিল।

হোমস মাথা নাড়ল। তারপর বললেন, এই কাগজগুলো কি?

—তিনটে হল ঘোড়াদের রসিদ যুক্ত হিসেব। একটা হল কর্ণেল রসের লেখা নির্দেশপত্র। আর একটা তুচ্ছ কাগজ—এটা উইলিয়াম ডার্বিশায়ারের নামে কাটা, বন্ড স্ট্রীটের পোশাক নির্মাতা মাদাম লাসুরিয়ের দোকানের পোশাক বাবদ সাঁইত্রিশ পাউন্ড পনেরো শিলিং-এর একটা হিসাব। শ্রীমতী স্ট্রেকার বলেছেন যে ডার্বিশায়ার নাকি ওর স্বামীর এক বিশেষ বন্ধু। মাঝে মধ্যে নাকি তার চিঠিপত্র এখানে স্ট্রেকারের কাছে আসে।

হোমস হিসাবটা দেখতে দেখতে বললেন—মাদামের রুচির বাহার আছে। একটা পোশাকের দাম বাইশ গিনি—দামটা একটু বেশি বলতে হবে। তা সে যাই হোক, এখানে আর কিছু আমার জানার মত নেই। এখন অকুস্থলে যাওয়া যেতে পারে।

আমরা ঘরের বাইরে আসতেই একজন মহিলা উৎকণ্ঠিত ভাবে এসে ইন্সপেক্টর গ্রেগরিকে বললেন—ওদের ধরতে পেরেছেন?

—না এখনও পারিনি, এইতো লন্ডন থেকে মিস্টাব হোমসকে আমরা নিয়ে এসেছি আমাদের কাজের সুবিধার জন্য।

হোমস মহিলার দিকে তাকিয়ে বললে—আপনাকে যেন এর আগে কোথায় দেখেছি। ও-হ্যাঁ মনে পড়েছে, মনে হয় প্লিমাউথ-এর বাগান বাড়িতে এক উৎসব অনুষ্ঠানে।

—আজ্ঞে, আপনি ভুল করছেন।

হোমস বললে—এতবড় ভুল আমি করবো। আমার পরিষ্কার মনে আছে অস্ট্রিচের পালকের ঝালর দেওয়া হাল্কা ছাই ছাই রঙের একটা রেশমি পোশাক পড়েছিলেন।

মহিলা বললেন—আজ্ঞে না, আমার ওরকম কোন দামি পোশাক নেই।

হোমস বললে স্বাভাবিক ভাবে—তাহলে চুলোয় যাক। ভুল হয়ত আমার হয়েছে। তো চলুন আমরা অকুস্থলের দিকে যাত্রা করি।

একটু হেঁটে প্রান্তরের যে খাদে মৃতদেহটা পাওয়া গিয়েছিল সেখানে পৌছলাম। এর একধারে একটা হলুদ ফুলের ঝোপের উপর নাকি কোটটা পাওয়া গিয়েছিল।

হোমস বললে—সে রাত্রে তো এত জোরালো বাতাস ছিল বলে মনে হয় না।

—না বাতাস ছিল না, তবে বৃষ্টি হচ্ছিল।

—বৃষ্টি তো আর কোটটাকে গা থেকে খুলে নিয়ে ঝোপে নিয়ে আসতে পারে না, তাহলে বোঝা যাচ্ছে কোটটা এখানে খুলে রাখা হয়েছিল।—কি তাইতো?

—হ্যাঁ তাইতো মনে হয়।

—মজার ব্যাপার বটে। তা ওখানটায় তো সোমবার রাতের পর বহুলোকের যাতায়াত হয়েছে—কাজেই পায়ের ছাপও পড়েছে বহু।

—আমরা মাদুর দিয়ে জায়গাটাকে ঢেকে রেখেছি।

—চমৎকার।

—আমার কাছে একটা থলি আছে তাতে স্ট্রেকারের বুটের একপাটি, সিম্পসনের জুতোর একপাটি আর সিলভার ব্রেজের পায়ের একটা খুলে পড়া নাল রয়েছে।

হোমস আনন্দে বলে উঠলো—কী বলবো গ্রিভস, তোমার প্রশংসা না করে পাচ্ছি না। তুমি দুর্লভ বস্তুগুলো সংগ্রহ করে রেখেছ।

হোমস থলিটা নিয়ে খাদে নেমে মাদুরটাকে একটা মাঝামাঝি জায়গায় টেনে আনলো। তারপর উপুড় হয়ে তার দু'হাতের উপর থুতনি রেখে সামনের কাদায় পদদলিত অংশটুকুর মধ্যে কি যেন দেখতে লাগলো। হঠাৎ তারপর বললো—

আরে এটা কি! হোমস মাটি থেকে একটা আধপোড়া মোম মাখানো দেশলাই'এর কাঠির টুকরো তুলে নিল। সেটা কাদায় একবারে মাখামাখি হয়ে আছে।

ইন্সপেক্টর বললেন, কেন যে এটা দেখতে পাইনি জানি না। ওটা কাদার মধ্যে একবারে মিশে ছিল।

হোমস বললে—আমি তো এটাই খুঁজছিলাম। তাই খুঁজে পেলাম।

—আপনি ওটা পাবেন আশা করেছিলেন?

—নিশ্চয়ই।

তারপর হোমস জুতো দুটো নিয়ে কাদার দাগের সঙ্গে মেলাতে লাগলো। তারপর খাদের পাড় আঁকড়ে হেঁচড়ে উপরে উঠে, ঝোপের মধ্যে দিয়ে গুড়ি মেরে এগিয়ে চললো।

ইন্সপেক্টর বললেন, দুদিকেই প্রায় দশগজের মত জমি তন্ন তন্ন করে খোঁজা হয়েছে। কিন্তু পায়ে চলার কোন চিহ্ন পাইনি।

হোমস এবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললে, তাই নাকি, তাহলে তো তোমার কথার পর আমার খোঁজা সাজে না। কিন্তু কাল রাত্রে যাতে পথ চিনতে পারি তার জন্য আমি আজ প্রান্তরের কিছুটা ঘুরে বেড়াতে চললাম। আর এই ঘোড়ার নালটা আমার কাছে রাখলাম।

বেশ বুঝতে পারলাম কর্নেল রস আমার বন্ধুর কাজকর্মে খুব একটা খুশি হলেন

না। তিনি হাতঘড়িটা দেখে ইন্সপেক্টরকে বললেন, চলুন যাই আপনার সঙ্গে কিছু পরামর্শ আছে। আর তাছাড়া ঘোড়দৌড় থেকে আমাদের ঘোড়ার নামটা যে বাদ যাচ্ছে সেটা জনসাধারণকে জানিয়ে দেওয়া দরকার।

হোমস দৃঢ়কণ্ঠে বললে—কক্ষনো না। ঘোড়ার নামটা নিশ্চয় থাকা উচিত।

কর্ণেল মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন—আপনার অভিমত পেয়ে আনন্দিত হলাম। আমরা হতভাগ্য স্ট্রেকারের ঘরে অপেক্ষা করছি। আপনি বেড়িয়ে ফিরলে সবাই মিলে একসঙ্গে স্ট্যাভিস্টকে রওনা হব।

ওরা চলে গেল।

আমরা এগুতে লাগলাম। হোমস বললে স্ট্রেকারের হত্যাকারি কে সেটা জানার চাইতে ঘোড়াটা কোন দিকে গেল সেটাই আমাদের সবার আগে জানা দরকার। ধর দুর্ঘটনার সময় বা অব্যবহিত পরেই ঘোড়াটা যদি ছুটে পালিয়ে গিয়ে থাকে তাহলে সে কোথায় গেল? ঘোড়ারা সাধারণত দলবদ্ধভাবে থাকতেই ভালবাসে। অন্তত স্বাভাবিক ভাবেই সে হয় কিংস পাইল্যাণ্ডে ফিরে আসবে না হয় কেপলটনে যাবে। উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে চড়ে বেড়াবে কেন? যদি তাই হত এতদিনে তা নিশ্চয় পুলিশের নজরে পড়তো। আর বেদেদের কথা বলছ? এরা ধরবে কেন? আসলে বেদেরা পুলিশকে সবসময় এড়িয়ে চলে। কাজেই কোথাও কোন হাঙ্গামা হুজ্জুত হলে ওরা আগে ভাগে সেখান থেকে সরে পড়ে। ওরকম একটা ঘোড়া ধরলে ওদের কোন লাভ নেই। বরং বিপদ অনেকখানি। তাহলে প্রশ্ন ঘোড়াটা কোথায় গেল? আগেই বলেছি ওটা নয় কিংস পাইল্যাণ্ডে যাবে নইলে কেপলটনে। কিংস পাইল্যাণ্ডে যখন যায়নি, তখন ওটা নিশ্চয় কেপলটনে আছে। তাই সাব্যস্ত করেই কাজটা আরম্ভ করে একবার দেখতে চাই ফলাফলটা কি দাঁড়ালো।

ইন্সপেক্টর ঠিকই বলেছেন, প্রান্তরের এই দিকটা খুব শুকনো খড়খড়ে। কিন্তু দেখেছ কেপলটনের দিকে ঢাল হয়ে গর্ত মত হয়ে আছে। সেদিন রাতে বৃষ্টির জন্য ওই জায়গা ভিজে থাকাই স্বাভাবিক। আমার ধারণা যদি ঠিক হয় তাহলে ঘোড়াটাকে ওদিকেই যেতে হয়েছে। আর ওখানেই তার পায়ের চিহ্নের সন্ধান নিশ্চয় পাওয়া যাবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমরা কথা বলে হন হন করে হাঁটছিলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা এসে পৌছলাম ওই খাদের ধারে। হোমস হাঁটতে লাগলো বাঁ দিক ধরে আর আমি ডান দিকে। মনে হয় আমি তখনও হাত পঞ্চাশও যেতে পারিনি, শুনতে পেলাম হোমসের কণ্ঠস্বর। পিছন ফিরে দেখলাম ও আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই নরম জমির ওপর দেখতে পেলাম ঘোড়ার পায়ের চিহ্ন ফুটে উঠেছে। এবার হোমস পকেট থেকে নালটা বার করে ওই ছাপের উপর খুব সন্তর্পণে রাখলো আর সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম ওটা হুবহু মিলে গেল। হোমস উঠে দাঁড়িয়ে নালটা হাতে তুলে ঘষতে ঘষতে বললে, দেখছ

কল্পনার কদর কতখানি। গ্রেগরির এই ক্ষমতাটাই নেই। কী ঘটা সম্ভব সেটা ভেবে নিয়ে, সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করে দেখলাম একবারে ঠকিনি। আচ্ছা ওয়াটসন চল, আরও কিছুটা এগিয়ে যাওয়া যাক।

খাদের তলার ভিজে স্যাঁতসেতে জমি পার হয়ে আমরা সিকি মাইল হাঁটার পর শুকনো খড়খড়ে জমিতে গেলাম। সেটা পার হয়ে জমিটা ঢালু হয়ে গেছে—আবার এখানেও ঘোড়ার পায়ের চিহ্ন পাওয়া গেল। আবার কিছুটা রাস্তা কোন চিহ্ন দেখা গেল না। এবার যে চিহ্নটার হদিশ মিললো কেপলটনের ধারে কাছে এসে তাতে হোমস সর্বপ্রথম দাগগুলো দেখে গর্বোৎফুল্ল মুখে দাঁড়িয়ে ছিল। আমাকে ডেকে দেখালো, দেখলাম এবার ঘোড়ার দাগের পাশে মানুষের পায়ের ছাপ।

আমি একটু অবাক হয়ে বললাম—এতক্ষণ তাহলে ঘোড়াটা একলাই ছিল।

—ঠিক তাই। আগে একলা ছিল বটে, কিন্তু এখানে সে আর একলা নেই। এখন ভাবতে হবে পায়ের দাগ কার। দাগ দুটো হঠাৎ মোড় ঘুরে কিংস পাইল্যাণ্ডের দিকে গেছে। আমরা ওই পথ ধরলাম। হোমসকে ভীষণ উৎসাহিত দেখাচ্ছিল। হোমস দাগগুলোর দিকে কঠিনভাবে নজর দিয়ে হাঁটছিল। হঠাৎ বেশ কিছুদূর যাওয়ার পরে হোমস বলে উঠলো—সেইতো আবার এই পথেই ফিরে আসতে হল। মিছিমিছি শুধু একগাদা পথ হাঁটতে হল। অর্থাৎ দেখা গেল দাগগুলো আবার যে পথ ধরে এসেছিলাম সেই পথেই ফিরে গেছে।

বেশিদূর আমাদের হাঁটতে হল না। কেপলটন আস্তাবলের দরজামুখো যে নিচের রাস্তা গিয়েছে, তার কাছে গিয়েই এই চিহ্ন শেষ হল। পাকা রাস্তা ধরে এগুতেই এক ছোকরার সঙ্গে দেখা। ছেলেটা যে একজন সহিস বোঝা গেল। হোমস আর আমাকে দেখেই সে বলে উঠলো, এইখানে মশাই একদম ঘোরাফেরা করবেন না, সরে পড়ুন। হোমস পকেট থেকে দুটো আঙ্গুলে একটা গিনি বার করে বললে, আরে ভাই এত রাগ করছো কেন, কাল সকাল পাঁচটায় এলে কি তোমাদের মালিক সাইলাস ব্রাউনের সঙ্গে দেখা হবে?

—তিনি তো সকলের আগে ওঠেন। ওই যে তিনি নিজেই এদিকে আসছেন, আপনার যা জিজ্ঞাসা আপনি ওকে করুন। আমি কিছু বলতে পারবো না।

আমরা তাকিয়ে দেখলাম একজন প্রৌঢ় দর্শন ভীষণ রাগী ধরনের মানুষ হাতে চাবুক আস্ফালন করতে করতে এগিয়ে আসছেন আমাদের দিকে। চিৎকার করে বললেন—এই, কি হচ্ছে ওখানে। কোথা থেকে এসে জুটেছে ওই উটকো দুটো লোক। কি জানতে চায় ওরা।

হোমস অত্যন্ত মোলায়েম ভাবে বললে, হুজুরের সঙ্গে মিনিট দশেক একটু কথা বলা যাবে?

—না। তোমাদের মত বজ্জাত বাউন্ডুলেদের সঙ্গে কথা বলার মত সময় আমার

নেই। এই অঞ্চলে নতুন কোন লোকজন আসুক এটা আমি একদম পছন্দ করি না। শিগ্গি কেটে যাও, নইলে কুকুর লেলিয়ে দেব।

হোমস এবার ঝুঁকে ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে কি যেন ফিস ফিস করে বললে। ব্যস সঙ্গে সঙ্গে লোকটার মুখের চেহারা একদম বদলে গেল। শুধু চিৎকার করে বললেন, মিথ্যে কথা, ডাহা মিথ্যে কথা।

হোমস হেসে বললে—শার্লক হোমস কখনও বাজে কথা বলে না। আমার মনে হয়, এসব আলোচনা এখানে দাঁড়িয়ে না করাই ভাল। তার চেয়ে চলুন আপনার বসার ঘরে যাই।

—ঠিক আছে, আপনি যা বলেন, আসুন তাহলে। হোমস মুচকি হেসে আমাকে বললে, তুমি একটু অপেক্ষা করো বন্ধু, বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না। আমি একটু আলোচনাটা সেরে আসি।

প্রায় মিনিট কুড়ি বাদে হোমস আর ট্রেনার ভদ্রলোক যখন ফিরলেন, তখন আকাশের রঙ বদলে গেছে। সূর্য অস্তে গিয়ে চারদিকে পাংশু আভা বিস্তার করেছে। সবচেয়ে অবাক হলাম ওই ভদ্রলোকের চেহারা ও ব্যবহারের পরিবর্তন দেখে। লোকটা যেন হোমসের একেবারে পোষা কুকুর বনে গেছে। সেই চাবুকের আস্ফালন আর নেই। সেই মেজাজ আর আস্তম্ভরিতা কেমন হাতজোড় করে মিউমিউ করছিল।

বললে—আজ্ঞে আপনার হুকুম মত সব কাজ ঠিক হবে।

হোমস তীব্র দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে বললে, দেখবেন কোন ভুলচুক যেন না হয়।

—আজ্ঞে না, কোন ভুল হবে না। যথাসময়ে ওকে আপনি যথাস্থানে দেখতে পাবেন। তবে স্যার পরিবর্তনটা কি আগেই ঘটাবো, না পরে?

হোমস খানিকটা মুচকি হেসে বললে—থাক ও সম্পর্কে পরে আপনাকে চিঠি লিখে জানাব। কোন চাতুরির যেন চেষ্টা না হয়।

—না, না আপনি আমায় বিশ্বাস করতে পারেন।

—ওটাকে আপনার নিজের মনে করেই কিন্তু যত্ন নেবেন ওই দিন।

—এই বিষয়ে আপনি আমাকে নির্ভর করতে পারেন।

—হ্যাঁ তাই যেন হয়।

হোমস আর তার দিকে না তাকিয়ে হনহন করে হেঁটে কিংস পাইল্যাণ্ডের রাস্তার দিকে পা বাড়ালো। আমি তো অবাক। কিছুই বুঝে উঠতে পারলাম না।

হাঁটতে হাঁটতে হোমস বললে—মেজাজ, ভীরুতা আর ছিঁচকেমির এমন বিচিত্র সমাবেশ আমি বড় একটা বেশি দেখিনি।

—ঘোড়াটা তাহলে ওর ওখানেই আছে?

—প্রথমটায় অস্বীকার করতে চেয়েছিল কিন্তু আমি ওর সেদিনের সকালের কর্মধারার যা নিখুঁত বর্ণনা দিলাম, তাতে ও ভাবলো হয়ত আমি আড়াল থেকে সব লক্ষ্য করেছি। তুমি অবশ্যই কাদার মধ্যে অদ্ভুত মাথা চ্যাপটা জুতোর ছাপটা লক্ষ্য করেছ, ওর জুতোয় সে ছাপের সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে। আর মাইনে করা কোন লোক এই ধরনের দুঃসাহসিক কাজ করতে ভরসা পেত না। এরপর ওকে সব কিছু হুবহু বর্ণনা দিলাম, সেদিন সকালে অভ্যাস মত সকলের আগে উঠে বেড়াতে বেরিয়ে একটা নতুন ঘোড়া প্রান্তরে চড়ে বেড়াতে দেখেই, তার দিকে তিনি এগিয়ে গেলেন। কাছে যেতেই সাদা ধবধবে চিহ্ন দেখে চিনতে পারলেন পৃথিবীর যে একমাত্র দামী ঘোড়াটা, কেবল তার মনমতো ঘোড়াটাকে হারাতে পারে, সেটাই দৈববশত তার হস্তগত। তারপর তাকে আরও বললাম, ঘোড়াটা দেখে তার প্রথমে ইচ্ছে হল ওটাকে কিংস পাইল্যাণ্ডে রেখে আসেন, কিন্তু কিছুটা দূর যাওয়ার পর তার মাথায় দুষ্টুবুদ্ধি ভর করে আর তখনই ভাবলেন যে ঘোড়াটাকে যদি দৌড় না শেষ হওয়া পর্যন্ত লুকিয়ে রাখা যায় তাহলে তার ঘোড়াটা....ব্যস সঙ্গে সঙ্গে আবার নিজের আস্তাবলে ঘোড়াটাকে নিয়ে ফিরে এলেন। আমি যখন তাকে হুবহু সব বলে গেলাম, তখন উনি অকপটে আমার কথা স্বীকার করলেন।

আমি বললাম—কিন্তু ওর আস্তাবল তো তল্লাসি করা হয়েছিল।

—তাতে কি। ওর মত একজন দাগী চোরের পেটে যে কত দুষ্টুবুদ্ধি থাকতে পারে তা যদি জানতে।

আমি বললাম, কিন্তু লোকটা তো ঘোড়াটার কোন ক্ষতি করতে পারে।

হোমস হেসে বললে, বন্ধু হে, ও জানে, যার হাতে ও পড়েছে, তার হাত থেকে রেহাই পেতে হলে ওকে ঘোড়াটাকে নয়নের মণির মত রক্ষা করতে হবে।

আমি বললাম, কিন্তু কর্নেল রস যে ওকে সহজে নিস্তার দেবেন, আমার কিন্তু মনে হয় না।

হোমস বললে, ব্যাপারটা তো তার হাতে নেই। আমি আমার নিজের পদ্ধতিতে চলি। সখের গোয়েন্দা হবার এটাই হল সবচেয়ে মজা, এই যে যেখানে যতটুকু বা যতখানি বলার ততোটুকু মক্কেলকে আমি জানতে দিই। তুমি লক্ষ্য করেছ কিনা জানি না কর্নেল আমার সঙ্গে খুব কাঠখোট্টার মত ব্যবহার করেছেন। আমি ওকে তখন কিছু বলিনি, এবার আমার পালা, আমি ওকে একটু ল্যাজে খেলাবো। ঘোড়াটা নিয়ে তাকে কিছুই বলবো না। তুমি যেন বেফাঁস কিছু বলে বসো না।

—না, না, আমি তো দর্শক মাত্র।

হোমস বললে, যদিও কর্নেলের কাছে স্ট্রেকারের হত্যাকারি খুবই মূল্যবান।

—তাহলে কি তুমি এখন স্ট্রেকারের হত্যাকারিকে খুঁজে বার করার চেষ্টা করবে?

—তোমার মাথা খারাপ হয়েছে। আমরা আজ রাতের ট্রেনেই লণ্ডন ফিরে যাব।

শুনে তো আমার মাথায় বাজ ভেঙে পড়লো। বললাম, সবে তো মাত্র কয়েক ঘণ্টা হল এখানে এসেছি, এরই মধ্যে এমন অভাবনীয় সাফল্য লাভ করে সমস্ত তদন্ত তল্লাস ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারটা আমার কাছে কেমন যেন হেঁয়ালি বলে মনে হল। কিন্তু কর্নেলের বাড়ি না পৌচ্ছনো পর্যন্ত তার মুখে কোন রকম টুঁ-শব্দটি শুনতে পেলাম না।

সেখানে পৌছে দেখি তিনি আর ইন্সপেক্টর আমাদের জন্য বাইরের ঘরে অপেক্ষা করছেন।

হোমস বললে, আপনাদের এখানকার বাতাস সত্যি খুব মিঠে। দারুণ উপভোগ করলাম। তবে সৌভাগ্যটা দীর্ঘস্থায়ী হল না। আজ রাতের ট্রেনেই আমরা শহরে ফিরছি।

হোমসের কথা শুনে ওরা দুজনেই তো একেবারে থ। কর্নেল একটু অবজ্ঞার সুরে ঠোঁট বেঁকিয়ে বললেন, আপনি তাহলে হতভাগ্য স্ট্রেকারের হত্যাকারিদের ধরার আশা ছেড়ে দিলেন বলুন।

হোমস কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, হ্যাঁ, কতগুলো বড় ধরনের বাধা আছে বই কি। তবে আমার বিশ্বাস যে মঙ্গলবার আপনার ঘোড়া ঠিকই দৌড়বে। কাজেই আপনি জকি ঠিক রাখবেন। আর হ্যাঁ দয়া করে মিস্টার স্ট্রেকারের কোন ছবি থাকলে আমাকে একটা দেবেন।

হোমস কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে ইন্সপেক্টর পকেট থেকে একটা খাম বার করে এগিয়ে দিল হোমসের দিকে। তার মধ্যে স্ট্রেকারের ছবি।

হোমস পকেটে নিয়ে বললে—গ্রেগরি, আমার সব রকম দরকারের জন্য তুমি আগে ভাগে তৈরি হয়ে আছো দেখছি। তা বেশ, একটু অপেক্ষা করো আমি এডিথকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করে আসি।

আমার বন্ধু ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই কর্ণেল বললেন—নাঃ লণ্ডন থেকে বিশেষজ্ঞ আনিয়ে কোন কাজের কাজ হল না দেখছি। ওর আসা না আসার মধ্যে আমি কোন তফাৎ দেখছি না।

আমি বললাম—অন্তত একটা বিষয়ে তো আপনি নিশ্চিন্ত হয়েছেন যে আপনার ঘোড়াটা দৌড়াবে।

কর্নেল রস কাঁধ ঝাঁকিয়ে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলেন। তারপর বললেন—ওর কথার কোন মূল্য আছে। ওর কথার চেয়ে আসল বস্তুটা হাতে পেলে ভাল হত।

আমি ভেবেছিলাম বন্ধুর স্বপক্ষে কিছু একটা উত্তর কর্ণেলকে দেব কিন্তু তার আগেই উনি ঘরে ঢুকে বললেন, আজ্ঞা করুন কর্ণেল, আমার এখনই স্ট্যাভিস্টকে

রওনা হই।

আমাদের গাড়িতে উঠতে দেখে আস্তাবলের একটি ছোকরা দরজা খুলে সামনে দাঁড়ালো। হোমসের বোধহয় কিছু মনে পড়লো। সে ছেলেটিকে ডেকে তার গায়ে হাত বুলিয়ে বললে—তোমাদের খোঁয়াড়ের ভেড়াগুলোকে দেখাশুনো করে কে?

—আমি।

—আচ্ছা তুমি অতি সম্প্রতি ওদের মধ্যে কোন অস্বাভাবিক কিছু দেখেছ?

—আজ্ঞে তেমন কিছু নয়, কেবল তিনটে ভেড়া দেখছি কদিন যাবৎ একটু খুঁড়িয়ে হাঁটছে।

হোমস আনন্দে হাতে হাত ঘষে বললেন—চমৎকার।

তারপর ইন্সপেক্টর গ্রেগরিকে দেখে বললেন—গ্রেগরি ঘোড়াদের হঠাৎ এই সংক্রামণ ব্যাধিটা নিয়ে একটু ভেবে দেখ।

—এটাকে কি আপনি খুব জরুরী বলে মনে করছেন?

—অবশ্যই অত্যন্ত জরুরী।

—আর কিছু?

—হ্যাঁ, সেই রাতে আস্তাবলের কুকুরের আচরণটাও লক্ষ্যণীয়।

—না, কুকুরটা কোন চিৎকার চেঁচামেচি করেনি।

হোমস হেসে বললে—ওটাই তো আমার কাছে কি রকম অস্বাভাবিক লাগছে। একজন অপরিচিত লোক আস্তাবলে ঢুকে ঘোড়াটাকে বার করে নিয়ে গেল আর কুকুরটা চিৎকার পর্যন্ত করলো না।

—আমিও ব্যাপারটা নিয়ে ভেবেছি।

—আরও ভাবো। তারপর কর্ণেলের দিকে তাকিয়ে বললে—

—কর্নেল সাহেব, ঘোড়দৌড়ের দিন আপনার সঙ্গে নিশ্চয় দেখা হবে। আপনার ঘোড়াটা কেমন দৌড়ছে, সেটা তো একবার নিজের চোখে বাজিয়ে দেখে নেবেন। কথাটা শেষ করেই সে কোচওয়ানকে স্টেশনের দিকে যাওয়ার নির্দেশ দিল।

চারদিন পরে হোমস আর আমি আবার ট্রেনে চেপে ওয়েসেক্স কাপের খেলা দেখার জন্য উইলচেষ্টারের দিকে রওনা হলাম। কর্ণেলকে আগেই বলা ছিল। তিনিও স্টেশনে হাজির ছিলেন। আমরা তার গাড়ি করেই ঘোড়দৌড়ের মাঠে চললাম।

ভদ্রলোক অত্যন্ত গম্ভীর। কেবল বললেন, আপনার কথা মত অনর্থক এখানে এলাম। ঘোড়াটাকে কিন্তু এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি।

হোমস বললে—তাকে দেখলে চিনতে পারবেন তো?

কর্ণেল রস অত্যন্ত বিরক্ত মাখা গলায় বললেন, আজ বিশ বছর ধরে আমি মাঠে যাচ্ছি, কিন্তু এধরনের প্রশ্ন আমাকে এর আগে কেউ করেনি। ওর সাদা কপাল আর সামনের পায়ের চিত্রবিচিত্র দেখে যে কোন শিশুও চিনতে পারবে।

—দর কী যাচ্ছে?

—সেটাই তো অদ্ভুত। গতকাল পর্যন্ত পনেরো পাউণ্ডে এক পাউণ্ড দর ছিল, কিন্তু এখন দর কমতে কমতে তিন পাউণ্ডে এক পাউণ্ড এসে দাঁড়িয়েছে।

হোমস হেসে বললে—মনে হয় কোন বেটা হাঁড়ির খবর জানে। গাড়িটাকে গ্রাণ্ড স্ট্যাণ্ডের বেড়ার ধারে গিয়ে দাঁড়াতেই আমি নেমে পড়ে একবার তালিকাটায় চোখ বোলালাম।

ওয়েসেক্স প্লেট, পদ প্রতি পঞ্চাশ সারভিন, চারবছর আর পাঁচ বছর বয়সীর জন্য বাড়তি হাজার সারভিন।

দ্বিতীয় পুরস্কার তিনশো পাউণ্ড। তৃতীয় পুরস্কার দুশো পাউণ্ড।

এক মাইল পাঁচ ফারলং'এর নতুন খেলা শুরু। ছটি ঘোড়ার নাম।

এক—মিঃ হীন নিউটনের "দি নিগ্রো" (লালটুপি, দারুচিনি রঙের জ্যাকেট)।

দুই—কর্নেল ওয়ার্ডলের "পিউজিনিস্ট" (সবুজ রঙের টুপি, নীল রঙের জ্যাকেট)।

তিন—লর্ড ব্ল্যাক ওয়াটারের "ডেসবোরো" (হলদে টুপি, আর হাতা)।

চার নম্বরে—কর্নেল রস'এর "সিলভার ব্লেজ" (কালো টুপি, লাল জ্যাকেট)।

পাঁচ নম্বরে—ডিউক ব্ল্যাকমোর্য্যালের আইরিশ (লালটুপি, কালো ডোরা কাটা)।

ছয় নম্বরে—লর্ড পিংগল ফোর্ডের র‍্যাসপার (লালটুপি, কালো হাতা)।

কর্নেল বললেন, কেবল আপনার আশ্বাস পেয়ে আমি অন্য ঘোড়াদের নাম খারিজ করেছি। কিন্তু একি! একি! লোকের মুখে মুখে সিলভার ব্লেজের নাম শুনছি।

রিংয়ের ভিতর থেকে চিৎকার ভেসে এলো।

সিলভার ব্লেজ পাঁচ পাউণ্ডে চার পাউণ্ড। ডেসবারো পনেরো পাউণ্ডে পাঁচ পাউণ্ড, মাঠে নেমে দর পাঁচে চার।

আমি বললাম—ওই দেখুন নম্বর টাঙিয়ে দিয়েছে। ছটা ঘোড়ার নামই আছে। কর্ণেল অত্যন্ত বিস্মিত ভাবে বললেন—তাইতো দেখছি আমারটার নাম চার নম্বরে। কিন্তু তাকে তো দেখছি না। আমার চিহ্নওয়ালা ঘোড়া?

মাত্র পাঁচটা চলে গেছে। এইবার নিশ্চয় আপনার ঘোড়াটা নামবে।

কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, একটা তেজি ঘোড়া ওজনের ঘর থেকে আমাদের পাশ দিয়ে জোর কদমে চলে গেল। পিঠে তার কর্ণেলের সুপরিচিত লালকালো চিহ্ন।

কর্ণেল চেঁচিয়ে বললেন, ব্যাপার কী মিস্টার হোমস ওটা কখনই আমার ঘোড়া নয়, ওর গায়ে বিন্দুমাত্র সাদা লোম নেই। এটা কি করে হল! এ আপনি কি করলেন।

আমার বন্ধু অবিচল ভাবেই বললে—আহা দেখাই যাক না, ঘোড়াটা কেমন দৌড়ায়।

আমার দূরবীনটা কর্ণেল চেয়ে নিয়ে বেশ কয়েক মিনিট ধরে দেখলেন। তারপর চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, বাহবা বাহবা, আরম্ভটা চমৎকার করেছে। ওই দেখুন ওরা বাঁক ঘুরছে।

আমাদের গাড়ি থেকে সোজা রাস্তাটা বেশ ভালই দেখা যাচ্ছিল। ঘোড়াগুলো কাছাকাছি ছুটছিল। কিন্তু মাঝপথে ডেসবোরো এগিয়ে গেল। তারপরেই দেখলাম ডেসবোরোর দম যেন ফুরিয়ে গেছে, আর কর্ণেলের ঘোড়াটা তাকে পিছনে ফেলে বাজিমাত করে দিল। ডিউক ব্ল্যাকবোরোর ঘোড়াটা বিশ্রিভাবে পিছিয়ে পড়ে তৃতীয় হল।

কর্ণেলের মুখ হাসিতে ভরে গেল, বললেন, যাই হোক বাজিতে আমার ঘোড়াটাই বাজিমাত করেছে। কিন্তু আমি তো ছাই এর মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না। মনে হয় আপনি যেন কিছু একটা আমাকে লুকিয়ে যাচ্ছেন।

কর্ণেলের উৎকণ্ঠা দেখে হোমস বললে, চলুন একবার ঘোড়াটাকে গিয়ে দেখি। ওজন করার জায়গায় কেবল মালিক আর তার বন্ধুদের ঢোকার হুকুম আছে। সেখানে পৌঁছে হোমস বললে, এই নিন আপনার ঘোড়া। বাড়ি গিয়ে এর মুখ আর পা খুব ভালভাবে মদ দিয়ে ধুইয়ে দিলেই সেই পরিচিত সিলভার ব্লেজকেই আপনি দেখতে পাবেন।

—বলেন কি মশাই। কি তাজ্জব ব্যাপার। তো কোথায় পেলেন ওকে?

—আমি ওকে এক প্রতারকের ঘরে খুঁজে পেয়েছি। ঠিক যেমনটি ওকে পেয়েছি, ঠিক তেমনি ভাবেই ওকে দৌড়তে দিয়েছি।

কর্ণেল খুশিতে গদ গদ হয়ে বললেন—আপনি তো খুব কড়িৎকর্মা লোক মশাই। ঘোড়াটা তো বেশ সতেজ আছে। জীবনে বোধ হয় এত ভাল এর আগেও কোনদিন দৌড়োয়নি। তারপর একটু থেমে বললেন—কিছু মনে করবেন না, আমি আপনার ক্ষমতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করার জন্য। এখন আমি ক্ষমা চাইছি। ঘোড়াটা খুঁজে পেয়ে আপনি আমার খুব উপকার করেছেন। কিন্তু স্ট্রেকারের হত্যাকারির কোন খবর?

—হ্যাঁ তাকেও ধরেছি।

—কোথায় সে।

—এই তো এখানেই আছে।

—এখানে? কই?

—আপাতত আমাদের সঙ্গেই আছে।

কর্ণেল আবার রাগতভাবে বললেন, মশাই আপনি ভীষণ হেঁয়ালি করে কথা বলেন। আপনার কাছে আমি উপকৃত তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু তা বলে বাজে কথা বলবেন।

শার্লক হোমস বললেন—বাজে কথা আমি খুব একটা বলি না কর্ণেল, হত্যাকারি আপনার ঠিক পিছনেই দাঁড়িয়ে আছে। এই বলে হোমস তেজি ঘোড়াটার মসৃণ গর্দানে হাত চাপড়ালেন।

আমরা দুজনে একই সঙ্গে বলে উঠলাম—এই ঘোড়াটা।

—হ্যাঁ, তবে বেচারা ওকে ইচ্ছে করে হত্যা করেনি, যা করেছে তা আত্মরক্ষার জন্য। চলুন ঘণ্টা বেজে গেছে, পরের বাজিতেও সিলভার ব্লেজের জেতা দরকার। তারপর আপনাকে সবিস্তারে সমস্ত ঘটনাটা বলবো।

সেই রাতে আমরা পুলম্যান গাড়ির এক কোণায় তিনজনে নিরিবিলিতে বসে লণ্ডনে ফিরে এলাম। সেদিন রাতে ডটমুরের শিক্ষণ আস্তাবলে কি কি ঘটেছিল তার সমস্ত কাহিনী হোমসের মুখে শুনতে শুনতে কোথা দিয়ে যে গোটা রাস্তাটা ফুরিয়ে গেল বুঝতে পারলাম না।

হোমস বললে—স্বীকার করতে বাধা নেই খবরের কাগজ পড়ে যে সমস্ত সিদ্ধান্ত খাড়া করেছিলাম, তার সবটাই ছিল ভুল। প্রথমটায় আমারও মনে হয়েছিল সিম্পসনই প্রকৃত দায়ি।

ট্রেনারের বাড়ি যেতে যেতেই গাড়িতে বসে আমি মাংসের ঝোলের স্বরূপ ধরতে পারলাম। হয়ত আপনার মনে আছে ওই সময় আমি খুব তন্ময় হয়ে গিয়েছিলাম। আপনারা সকলে গাড়ি থেকে নেমে যাওয়ার পরেও আমার মধ্যে কোন হুস ছিল না। আসলে আমি তখন সূত্র আবিষ্কার করেছি।

হোমস বললে—আমার চিন্তা ধারায় ওটাই হল সর্বপ্রথম জিনিস। গুড়ো আফিমের নিজস্ব একটা আস্বাদ আছে। গন্ধটা তার খারাপ নয় বটে তবে বোঝা যায়। একমাত্র মাংসের ঝোলেই ওই গন্ধ চাপা পড়ে। অপরিচিত আগন্তুক সিম্পসন-এর পক্ষে ও রাতে ট্রেনারের বাড়িতে গিয়ে মাংসের ঝোলে ওই রকম রান্নার ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। তার চেয়েও অবিশ্বাস্য অঘটন হচ্ছে এইটে ভাবা যে ঠিক সে রাতে মাংসের ঝোল রান্না হচ্ছে, সেই রাতেই লোকটা লণ্ডন থেকে গুড়ো আফিম কিনে এনে হাজির হবে। কাজেই সিম্পসন বাদ পড়লো। এখন থেকে গেল ছজন লোক। একজন স্ট্রেকার এবং তার স্ত্রী। আস্তাবলের তিনটি ছোকরা আর তাদের ঝি। এটা সত্যি যে আস্তাবলের পাহারাদার হাণ্টারের মাংসের

ঝোলে ওটা আলাদা করে মেশানো হয়েছিল। কেন না ওই মাংস সবাই খেয়েছিল, অথচ কারো কিছু হয়নি। তাহলে এডিথের অলক্ষ্যে কে খাবারের কাছে যেতে পারে?

একটা সত্য থেকে আর একটা সত্যে উপনীত হওয়া যায়। ওই আস্তাবলের কুকুরের নীরবতা। সিম্পসনের ব্যাপারে বোঝা যায় আস্তাবলে কুকুর রাখা হয়েছিল। তাহলে কেউ একজন আস্তাবলে ওই রাতে এসেছিল যাকে কুকুরটি ভাল চেনে বলেই কোন রকম চিৎকার করেনি। আসলে সিলভার ব্লেজকে স্ট্রেকার বার করে এনেছিলেন, কিন্তু কেন? নিশ্চয় কোন কুমতলব ছিল? কুমতলব না থাকলে পাহারাদার ছোকরার খাবারে আফিম মেশানো হবে কেন। তবু বুঝে উঠতে পাচ্ছিলাম না ঘটনাটা কি ঘটতে পারে? এর আগেও এমন ঘটনার কথা বহু শোনা গেছে যে ট্রেনার অন্যের মাধ্যমে নিজের ঘোড়ার পিছনে অনেক পাউণ্ড লাগিয়ে দিয়ে শেষ মুহূর্তে কোন না কোন জুয়াচুরি করে ঘোড়াটাকে দৌড়তে দেয়নি। কখনও বা এটা জকির কারসাজিতে ঘটে, কখনও বা তার চেয়ে নিশ্চিত কোন সুক্ষ্মতার উপায়ে এ জিনিস ঘটানো হয়, এখানে কি ঘটেছিল দেখা যাক। ওর পকেটের মধ্যে যে সমস্ত জিনিসগুলো ছিল, তার মধ্যেই হদিশ পেলাম, কি ঘটতে পারে। মৃতের হাতের সেই অদ্ভুত ছুরিটার কথা নিশ্চয়ই ভুলে যান নি। কোন প্রকৃতিস্থ মানুষ ওরকম ছুরি আত্মরক্ষার অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে না। ডাক্তার ওয়াটসনের মতেই তো বোঝা যায় যে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ধরনের কোন অস্ত্রোপচারের জন্য ওই ছুরি ব্যবহার করা হয়। কর্ণেল রস ঘোড়দৌড়ের মাঠে আপনার বিপুল অভিজ্ঞতা। আপনি নিশ্চয় জানেন যে ঘোড়ার পিছনের দিকটার 'টেণ্ডন'টা এমনভাবে সামান্য একটু চিরে দিলে বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যাবে না। কোন ঘোড়াকে এমন ভাবে অস্ত্রোপচার করলে সে একটু খুড়িয়ে হাঁটবে বটে যা দেখে সকলে ভাববে যে অতিরিক্ত অনুশীলন বা বাতের ফলে এমন ঘটেছে। কোন দুরভিসন্ধির কথা কারো মনে আসবে না।

কর্ণেল চিৎকার করে বললেন, বেটা পাজি হতভাগা।

স্ট্রেকার ঘোড়াটাকে কেন বাইরে নিয়ে গিয়েছিল এখন সেটা নিশ্চয় বুঝতে পাচ্ছেন। অমন একটা তেজি ঘোড়ার গায়ে ছুরির খোঁচা লাগলে যে দাপাদাপি হবে তাতে বাকি দুজন ছোকরার ঘুম ভেঙ্গে যেতে পারে—এই জন্য তিনি ঘোড়াটাকে উন্মুক্ত প্রান্তরের খুব কাছে নিয়ে যান।

—ইস আমি কি অন্ধ। এখন বুঝতে পাচ্ছি এইজন্য সে দেশলাই আর মোমবাতি সঙ্গে নিয়ে ছিল।

—এর পরের সন্দেহ হল, একজন ভদ্রলোক নিশ্চয় অন্যের জামার বিল নিজের পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়াবেন না। তখনই আমার মনে হল স্ট্রেকারকে দুটো সংসার

চালাতে হয়। বিল দেখে বুঝতে দেরি হল না—এর অন্তরালে যে নারীটি আছেন তিনি তার কাছে অর্থের দাবি একটু বেশি করেন।

আপনার লোকেদের যত মোটা পাউণ্ড মাইনে দেন না কেন, তাদের পক্ষে কুড়ি গিনির পোশাক কেনা সম্ভব নয়। সেই কারণেই আমি শ্রীমতীকে প্রশ্ন করলাম এবং তিনি বললেন, তার এই ধরনের কোন পোশাক নেই। তখন আমি দর্জির ঠিকানা অনুযায়ি তার কাছে হাজির হলাম। সঙ্গে ছিল স্ট্রেকারের ছবিটা। তাকে দেখাতেই তিনি বললেন—মিস্টার ডার্বিশায়ার একজন দামি খদ্দের। ব্যস সঙ্গে সঙ্গে ডার্বিশায়ারের কাল্পনিক মুখটা সরে গিয়ে ভেসে উঠলো স্ট্রেকারের মুখটা।

ততক্ষণে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেছে। আলো যাতে দেখা না যায়, সেইজন্য তিনি খাদের দিকে নেমেছিলেন। আর লাল রেশমী রুমালটা আসলে সত্যি সিম্পসন দৌড়ে পালাতে গিয়ে পড়ে যায়, সেটা পরে স্ট্রেকার কুড়িয়ে নিয়ে ঘোড়ার ছাদন দড়ি হিসাবে ব্যবহার করার জন্য মনস্থ করেছিলেন। খাদে গিয়ে ঘোড়াটার পিছনে দাঁড়িয়ে আলো জ্বালতেই ঘোড়াটা আলোর ঝলকানিতেই হোক বা পশুদের বিশেষ অনুভূতিতেই হোক কোন দূরভিসন্ধি আঁচ করে সজোরে একটা চাট মারে। আর ইস্পাতের নালটা গিয়ে লাগে স্ট্রেকারের কপালে। তার লাথিটা খেয়েই হাতের ছুরিটা বসে যায় তার দাবনার মধ্যে। আর কোটটা তিনি কাজের সুবিধার জন্য আগেই ঝোপের মধ্যে খুলে রেখেছিলেন। কি এখন ব্যাপারটা পরিষ্কার হল?

কর্ণেল বললেন—অদ্ভুত। মনে হচ্ছে আপনি যেন সবকিছু নিজের চোখে দেখেছেন।

আমার শেষ চালাকিটার ফল অনেক দূর পর্যন্ত চলে যায়। আমার মনে হল যে স্ট্রেকারের মত চালাক লোক নিশ্চয়, টেণ্ডন বেরুবার আগে পরীক্ষা করেছেন? কিন্তু কোথায়? কার উপর? ভেড়াগুলোর দিকে নজর দিতেই সব পরিষ্কার হয়ে গেল।

—মিস্টার হোমস এখন আমি সব বুঝেছি।

হোমস বললে—আসলে স্ট্রেকার দ্বিতীয় সংসারটির জন্য প্রচুর দেনায় জড়িয়ে গিয়েছিল। তার জন্যই তাকে এই জঘন্য মতলব করতে হয়েছিল।

কর্ণেল বললেন—কিন্তু ঘোড়াটাকে পেলেন কোথায়?

হোমস বললে—ওটা তো ছুটে চলে যায়। তারপর আপনারই এক প্রতিবেশি ওকে লুকিয়ে রাখে।—এরপরেই হোমস বললে—আমার মনে হয় আমরা বোধ হয় ক্ল্যাপহাম জংশনে পৌছেছি। তার মানে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ভিক্টোরিয়া স্টেশনে পৌছে যাব। কর্নেল আপনি কি অনুগ্রহ করে কয়েক ঘণ্টার জন্য আমার অতিথি হবেন। তাহলে ধূমপান সহযোগে আপনাকে পুরো ঘটনাটা ভালভাবে শোনাতে পারবো।

রবার্ট ব্লচ

(আলফ্রেড হিচকক্ "সাইকো" ছবিটি করেছিলেন রবার্ট ব্লচের একটি দুর্ধর্ষ রচনা থেকে। লেখকের যে লেখাটি পড়ে এইচ. পি. ল্যাবক্র্যাবট বলেছিলেন "শীতল আতঙ্কের শিহরণ" আর হিচককের ভাষায়—"প্রথম শীতের হাওয়ার মত কাঁপন ধরায় গল্পটা।")

ইরমা কি সত্যি ডাইনি? তার চালচলন, কথাবার্তার মধ্যে ডাইনির কোন লক্ষণ বোঝা যায় না। দেখে তো মনে হয় ইরমা একটা ছোট্ট মেয়ে। ছোট্ট তো বটেই—কত বা বয়স তার, বড়জোর সাত-আট বছর। পীচ ফলের মত লাল ও ক্রীম রঙ মেশালে যে রকম রঙ হয় ইরমার শরীরের চামড়ার রঙটা ঠিক সেই রকম ফিকে গোলাপি রঙের।

মা মরা ইরমার নীল চোখজোড়া জুড়ে অবাক চাউনি। দেখে মনে হয় ছোট্ট মেয়েটা পৃথিবীর অনেক কিছুই ভাল বোঝে না। ঠিকঠাক সব কিছু বুঝতে পারে না বলেই তাকে বড় অসহায় দেখায়। মনে হয় সে যেন অনেক দুঃখ চেপে আছে, যার জন্য মুখচোখে সব সময় একটা বিষণ্ণ ছায়া দেখা যায় ইরমার।

ইরমার মা নেই, সে কথা আগেই বলেছি। তবে বাবা জন তাকে দেখাশোনার জন্য ভার দিয়েছেন মিস পলিকে।

সেই মিস পলি এখনও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। অথচ ওর মত মহিলা চট করে কাঁদে না। চোখের চশমার কাঁচে একটু আধটু ঝিলিক দেখা যায়—আর সেটা যেন বৃষ্টির পর রোদ ওঠার মত। নাকের দু'পাশ ফুলে ওঠে, কাঁপে। ভাঁজ করা চোখের পাতা নেচে ওঠে। যদিও এইসব অসম্ভব নয়, তবুও—।

অমায়িক হাসি হেসে পলির ব্যাপারটাকে সহজ করার চেষ্টা করলেন স্যাম। জনের বড় ভাই—ইরমার আঙ্কেল। পলি বিস্ময়ের সঙ্গে বলে—আপনার ভাই কেন যে ছোট মেয়েটাকে ডাইনি বলে আমি ঠিক বুঝি না। হাজার হোক নিজের মেয়ে—বাচ্চা মেয়ে—কেন বলুন তো উনি ওকে সবসময় ডাইনি বলে ডাকেন?

আবার ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। স্যাম সিগারেটে টান দিতে দিতে ভেবে নিলেন কি বলবেন।

মহিলা বলে চললেন, আপনি তো জানেন, দু'বছর আগে খবরের কাগজে কর্মখালির বিজ্ঞাপন দেখে আমি আপনার ভাই জন স্টিভারের কাছে আবেদন

করেছিলাম। এসে শুনলাম ইরমার কথা। ওর জন্মের পরেই শুনলাম ওর মা মারা গেছে কিন্তু এর জন্য ও দায়ী নয়। শুনে আমার খুব খারাপ লাগলো। শুনলাম ওর দায়িত্ব আমাকে নিতে হবে। আমি মেয়েটার মুখের দিকে তাকিয়ে রাজি হয়ে যাই। বিশ্বাস করুন, আমি কাজটা নেবার আগে পর্যন্ত জানতাম না একটা বাচ্চাকে কি ভাবে যত্ন করতে হয়। শুধু বুঝেছিলাম বাচ্চাটাকে আমায় মানুষ করতে হবে।

ইরমার জ্যাঠামশাই অর্থাৎ স্যাম স্টিভার একটু নড়ে বসলেন। তার শরীরটা তার ভাইয়ের তুলনায় বেশ কিছুটা ভারি। ফলে গদি আঁটা চেয়ারে ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে শব্দ হল।

মিস পলির ওভাবে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নাটা তার ভাল লাগছিল না। কিরকম যেন দুর্ভেদ্য বলে মনে হচ্ছিল। তবু তিনি নিজের মনের চেহারাটা প্রকাশ করলেন না। হাজার হোক তিনি উকিল—গাম্ভীর্য দিয়ে নিজেকে কি ভাবে ঢাকতে হয় তিনি তা জানেন। কেবল বললেন, হ্যাঁ আপনি যা বলছেন সব ঠিক, ইরমার জন্মের পরেই তার মা মারা যায়। জন প্রথমে মা হারা শিশুটির জন্য একজন নার্স রেখেছিলেন।

—আমি তা জানি। মেয়েটা শুধু মা হারা নয়। সে নিঃসঙ্গ। ওর বাবা—

—আমি জানি, আমার ভাই জন ভারি উদ্ভট মেজাজের এবং স্বার্থপর। মন বলে ওর কিছু নেই।

—ঠিক বলেছেন, উনি ভীষণ নিষ্ঠুর, নির্মম ও হিংস্র ধরনের। এতটুকু বাচ্চাকে তিনি কিভাবে বেল্ট দিয়ে মারেন, তা চোখে না দেখে বিশ্বাস করতে পারবেন না। ওর সারা শরীরে কালসিটে দাগ পড়ে যেত।

স্যাম বললেন, আসলে জন ওর স্ত্রীকে খুব ভালবাসতো। স্ত্রীর মৃত্যু ওকে বড় দুঃখ দিয়েছে। মনে হয় তারপর থেকে ওর মেজাজটা আরও হিংস্র হয়ে উঠেছে। আমার ধারণা ছিল হয়ত সে ব্যাপারটা সামলে নেবে। আর আপনি তা পারবেন।

মিস পলি তাকালেন। বললেন, বিশ্বাস করবেন কি না জানি না, আমি চেষ্টা করেছিলাম। উনি দেখা হলেই বলতেন, ক্ষুদে ডাইনিটাকে মেরে টিট করুন।

ইরমা ওর বাবাকে ভীষণ ভয় পেত। ওকে দেখলেই সে আমার পিছনে গিয়ে মুখ লুকাতো। আমি কিন্তু উনি হাজার বার বলা সত্ত্বেও ওর গায়ে কোনদিন হাত তুলিনি।

স্যাম স্টিভারের একদম ভাল লাগছিল না এই ধরনের ভ্যানভ্যানে কথাবার্তা। তার মনে হচ্ছিল পলি চলে গেলেই যেন তিনি বাঁচেন। এই প্রথম তিনি কিছুটা অপ্রসন্নভাবে বললেন—আপনার আসল সমস্যাটা কি বলুন তো?

মিস পলি বলে চললেন—ইরমার কিন্তু পড়াশোনা করতে ভাল লাগে। আমি

দেখেছি পড়াশোনার ব্যাপারে ওর খুব আগ্রহ। মাথাটা ভীষণ পরিষ্কার, কোন কিছু একবারের বেশি দুবার বলে দিতে হয় না।

—সে তো ভাল কথা।

—কিন্তু ওর বাবা এসব কথা একদম বিশ্বাস করে না। বরং কেবল বলতেন—খুব সাবধান, এই খুদে ডাইনি, ও যেন আর দশটা বাচ্চার সঙ্গে না মেশে। আমার ধারণা, ওর এই বিশ্বাস ঠিক নয়—মেয়েটা খুব ভাল। ওর দিকে ওর বাবা একটু যত্ন নিলে মেয়েটা ভাল হত। সে যেমন সুন্দর, তেমনি শান্ত। ছোট হলেও ওর বড়দের বই পড়তে ভাল লাগে। আমার নিজেরও এই অভ্যাস ছিল। কিন্তু এতকিছু সত্ত্বেও একদিন ওকে দেখে আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল।

—কেন?

—ওকে দেখলাম কখন এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা খুলে ডাইনিবিদ্যা সংক্রান্ত রচনা পড়ছে।

—বলেন কি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, তবে আমার ধারণা এর জন্য ও দায়ী নয়। ওকে আসলে ডাইনি বলতে বলতে ওর মাথার মধ্যে ডাইনি শব্দটা বসে গেছে। এর জন্য ওর বাবা দায়ী। উনি মেয়ের মাথার মধ্যে এই ভাবনাটা ঢুকিয়েছেন। আমি মেয়েটার মনটাকে ভোলাবার জন্য একটা পুতুল কিনে দিয়েছিলাম। ইরমাকে ওর বাবা কোনদিন কোন পুতুল-টুতুল কিনে দেননি। হয়ত এর জন্য পুতুল কি, আর পুতুল নিয়ে কেমন করে খেলা করতে হয় বেচারা কিছুই জানে না। পড়ার জন্য ওর সঙ্গে বাচ্চাদের আলাপ করিয়ে দিলাম। কিন্তু কোন লাভ হল না। দেখলাম লক্ষ্য করে অন্য বাচ্চারা ইরমাকে ঠিক বোঝে না আর ইরমাও ওদের ঠিক পছন্দ করে না। এত করে বললাম আপনার ভাইকে, তবু তিনি মেয়েকে স্কুলে ভর্তি করে দিলেন না। এরপর আমি ইরমাকে কাদামাটি দিয়ে পুতুল করতে শেখালাম। এতটুকু বাচ্চার মধ্যে এমন শিল্পকর্ম সচরাচর চোখে পড়ে না। কি নিখুঁত ভাবে সে পুতুল বানাতে শিখলো। মাটির পুতুলের খেলনা, পোশাক তৈরি করতে শুরু করেছিলাম আমরা। আপনার ভাই মাঝখানে কিছুদিন ছিলেন না। বিশ্বাস করুন এই সময় আমি আর ইরমা খুব আনন্দেই কাটিয়েছি। কিন্তু আপনার ভাই ফিরতেই—

অধৈর্য হয়ে স্যাম বললেন—প্লিজ মিস পলি, আপনি জনের কথাও একটু ভাবুন। বউটা হঠাৎ মারা গেল। ইমপোর্ট এক্সপোর্টের ব্যবসা ওর ডকে উঠলো। তাছাড়া এখন বড় বেশি মদ গেলে। মনে হয় এই সবের জন্য ওর মেজাজ—

—আপনি যাই বলুন, আপনার ভাই মেয়েটাকে খুব ঘেন্না করে। উনি বলেন—আপনি যদি ডাইনি মেয়েটাকে ভদ্রতা শেখাতে না পারেন তাহলে আমি শেখাচ্ছি। তারপর শুরু করেন চামড়ার বেল্ট দিয়ে মেয়েটাকে নিদারুণ ভাবে মারতে। ছোট

মেয়েকে এত মার আমি সহ্য করতে পারি না। দোহাই মিস্টার স্যাম, আপনি দয়া করে কিছু একটা করুন।

—তা না হয় করবো। কিন্তু ইরমা কি বলছে?

—সে বদলে যাচ্ছে। সে বলছে যে তার বাবা যখন তাকে ডাইনি বলে ডাকে, তখন সে নিশ্চয় ডাইনি। ডাইনি না হলেও সে ডাইনি হবে। আমার সঙ্গে এখন আগের মত খেলা করে না। তার ধারণা ডাইনিরা খেলা করে না। একদিন সে ব্যাপটিজিম্ ব্যাপারটি কি তাই দেখার জন্য আমার সঙ্গে চার্চে গেল। আমি তো খুব খুশি। অথচ বাড়িতে ফিরেই সে পড়লো আবার অন্ধকার জগতে—বাবাকে ওইদিন পরিষ্কার বললো আমাকে একটা কালো বিড়াল এনে দাও।

জন বললো—কেন? কালো বিড়াল দিয়ে কি হবে?

সে বললে—ডাইনিরা তো কালো বিড়াল নিয়েই থাকে।

এই কথা শুনে উনি তাকে দোতলায় নিয়ে গিয়ে ভীষণ মারতে শুরু করলেন। সে রাতে হঠাৎ আলো নিভে যায়। মোমবাতি খুঁজে না পেয়ে জন বললো—ইরমা সব মোমবাতি চুরি করেছে। আজ আবার বললো, আমার চুলের ব্রাশ খুঁজে পাচ্ছি না। ইরমা বললো ওটা ওর পুতুলের কাজে লাগবে। শুনে রেগে লাল হয়ে উঠলেন জন। ইরমা এক ছুটে ব্রাশটা নিয়ে এসে বাবাকে দিল। ব্রাশের গায়ে ওর বাবার কয়েকটা চুল লেগেছিল। জন এর জন্য ইরমার হাত মুচড়ে দিল। তারপর—

—পুতুলের জন্য ব্রাশ নিয়েছিল ইরমা? পুতুলটা বুঝি আপনি ওকে কিনে দিয়েছিলেন?

—আজ্ঞে না। ও নিজেই কাদামাটি দিয়ে বানিয়েছিল বোধ হয়। অবশ্য আমাকে না বলে ওর বাবাকে পুতুলটা কখনও দেখায় নি ইরমা। ওটা ও ওর জামার আড়ালে লুকিয়ে রাখে। মিস্টার স্টিভার, আপনার ভাইয়ের বাড়িতে আর আমি কখনও যাব না। ওই দৃশ্য মানে আমি বলতে চাইছি ছোট্ট মেয়েটাকে এত মারছে জন তা একদম সহ্য করা যায় না। সবচেয়ে আশ্চর্য এত মারের পরেও ইরমা কাঁদছে না, মুচকি মুচকি হাসছে। জন কি সত্যি সত্যি মেয়েটাকে ডাইনি হতে বাধ্য করছে?

মিস পলি অনেক অভিযোগ করে চলে গেলেন। মহিলা চলে যেতেই স্যাম ফোন করলো ভাইকে।

—হ্যালো কে জন?

—হ্যাঁ।

—কি শুনছি!

নিশ্চয় মিস পলি তোমার ওখানে গিয়েছিল। ওর একটা কথাও বিশ্বাস করো না। তোমায় সব কথা পরে বলবো।

—তোমার বাড়িতে—

—এখানে নয়, সবটা এখানে বলা যাবে না। সন্ধ্যেবেলা ডাক্তারের চেম্বারে যাব। হাতে বড় ব্যথা। কাল বরং তোমায় খবর দেব।

—ঠিক আছে তাই দিও।

পরের দিন দুপুর অবধি কোন ফোন এলো না। স্যাম চিন্তিত হলেন। বিকেলের দিকে স্যাম ফোন করলেন ভাইকে।

আশ্চর্য জন ফোন ধরলো না। ফোন ধরলো মেয়ে ইরমা।

—বাবা কোথায়?

—বাবা দোতলায় ঘুমোচ্ছেন। ওঁর বড় অসুখ।

—কি হয়েছে? হাতে ব্যথা?

—না পিঠে ব্যথা।

—মিস পলি?

—চলে গেছে।

—বাঁচা গেছে। ইরমা কোন দরকার হলেই তুমি আমায় ফোন করবে কিন্তু। তোমার বাবা তাড়াতাড়ি সেরে উঠুক।

—আমিও তাই চাই। ফোনে ওর খিক্ খিক্ হাসির শব্দ শোনা যাচ্ছে।

ফোনটা ছেড়ে দিল স্যাম।

পরের দিন দুপুরে...জনের ফোন এলো।

—স্যাম, তাড়াতাড়ি এসো।

—এখুনি?

—হ্যাঁ, ঈশ্বরের দোহাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এসো।

—কিন্তু অফিসে তো অনেক মক্কেল আছে এখনও, কি হয়েছে?

—বড় কষ্ট হচ্ছে?

—ডাক্তারকে খবর দাও।

—ডাক্তার শুধু ডায়াথার্মি চালিয়ে যাচ্ছে। হাতের ব্যথা। তারপর পিঠে, এখন আবার দেখছি বুকের খাঁচার ভিতরে ব্যথা। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।

—প্লুরিসি নয় তো?

—না।

—তাহলে?

—ডাক্তারকে আমি সত্যি কথা বলিনি—

—কি সত্যি কথা?

—ওই ইরমা, ওই সর্বনেশে ডাইনি মেয়ে মোম দিয়ে একটা পুতুল তৈরি করেছে। আলপিন ফোটাচ্ছে পুতুলের হাতে, পিঠে, বুকে, নিচের তলায় নেমে

ওকে বেঁধে পুতুলটা যে খুঁজে বের করবো এমন শক্তি আমার শরীরে নেই। মোমবাতির মোম, তাতে মিশিয়েছে আমার ব্রাশে পাওয়া চুল—স্যাম তুমি তাড়াতাড়ি এসো, ইরমার কাছ থেকে পুতুলটা কেড়ে নাও।

ভাইয়ের ফোন পেয়ে স্যাম দ্রুত তৈরি হল। আধঘণ্টা পরে বিকাল সাড়ে চারটের মধ্যে সে পৌঁছে গেল।

ইরমাই দরজা খুললো। মুখে হাসি। মাথায় সোনালি চুল, গোলাপি মুখ আশ্চর্য সুন্দর দেখাচ্ছিল।

—কি ব্যাপার আঙ্কেল, তুমি?

—তোমার বাবা কোথায়, শুনলাম ওর শরীর খুব খারাপ।

—এখন ভাল, ওপর তলায় ঘুমোচ্ছে।

তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলো স্যাম। জন ঘুমোচ্ছে। মুখটা শান্ত। নির্বিকার।

স্যাম ভাবলো জনকে চেঞ্জে পাঠাতে হবে। ইরমা থাকবে বোর্ডিংএ। একটা সুষ্ঠ ব্যবস্থা তার করা দরকার। জন ঘুমোচ্ছে যখন তখন তাকে ওঠানো চলে না। ঘুম ভাঙলে কথা হবে। তার চেয়ে নিচতলায় গিয়ে দেখা যাক ইরমা কি করছে।

সিঁড়ির শেষ ধাপে পা দিয়ে স্যাম দেখলো ইরমা সোফায় বসে, ওর কোলে ওটা কি? পুতুল? নিঃশব্দে স্যাম এসে দাঁড়ায় ইরমার পিছনে।

—ইরমা।

ইরমা সঙ্গে সঙ্গে পুতুলটা ফ্রকের আড়ালে আড়াল করে ফেলে।

—আঙ্কেল বাবা কেমন আছে, ভাল তাই না?

—হ্যাঁ। তবে শোন ইরমা তোমার বাবাকে ছ'মাসের জন্য চেঞ্জে পাঠাবো। তুমি স্কুল বোর্ডিং-এ থাকবে। কিন্তু ওটা—ওটা কি ইরমা? মনে হয় ডল পুতুল? মিস পলি বলেছিলেন, তুমি নাকি সুন্দর পুতুল বানাতে পারো।

—মিস পলি খুব খারাপ, তুমিও খুব খারাপ।

—পুতুলটা—ওকি?

ইরমার ফ্রকের আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছে পুতুলের মাথাটা।

ওটা কি তোমার কোলে? মুখটা তো অবিকল...অবিকল জনের মত।

—ইরমা পুতুলটা আমাকে দাও।

ইরমা পুতুলটা বার করলো। পরণে ট্রাউজার, পায়ে জুতো।

—ইরমা আমি জানি ওটা কার মুখ, কার চেহারা—ইরমা হাসলো, মিষ্টি হাসি উপচে পড়ছিল ওর মুখ থেকে। তারপর বললে—তুমি বড় বোকা আঙ্কেল, ওটা তো সত্যিকার পুতুল নয়।

—তাহলে ওটা কি?

—ক্যানডি—মিষ্টির পুতুল।

—মিষ্টির পুতুল, তাই নাকি? অবাক হয়ে স্যাম প্রশ্ন করে।

—হ্যাঁ, ভীষণ মিষ্টি খেতে।

এই বলে ইরমা আলতো ভাবে পুতুলটা তুললো। তারপর কামড় বসালো পুতুলটার মাথায়। চিবোতে লাগলো কচ্ কচ্ করে।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে দোতলার বেডরুম থেকে ভেসে এলো জনের বীভৎস মৃত্যুকাতর যন্ত্রণা। স্যাম ওই চিৎকার শুনে সোফা থেকে লাফিয়ে উঠে উপরে দৌড়ে গেল।

জনের কাতর স্বর তার কানে গেছে।

মাথায় সোনালি চুল, গোলাপি গাল...ইরমা হাসছিল। ছোট্ট পুতুলের মাথাটা কড়মড়িয়ে চিবিয়ে খাচ্ছিল সে। আসলে খাচ্ছিল তার বাবা জনের মাথাটা।

তারপর অদ্ভুত একটা হাসি হেসে সে কোথায় একছুটে রাতের কুয়াশা আর অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। তাকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

দ্য স্টেটমেন্ট অব র‍্যানডলফ কার্টার

এইচ. পি. লাভক্রফট

ভদ্রমহোদয়গণ! আমি বলছি আপনাদের বিচার ঠিক হচ্ছে না। দোহাই—কিছু একটা করুন, জানি আপনারা আমাকে জেলে পাঠাতে পারেন, নির্বাসন দিতে পারেন, এমনকি প্রাণদণ্ড পর্যন্ত দিতে পারেন—আমি এখন সব কিছুর জন্য প্রস্তুত। কেবল আমার অনুরোধ দয়া করে বিচারের নামে প্রহসন বন্ধ করুন।

আপনারা হয়ত বলবেন, তাহলে তুমি সঠিক স্বীকারোক্তি দাও। আমি তো বলছি, আমি যা বলবো তা নতুন নয়। আগেও যা বলেছি এখনও তাই বলবো। আমার যা মনে আছে সব কিছু হুবহু বর্ণনা করেছি। কোন কিছু লুকোইনি, গোপনও করিনি, কোন তফাৎ এমনকি কোন ঘটনার বিকৃতি পর্যন্ত ঘটাইনি। যা আমার নিজের কাছে অস্পষ্ট, ঘোলাটে, তাকে আমি আপনাদের কাছে স্বচ্ছ করে তুলবো কি ভাবে। শুধু বলতে পারি—আপনারা যা ভাবছেন আমি তা নই, আমি আদৌ দায়ী নই আমার বন্ধুর মৃত্যুর জন্য। তবে কি ভাবে সে মারা গেছে উফ্ আমি জানি না...কিচ্ছু জানি না, কেবল বলতে পারি দায়ী হল ভয়ঙ্কর কালো থাবা—যা আতঙ্কিত করে রেখেছে আমাকে সব সময়, যা আমার মনটাকে পিষে মেরে ফেলতে চেয়েছিল।

আমি আবার বলছি, আপনারা দয়া করে আমার বর্ণনা শুনুন। আমি যা ঘটেছিল তার নিখুঁত বর্ণনা দিতে পারি, কিন্তু যে ঘটনা সম্পর্কে আমার কিছু জানা নেই, তা আমি বর্ণনা দেব কি করে। আমি হাজার চেষ্টা করলেও বলতে পারবো না হার্লে ওয়ারেনের কি হয়েছিল—যদি সে বেঁচে থাকতো তাহলে একমাত্র সে কথা তার পক্ষেই বলা সম্ভব হত। আমি শুধু জানি—আমার প্রিয় বন্ধুটি আমাকে ছেড়ে অনেক দূরের এক জগতে চলে গেছে, যার সঙ্গে আমার আর কোন দিন দেখা হবে না। ওর মৃত্যুর জন্য দোহাই আমাকে আপনারা দায়ী করবেন না।

আমি স্বীকার করছি, গত পাঁচ বছরে ওয়ারেনের সঙ্গে আমি ছায়ার মত লেগেছিলাম। সবাই জানতো আমাদের বন্ধুত্বের কথা। আমার বন্ধুটির ছিল অদ্ভুত জগত নিয়ে কাজ কারবার। যে জগতের বিষয় কেউ জানে না, সেই অজানাকে জানার নেশা। আমি তার ভয়ংকর সেই গবেষণার অংশীদার হয়েছিলাম। কোন কাজ করবার সময় ওয়ারেন আমাকে জিজ্ঞাসা করতো, আমাদের মধ্যে আলোচনা

হত। এতকিছু সত্ত্বেও এখনও স্মৃতি আমার ঝাপসা, অনিশ্চিত—যদিও আপনাদের সাক্ষী বলেছে, সেই ভয়ঙ্কর রাতে প্রায় এগারোটার সময় আমাকে আর ওয়ারেনকে গেনসভিল পাইকে দেখেছে। আমরা দুজনে নাকি জলার ধার দিয়ে যাচ্ছিলাম। আমাদের হাতে ছিল টর্চ, কোদাল ও বিরাট তারের গোছা সহ টেলিফোন যন্ত্র। আমি অস্বীকার করছি না, কারণ ওই সমস্ত জিনিসগুলো সবই আমাদের কাছে ছিল। এই জিনিসগুলোর প্রত্যেকটা ওই বীভৎস নাটকের ভয়ঙ্কর দৃশ্যে কাজে লেগেছিল। সেই স্মৃতি আমার মনে এখনও জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডের মত জ্বলজ্বল করছে। ব্যস, এই পর্যন্ত তারপর কি ঘটেছিল, কেন আমার অজ্ঞান দেহটা ভোরবেলা জলার ধারে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল তার কারণ আমি বরাবর আপনাদের যা বলেছি, তার বেশি একটা বাড়তি কথাও আমি বলতে পারবো না। তবে এটা ঠিক আপনারা বলেছেন জলার ধারে আপনারা এমন কিছু খুঁজে পাননি যার সঙ্গে সেই ভয়ংকর ঘটনার কোন যোগ থাকতে পারে। দেখুন—আমি বার বার বলেছি, আবার বলছি, সেই রাতে যা দেখেছি ও যা শুনেছি সেইটুকু ছাড়া আমি তার বেশি আর কিছুই জানি না। হয়ত ওটা একটা দুঃস্বপ্ন আর দুঃস্বপ্ন হলে তাহলে আমি সত্যি খুশি হতাম। কিন্তু লোকচক্ষুর আড়ালে গেলেই—যখন আমি একা থাকি, বা একা হয়ে যাই, তখনই আতঙ্কিত মুহূর্তে, যা ঘটেছিল, যার বর্ণনা আমি দিতে পারি না—সেটা আমার মনকে গ্রাস করে ফেলে।

আগেও বলেছি আবার বলছি আমার বন্ধুটি অদ্ভুত সব বিষয় নিয়ে পড়াশুনো করত। তার লাইব্রেরিতে ছিল অসংখ্য বই—তার মধ্যে অধিকাংশ ছিল অদ্ভুত, দুর্লভ ও নিষিদ্ধ বইয়ের সংগ্রহ। নিজের ভাষার বই ছাড়াও আর সব ভাষার বই সে পড়তো—আসলে আমার বন্ধু অনেক ধরনের ভাষা জানতো। মাঝে মাঝে আমিও ও সব বইয়ের পাতা উল্টোতাম, মাঝে মাঝে বুঝতাম, কোনটার অর্থ বুঝতাম না। তবে ওর সংগ্রহশালায় উর্দু ভাষার লেখা কয়েকটি বই ছিল। শয়তানকে জাগিয়ে তোলার উপর যে বইটি এই নাটকের যবনিকা টেনেছে, সেটি যে ঠিক কোন্ ভাষায় লেখা ছিল তা আমি সঠিক ভাবে বলতে পারবো না। এর কারণ ওই বইতে যে অক্ষরগুলো দেখেছি, সেইরকম অক্ষর এর আগে কখনও দেখিনি। এই বইটি যে ঠিক কি বিষয় নিয়ে লেখা সে কথাও আমার বন্ধু ওয়ারেন আমায় কিছু পরিষ্কার করে বলেনি। শুনেছি বইটা নাকি দারুণ সাংঘাতিক। লক্ষ্য করছিলাম, আমার বন্ধুর সমস্ত আকর্ষণ যেন ওই বইটার ওপর গিয়ে পড়েছিল। বইটা পড়তে যে আমারও লোভ হত না এমন নয়—কিন্তু তা হবে কি করে আমি তো ওই ভাষাটা যে আদপে কোন ভাষা, তাই আমার জানা ছিল না। বন্ধুকে এই বিষয়ে বললে, সে শুধু হাসতো। সত্যি বলছি—ওই-ওই বইটার মলাটে এমন একটা আকর্ষণ ছিল যা আমাকেও টানতো। কে যেন আমায় বলতো—ওই বই

ভাল নয়, পড়ো না, ভয় পাবে। সব বই সকলের জন্য নয়। মিথ্যা কথা বলবো না—বইটার সম্পর্কে আমারও একটা ভয় ছিল।

ওয়ারেনকে প্রায়ই দেখতাম খুব চিন্তান্বিত। বুঝতাম সে কিছু ভাবছে। নতুন কিছু অনুসন্ধানের ঝোঁক তাকে পেয়ে বসেছে। তাই একদিন বললাম—কি ব্যাপার বলো তো ওয়ারেন, ওয়ারেন বললে—হাজার হাজার বছর ধরে কবরের নিচে ওরা বহাল তবিয়তে থাকে। তবে ভয় পাবার কিছু নেই। আমি জীবনে অনেক ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর বীভৎস নারকীয় বস্তুর সন্ধান পেয়েছি—যা সাধারণত কোন জীবন্ত মানুষ পায় না।

আমি ঠিক বলতে পারবো না সেদিন আমরা দুই বন্ধু কোথায় কিসের উদ্দেশে চলেছি। ওয়ারেন গবেষণার কাজে বড় একগুঁয়ে। শেষ না দেখে ছাড়ে না। কেবল বললে—প্রশ্ন করো না কেবল আমাকে অনুসরণ করো।

আপনাদের সাক্ষী বলেছে—রাত এগারোটার সময় সে আমাদের দেখেছে, আমরা নাকি জলার ধার দিয়ে যাচ্ছিলাম। কথাটা সম্ভবত ঠিক ছিল। আমার কিন্তু স্পষ্ট কিছু মনে নেই। নেশা করলে যেমন হয় সেই রকমই ছিল আমার অবস্থা। কোথায় যাচ্ছি...কেন যাচ্ছি—কিসের জন্য যাচ্ছি এসব কোন কিছুই আমি জানি না—কেবল জানি আমাকে ওয়ারেন বলেছে—তুমি আমাকে অনুসরণ করে যাও।

যতদূর আবছা মনে আছে, অনেকটা হাঁটার পর আমরা একটা কবরখানায় এসে পৌঁছালাম। এটি একটি পুরনো দিনের কবরখানা। চারিদিক জরাজীর্ণ, কাঁটা গাছের ঝোপ, আর জংলা ফুলের গাছে ভর্তি। এই সমস্ত ঝোপঝাড় পার হয়ে জরাজীর্ণ কবরখানা দেখতে দেখতে চাঁদের আলোয় আমরা একেবারে কবরখানার শেষ দিকে চলে এলাম। চারদিক থেকে পচা একটা গন্ধ ভেসে আসছিল। নাকের শ্বাসের সঙ্গে ওই গন্ধ মিশে আমাকে যেন অসহ্য করে তুলেছিল। ওয়ারেন বললো—ভয় নেই, এসব জায়গায় এলে এমন গন্ধ নাকে এসে লাগে।

আমি বললাম—এই জায়গাটাকে আমার আদৌ ভাল লাগছে না। ও বললে, আমার কিন্তু দারুণ লাগছে। লক্ষ্য করো মাথার উপর কাস্তের মত বাঁকানো চাঁদের আলো পড়ে মনে হচ্ছিল কবরের উঁচু উঁচু পাথরগুলো যেন সারিবদ্ধ সৈনিক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বহু শতাব্দীর ভারি নিস্তব্ধতা ভেঙে আমি আর ওয়ারেন সেই কবরখানাটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলাম। মনে হল দীর্ঘ একটা শতাব্দীর পর আমরা দুজনেই যেন এই কবরখানায় প্রবেশ করলাম। এরপর অনেকগুলো ভাঙাচোরা কবর দেখার পর আমরা একটা কবরের দিকে এগিয়ে গেলাম। কবরটার চারদিকে বুনো ঝোপ, লতাপাতায় ভর্তি। এবার দেখলাম ওয়ারেন কবরখানা থেকে কয়েকটা পা উত্তর মুখে সরে গেল, একটা বড় গ্রানাইট

পাথরের চাঁই দেখতে পেলাম। দেখলাম ওয়ারেন কোদাল দিয়ে মাটির অনেকটা কাটলো তারপর পাথরটাকে সরাবার চেষ্টা করলো। ও একা না পারায় আমি সাহায্যের জন্য এগিয়ে গেলাম। হাত লাগালাম। তারপর দুজনে কিছুক্ষণ চেষ্টার ফলে পাথরটা সামান্য নড়লো। এবার আমরা আস্তে আস্তে পাথরটাকে তুলে ফেললাম।

পাথরটা তুলতেই চোখে পড়লো একটা বিরাট গহ্বর। ওই গহ্বর থেকে পচা গলা শবের গন্ধ আসছে। গা গুলিয়ে উঠেছিল। কিছুটা ভয়ও আমরা পেলাম—যার জন্য আমরা ভয়ে পিছিয়ে গেলাম কয়েক পা। গর্তটার কাছ থেকে আমি সরে গেলাম। আমার বন্ধু গর্তটার দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবছিল। তারপর খানিকবাদে আবার দুজনে গর্তটার কাছে এলাম। ততক্ষণে গন্ধটা অনেকখানি কমে গেছে। এবার টর্চের আলো ফেললাম গর্তটার মধ্যে। চমকে উঠলাম—দেখলাম সিঁড়ি নেমে গেছে। ওয়ারেন অনেকক্ষণ ধরে অন্ধকারের সিঁড়িটা দেখার পর গম্ভীরভাবে আমাকে বললে—আলোটা ধরো।

আলো ফেললাম। সে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলো। আমিও নামতে যাচ্ছিলাম। বাধা দিল ওয়ারেন। বললে—আমি দুঃখিত। তোমাকে সঙ্গে নিতে পাচ্ছি না। কারণ নিচে গিয়ে যা দেখবো, তা তোমার মত দুর্বল লোকের পক্ষে সহ্য করা কঠিন হবে। হয়ত তোমার মৃত্যুও হতে পারে—আমাকে বন্ধু অপরাধী করো না, তুমি ফিরে যাও। আমি ওর কথায় যে খুশি হইনি সেটা বুঝেই ওয়ারেন বললো—আবার বলছি বন্ধু, নিচে গিয়ে যা দেখবে তা কল্পনা করতে পারবে না। এতদিন আমার গ্রন্থাগারে বসে যে সব বই দেখেছ—পড়েছ, আমার সঙ্গে গিয়ে যা সব দেখছ—তার তুলনায় আজ যা দেখতে চলেছি সেটা অনেকগুণ বেশি ভয়াবহ। নারকীয় জিনিস। ইস্পাতের মত কঠিন শক্ত স্নায়ু না হলে ও জিনিস কেউ দেখে বেঁচে ফিরে আসতে পারে না। বিশ্বাস করো, তুমি সঙ্গে থাকলে আমি খুব বেশি খুশি হতাম। কিন্তু আমি তোমাকে উন্মাদ করতে চাই না—চাই না মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে। জিনিসটা যে কি ভয়াবহ তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। কিন্তু আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি টেলিফোনে আমি সবসময় তোমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখবো। আমার কাছে অনেক তার আছে—প্রয়োজন হলে পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছেও আমি তোমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারবো।

আমি এখনও ওয়ারেনের সেই সব কথা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি। বেশ মনে আছে নিচে নামার জন্য ওর সঙ্গে আমার বহুক্ষণ তর্ক হল। শেষে ওয়ারেনের কথায় রাজি হলাম। তবু সন্তুষ্ট হতে পারিনি। আসলে আমিও বুঝতে চাইছিলাম, নিচে কি এমন অকল্পনীয় বস্তু আছে—যা দেখার টানে ওয়ারেন নিচে নামছে। যদি বিপদের কিছু থাকে তাহলে সে নিচে নামছে কেন? বিপদের মধ্যে আমি তাকেই বা ছেড়ে দেব

কেন? কিন্তু আমার বন্ধু গবেষক—একগুঁয়ে। ফলে আমি হার স্বীকার করলাম। ওয়ারেন কথা দিল টেলিফোনে সে প্রতিমুহূর্তে আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে। অতএব ওয়ারেন বিতর্ক শেষ করে আমার সঙ্গে করমর্দন করে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে লাগলো। আমি উপরে দাঁড়িয়ে তাকে আলো দেখাতে লাগলাম। টেলিফোনে শুনতে পাচ্ছিলাম ওর নিশ্বাসের শব্দ...তার হেঁচড়ানোর শব্দ। আলোয় আমি ওয়ারেনকে দেখতে পাচ্ছিলাম। একসময় ওর শরীরটা ক্রমশ আমার দৃষ্টির মধ্যে ছোট হয়ে আসছিল—তারপর আর দেখতে পেলাম না। মনে হল সিঁড়িটা বাঁক নিয়েছে। ওয়ারেন বাঁকের দিকে চলে গেল। আমি একা। সম্পূর্ণ একা।

আমি টর্চের আলোয় ঘড়ি দেখছিলাম। নির্জন জায়গাটা আমাকে অস্থির করে তুলছিল। টেলিফোন কানে দিয়ে আমি ওয়ারেনের কথা শোনার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু দেখতে দেখতে পনেরো মিনিট পার হয়ে গেল। ভয় ও উত্তেজনায় আমি দূরভাষ যন্ত্রের সাহায্যে ওয়ারেনকে ডাকতে লাগলাম। খুব চাপা ও সতর্ক কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। এরকম কণ্ঠস্বরে কথা বলতে ওয়ারেনকে আগে শুনিনি। সে বললে, ভয় নেই বন্ধু, আমি নরকের পথে অনেকটা চলে এসেছি। এতক্ষণে যা যা আমার চোখে পড়ছে, হে ভগবান—তুমি ভালই করেছ চোখে না দেখে।

আমি বেশ ভয় পেলাম। তারপর আবার নিস্তব্ধতা। আর কোন কথা নেই। পাঁচ মিনিট...দশ মিনিট অধৈর্য হয়ে উঠলাম। ভাবলাম একবার নেমে যাই সিঁড়ি দিয়ে। দেখে আসি ব্যাপারটা ঠিক কি—কিন্তু পরক্ষণে বন্ধুর নিষেধাজ্ঞা মনে পড়লো।

আবার শুনলাম ওয়ারেনের কণ্ঠস্বর।

—কার্টার—একি অসম্ভব ভয়াবহ, দানবীয় ব্যাপার। অবিশ্বাস্য। আমি তো চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে পারছি না।

আমার গলা শুকিয়ে গেছে। তবু শুকনো গলায় কোন রকমে বললাম—কি দেখছ তুমি ওয়ারেন। আমাকে একটু বলো। আমি শুনতে চাই। কি জিনিস? কি আছে ওখানে ধনরত্ন? নাকি সর্বনাশা কোন কিছু—আমাকে খুলে বলো।

ওয়ারেন বললে—আমি তোমায় বর্ণনায় বোঝাতে পারবো না। ভয়—চোখে দেখার পরেও বিশ্বাস হচ্ছে না কেমন ভাবে ওমন দানবীয় সব কাজকর্ম সম্ভব। আমার কাছে দুঃস্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে। একজন মানুষ এসব কিছু চোখের উপর দেখার পর কিছুতেই বাঁচতে পারে না।

আবার শব্দ থেমে গেল।

আমি তখন প্রশ্ন করে চলেছি—কি দেখছ ওয়ারেন, মরা মানুষ, গলা পচা শরীর...বলবে তো চুপ কেন? হঠাৎ শুনতে পেলাম এক ভয়ঙ্কর আর্তনাদ।

ওয়ারেনের কণ্ঠস্বর—কার্টার, ঈশ্বরের দোহাই তুমি দয়া করে গর্তের মুখ বন্ধ করে দাও। পাথরটা চাপা দিয়ে দাও। একদম দেরি করো না।

আমি চিৎকার করে বললাম—কি সর্বনাশ, কেন?

—ভয়ানক কিছু একটা ঘটতে চলেছে। তুমি যত তাড়াতাড়ি পারো গর্তের মুখ বন্ধ করে পালিয়ে যাও। ছুটতে থাক।

—কিন্তু তুমি?

—কথা বলার সময় নেই। যা বলছি তাই করো। দেরি হলে বিপদ ঘটে যাবে।

তবু আমি পারলাম না আমার বন্ধুর কথা মত কাজ করতে। রাগ হল। ভাবলাম কি দরকার ছিল এত বাড়াবাড়ি করার। পরক্ষণে মনে হল, নিচে যা কিছু ঘটে থাকুক না কেন, নিশ্চয় বিপদে পড়েছে ওয়ারেন। ওকে ফেলে আমি পালাবো কি করে? আমার বরং ওর খোঁজে নিচে নামা উচিত? আমি এসব কথা ভাবছিলাম।

ভাবছিলাম ঠিক কি ভাবে আমি কি করবো?

মুহূর্তে আবার শুনতে পেলাম ওয়ারেনের কণ্ঠস্বর।

—কার্টার ওকে আটকাও। ভগবানের দোহাই গর্তের মুখটা বন্ধ করে দাও।

আমি মনস্থির করে বললাম—ভয় নেই ওয়ারেন। আমি এক্ষুনি নিচে যাচ্ছি।

ওয়ারেন চিৎকার করে বললে—খবরদার বন্ধু, এমন কাজ করো না, তুমি বুঝতে পারছো না কি ভয়ানক দানবীয় বিপদ ঘটতে চলেছে। তুমি গর্তের মুখটা চাপা দিয়ে বন্ধ করে দাও আর দেরি না করে ওখান থেকে পালাও।

—পালাবো! অসম্ভব। নেমেই দেখা যাক না কি হয়? আমি মনস্থির করে গহ্বরে নামতে লাগলাম। খানিকটা যেতে শুনতে পেলাম ওয়ারেনের মর্মান্তিক পরবর্তী আর্তনাদ।

—কার্টার, অযথা দেরি করছো। পালিয়ে যাও। গর্তের মুখটা বন্ধ করে দাও। আমাদের দুজনের মরার চাইতে একজনের মরা ভাল...পাথরের চাঁইটাকে...।

ওয়ারেন থামলো।

অদ্ভুত একটা স্বর। বুঝলাম সব শেষ হয়ে গেল। আমার আর কিচ্ছু করার নেই। কেবল কানে ভাসতে লাগলো ওয়ারেনের কণ্ঠস্বর—পালাও। পাথরের চাঁইটা দিয়ে গর্তের মুখটা বন্ধ করে দাও।

তবু শেষবার চিৎকার করে টেলিফোনে ডাকলাম—ওয়ারেন তুমি কোথায়? সাড়া দাও বন্ধু! আমাকে বলো তোমার কি হয়েছে?

তারপর সেই ভয়াবহ, অবিশ্বাস্য, অচিন্ত্যনীয়, অবর্ণনীয়, আতঙ্কিত ছায়া আমাকে গ্রাস করলো। ওয়ারেনের শেষ সতর্কবাণী শোনার পর আমার মনে হল আমি যে বহুযুগ হল এই কারখানার মধ্যে একা একা বসে আছি। এরপর আমি ভয়ানক ভাবে চিৎকার করে উঠলাম।

ওয়ারেন তুমি কি নিচে আছো?

ভিতরে যা শুনলাম, তা যেন কোন জীবন্ত মানুষ কোনদিন না শোনে। ভদ্রমহোদয়গণ! আমি সেই স্বরের বর্ণনা দিতে পারবো না। বিশদভাবে তার ব্যাখ্যাও আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ শব্দটা আমার কানে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। সবকিছু আমার মন থেকে মুছে যায়। হাসপাতালে জ্ঞান না ফেরা পর্যন্ত আমি ওই অবস্থায় ছিলাম। কিভাবে আমি ওই কণ্ঠস্বরের বর্ণনা দেব? ওটা কি নরক থেকে উঠে আসা কোন গভীর স্বর? নাকি ছিল দূরাগত কোন অপার্থিব ধ্বনি।

কি বলবো আমি?

শুধু বলতে পারি কণ্ঠস্বর যখন শুনেছিলাম তখন আমি হতভম্বের মত প্রাচীন কবরখানায় জংলা ভগ্নস্তূপের মধ্যে বসে কবরের খোলা গর্তটার দিকে তাকিয়ে ছিলাম। আর মাথার উপর আকাশে তখন চাঁদের ম্লান আলোয় অগুনতি বিদেহী ছায়ার ভৌতিক নাচ শুরু হয়েছিল। পাতালের ভিতর থেকে ভেসে আসছিল এক আশ্চর্য ভয়াবহ কণ্ঠস্বর—ওয়ারেন আর নেই। তাকে আমরা খতম করে রক্ত চুষে খাচ্ছি। এরপর তোমার পালা তারপর পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষের পালা।

কেবল মনে আছে আমি তখনই পাথরটাকে গর্তের দিকে গড়িয়ে দিয়েছিলাম।

দ্য সাউণ্ড মেশিন

রোনাল্ড ড্যাল

ঘড়িতে আমি অ্যালার্ম দিয়ে রেখেছিলাম।

ভোর পাঁচটায় আমার ঘড়িটা বেজে উঠতেই ঘুমটা ভেঙে গেল। বিরক্ত হয়ে হাত বাড়িয়ে প্রথমে ঘড়ির ওই বিশ্রী আর্তনাদকে বন্ধ করলাম। তারপর বিছানায় উঠে বসে ভাবতে চেষ্টা করলাম আমি গতকাল রাত্রে শোয়ার আগে ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়েছিলাম কিনা?

কথাটা মনে হতেই তড়াং করে লাফিয়ে উঠে পড়লাম বিছানা থেকে। ধন্যবাদ দিলাম ঘড়িটাকে। আর সময় নষ্ট করা উচিত নয়। এখুনি আমাকে বেরিয়ে পড়তে হবে।

আমি দ্রুত রাতের পোশাক ছেড়ে প্যান্ট-কোট চাপালাম। তারপর দরজা লক করে বেরিয়ে এলাম বাইরে।

আমার বাড়ির সামনে একটা লাগোয়া বাগান।

বাগানটা বেশ বড়, তবে ঠিক বাগান বলতে যা বোঝায় তা নয়। গাছ আছে, তবে সেগুলোকে এক সময় যত্ন নেওয়া হত, এখন নেওয়া হয় না। ফলে বড় আগোছালো। জায়গায় জায়গায় ঝোপ ও জঞ্জাল তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে বর্ষার সময় বাগানটার চেহারা লম্বা লম্বা ঘাসের নিচে জল জমে খুব খারাপ হয়ে যায়। তবু বলবো বাগানটা আমার প্রিয়।

এখানে বেশ ভাল জাতের সিডার, পাম, উইলো গাছ আছে। অসংখ্য ফুলের গাছ। ফুল ফুটলে বাগানটাকে ভারি সুন্দর লাগে। অনেক ধরনের ফুল বাগানে ফোটে। এই ফুলগুলোর অর্ধেকের বেশি নাম আমার জানা নেই।

ভোরবেলা এই বাগানে অনেকে বেড়াতে আসে। আমার বাগানে বেড়াতে খুব যে ভাল লাগে এমন নয় তবু বাগানে আমি ভোরের দিকে প্রায়ই যাই।

আপনারা কি মনে করছেন আজ আমি ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে রেখেছিলাম বাগানে যাব বলে। উঁহু—আদৌ ব্যাপারটা তা নয়। বাগানের দিকেই যাচ্ছি, তবে বেড়াতে নয়। আমার ওখানে একটা জরুরী কাজ আছে। খুব সকাল সকাল পৌছতে না পারলে একা একা শান্তিতে কাজটা করতে পারবো না।

আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম। হাঁটতে লাগলাম বাগানের দিকে। আলো

তখনও পরিষ্কার ভাবে ফোটেনি। আমি তো এই রকম একটা অবস্থাই চেয়েছিলাম। হাঁটতে লাগলাম গ্রীনহাউসের দিকে।

গ্রীনহাউসের ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলাম। কাঁচ দিয়ে চারদিক ঘেরা। আমি দেখতে পেলাম দূরে কালো রঙের বাক্সটা ঠিক জায়গায় আছে। ওটা আমি এখানে রেখে গেছি। ওটাতে কেউ হাত দেয় না।

আমার এই কালো রঙের বাক্সটা খুব একটা ছোট নয়। লম্বায় তিন ফুট, উচ্চতায় একফুট ও চওড়ায় প্রায় ফুট দেড়েকের মত হবে। বাক্সটার পাশে একটা কাগজ রেখে গিয়েছিলাম দেখলাম সেটা যেমন রেখে ছিলাম ঠিক সেই রকমই আছে। ওই কাগজটা দেখলে কেউ কিছুই বুঝবে না। ভাববে লোকটা পাগল। দুর্ভেদ্য সব আকঝোঁক কেটেছে নিজের খেয়ালে।

আসলে এ একটা সার্কিট আঁকা। আমি কাছে এগিয়ে গেলাম। কালো বাক্সটায় কোন ডালা নেই। আমি পড়ে থাকা সার্কিট আঁকা কাগজটা হাতে তুলে নিলাম, তারপর মেলাতে লাগলাম বাক্সের সার্কিটটার সঙ্গে।

বাক্সের ডালা না থাকার জন্য দেখা যাচ্ছিল অসংখ্য ধরনের তার, ট্রানজিসটার, ট্রানসফরমার, কনডেনসারগুলোকে। আমি এক ঝলক ভালভাবে চোখ বুলিয়ে নিয়ে আমার আঁকা কাগজটার সঙ্গে মিলিয়ে দেখে নিলাম সব ঠিক-ঠাক আছে কিনা। তারপর সার্কিট ডায়াগ্রাম কনসাল্ট করে কিছু কিছু জায়গায় দ্রুত রদবদল করে নিয়ে আবার পরীক্ষা করে দেখলাম। না—সব ঠিক আছে। ঠিক যেমন আমার সার্কিটের ডায়াগ্রামে আঁকা আছে, ঠিক সেই রকম ভাবে কিছু সেট করা হয়েছে।

বাক্সটার সামনে একটা বড় ডায়াল আর একটা মিটার লাগানো আছে। মিটারটা হল ফ্রিকোয়েনসি মিটার। তার পাশে আছে গোটা দুয়েক ছোট ছোট নব। এই যে ফ্রিকোয়েনসি মিটার-এর গ্র্যাজুয়েশন হল পনেরো হাজার থেকে দশ লক্ষ পর্যন্ত। পাশেই আছে ভলিউম কন্ট্রোল নব আর তার পাশে আছে ইনটেনসিটি পর্যবেক্ষণ করার জন্য ইনটেনসিটি মিটার।

কোন কাজ শুরু করার আগে সব কিছুকে বারবার পরীক্ষা করে নেওয়া দরকার। আমার বাবাকে দেখে আমি এটা শিখেছি। এটা একটা খুঁতখুঁতে মানসিক রোগ বলতে পারেন। যতক্ষণ না মনের দিক দিয়ে সাড়া পাচ্ছি, ততক্ষণ আমায় মেলাতে হবে। অতএব আবার নতুন করে ডায়াগ্রামটার সঙ্গে গোটা ব্যাপারটা মিলিয়ে নিলাম।

এবার আমার মুখে হাসি ফুটলো। সোজা দাঁড়ালাম। আর অপেক্ষা নয়, কাজ শুরু করা দরকার।

হঠাৎ একসময় কাঁচের দেয়াল ভেদ করে আমার দৃষ্টিটা আটকে গেল। দেখতে পেলাম গ্রীনহাউসের দিকেই বেশ ধীর পায়ে এগিয়ে আসছেন ডাক্তার স্কট।

লোকটাকে আমি একদম সহ্য করতে পারি না। ডাক্তার হলে কি হবে—লোকটা যাকে বলে পাক্কা শয়তান। ওকে দেখেই মনটা বিষিয়ে উঠলো। মনে মনে বললাম শয়তান, তুমি আসার আর সময় পেলে না, ঠিক আমার কাজের সময় এসে হাজির হয়েছ।

দরজা ঠেলে ডাক্তার প্রবেশ করলেন—ওহে, আজ তুমি কেমন আছো?

প্রশ্ন করার ছিরি দেখ—এমন ভাবে যেন আমি ওর রুগী। স্রেফ বাবার বন্ধু সেই কারণে তাকে কিছু বলতে পারলাম না। অন্য কেউ হলে ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দিতাম ওর গালে। সেক্ষেত্রে আমি ওর দিকে না তাকিয়ে গম্ভীরভাবে উত্তর দিলাম—কি রকম আবার থাকবো, ভালোই আছি।

—মনে হয় তুমি খুব চটেছ?

এবার সত্যিই মনের রাগত চেহারা প্রকাশ করে ফেললাম।

বললাম—আপনার প্রশ্নের যা ধরন তাতে রাগ হওয়াই স্বাভাবিক।

—কেন, কি খারাপ প্রশ্নটা তোমায় করেছি?

—এই দেখ আবার তর্ক করছে। বিরক্ত হয়ে বললাম—আপনি প্রতিদিন ওই এক প্রশ্ন আমায় করেন কেন বলুন তো? আমি কি আপনার রুগী। নাকি আমার খারাপ থাকার কোন কারণ ঘটেছে।

এবার ডাক্তার বসলেন। গা জ্বালা করে উঠলো। কি রকম গর্দভ দেখ। মান-অপমান বোধ পর্যন্ত নেই। বরং কথা বাড়াচ্ছে, অন্য কেউ হলে চলে যেত।

ডাক্তার বললেন—আরে বাপু তোমায় তো অনেকদিন ধরেই চিনি। তুমি সাত সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছ তাই...

আমি এবার জবাব না দিয়ে বাক্সটায় যে কটা স্ক্রু লুজ ছিল, সেগুলোকে টাইট করে নিলাম।

ডাক্তার আমায় পিছন থেকে লক্ষ্য করে বললেন—এ আবার নতুন কি খেয়াল তোমার মাথায় চাপলো।

আমি নিরুত্তর।

—ওটা কি রেডিও নাকি?

এবার সত্যি মাথায় আমার রাগ চড়ে গেল। মনে মনে বললাম—হতভাগা, আর তামাশা করার জায়গা পাওনি। দ্রুত তাই ডাক্তারের দিকে ঘুরে বললাম—না জেনে কোন কিছু মন্তব্য করা উচিত নয়। আর এটা জানবেন আমি পাগল নই যে আমার মাথায় হঠাৎ হঠাৎ কোন খেয়াল চাপবে। মানছি, আমার বাবা পাগল ছিলেন। তা বলে আমাকেও পাগল হতে হবে তার কোন মানে নেই। আর এটাও

ঠিক বাবা আমার সত্যিকারের পাগল ছিলেন কিনা তাও আমার জানা হয়নি। কারণ আপনাদের মত কিছু লোক বাবাকে পাগল সাব্যস্ত করে এ্যালাইলামে পাঠিয়েছিলেন। বলুন তো সত্যি করে আমার বাবা আপনাদের কি কোনও ক্ষতি করেছিলেন?

আমার মুখ চোখের চেহারা ও-কণ্ঠস্বর শুনে ডাক্তার স্কট রীতিমতো ভয় পেয়েছেন বোঝা গেল। তিনি বিব্রত কণ্ঠে বললেন—আহা তুমি তো দেখছি ভীষণ চটেছ আমার উপর। কিন্তু এটা মানবে তো আমি ছিলাম তোমার বাবার ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

—সেইজন্য তো আপনাকে কিছু বলতে পারি না। তা না হলে আপনি আমাকে দেখলে প্রতিদিন যা প্রশ্ন করেন সেটা মোটেই শোভন নয়। লোকে মনে করে আমিও পাগল, আপনি আমার ট্রিটমেন্ট করছেন।

ডাক্তার স্কট এবার সহজ হওয়ার চেষ্টা করে বললেন, আমার কথাটা তুমি ওভাবে নিচ্ছ কেন। আসলে আমি প্রশ্ন করি তোমাকে পাগল বলে নয়, তোমার ব্লাডপ্রেসার আছে বলে।

ডাক্তার স্কটের মুখের দিকে তাকিয়ে এবার আমার খারাপ লাগলো। হাজার হোক বয়স্ক মানুষ। বাবার বন্ধু। এই ভাবে বলাটা হয়ত আমার উচিত হয়নি। তাই বললাম—আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন। কিছু মনে করবেন না আমার কথায়। তারপর বললাম—ও হ্যাঁ কি যেন প্রশ্ন করেছিলেন না—এটা রেডিও কি না? না, এটা রেডিও নয়।

তারপর একটু থেমে বেশ স্বাভাবিক ভাবে ডাক্তারকে বোঝাতে লাগলাম বস্তুটা আদপে কি।

বলতে লাগলাম অনেকটা লেকচার দেওয়ার ঢঙে—ডাক্তার আপনি নিশ্চয় জানেন প্রতিটি শব্দের একটা ফ্রিকোয়েন্সি আছে। কিন্তু সব ফ্রিকোয়েন্সির শব্দগুলো আমরা ঠিকঠাক ভাবে শুনতে পাই না। তার কারণ হল আমাদের কানের সে ক্ষমতা নেই। যে সমস্ত শব্দের কম্পাঙ্ক কুড়ির কম আবার ষোলো হাজারের বেশি সেইগুলো আমরা অর্থাৎ মানুষেরা শুনতে পাই না। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হল মানুষেরা যে শব্দ শুনতে পাই না, সেই শব্দ কুকুর শুনতে পায় কারণ শ্রবণেন্দ্রিয় মানুষের চেয়ে কুকুরের বেশি শক্তিশালী । তারা বাইশ হাজার কম্পাঙ্কের শব্দ শুনতে পায়। আবার কুকুরের চাইতে বাদুড়ের শ্রবণক্ষমতা বেশি কারণ তারা আরও বেশি কম্পাঙ্কের শব্দ শুনতে পায়। এখন আমার প্রশ্ন হল, প্রতিদিন আমাদের চারপাশে কুড়ির কম ও পনেরো বা ষোলো হাজারের বেশি কম্পাঙ্ক এমন কোটি কোটি শব্দ সৃষ্টি করে যা আমরা শুনতে পাই না। যেমন ধরুন হাওয়ায় গাছের একটা পাতা কাঁপলো, আমরা দেখতে পেলাম কিন্তু তার শব্দ শুনতে পেলাম না। যদি আমার আপনার

কান উচ্চশক্তিক্ষমতাসম্পন্ন হত তাহলে নিশ্চয় ওই শব্দ আমরা শুনতে পেতাম। এর ফলে আমাদের কাছে একটা শব্দের জগৎ অচেনা অজানা থেকে যাচ্ছে। ভাবুন তো একবার একটা কুকুর যে শব্দ শুনছে আমরা তা শুনতে পাচ্ছি না—এটা হবে কেন। আমাদের সেই শব্দ শুনতে হবে।

আমি এবার থামলাম। দেখলাম ডাক্তার নির্বিকার। আমার কথাগুলো ওর কর্ণগোচর হয়েছে বলে মনে হল না। বরং বেশ বোঝা গেল লোকটা আমার কথাকে পাগলের প্রলাপ বলে ধরে নিয়ে মনে মনে কৌতুক অনুভব করছে। ভ্রূ নাচাচ্ছে। আমার চোখে চোখ পড়তেই উনি বললেন—তারপর?

—তারপর আর কি বলবো?

আসলে ঠিক মনে পড়ছিল না ওকে আমি কি বোঝাচ্ছিলাম। হঠাৎ কালো বাক্সটা দেখে মনে পড়ে গেল। আবার বলতে শুরু করলাম—এই যে আমাদের পাশে যত শব্দ হচ্ছে যা আমরা শুনতে পাই না, সেগুলোর মধ্যে নিশ্চয়ই সুর আছে, ছন্দ আছে।

ডাক্তার এবার বললেন—এটা তোমার কল্পনা।

আমার মেজাজটা আবার গরম হয়ে গেল। কল্পনা হতে যাবে কেন? ওই যে মাছিটা এই মুহূর্তে ডাক্তারের কোর্টের উপর উড়ে এসে বসেছে—ওর নিশ্চয় একটা মুখ আছে, জিভ আছে, গলা আছে, যদি এগুলো থাকে তাহলে নিশ্চয় ওরা শব্দ করে—কথা বলে? আমরা ওদের কথার অর্থ হয়ত বুঝতে পারবো না, কিন্তু কথা বলাটাকে তো অসম্ভব বলতে পারি না। আসলে আমরা ওদের কথার শব্দ শুনতে পাই না।

আমার কথা শেষ হওয়া মাত্র দেখলাম ডাক্তার স্কট অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। ভাবটা এমন যেন তিনি এতক্ষণ আমার পাগলামো কথাবার্তা শুনছিলেন। দরজা ঠেলে ওকে বাইরে বেরিয়ে যেতে দেখে আমি চিৎকার করে ডাকলাম—ডাক্তার!

ভদ্রলোক থমকে গেলেন।

আমার দিকে ফিরে তাকালেন।

আমি বললাম—প্রশ্ন যখন করেছেন, তখন আপনাকে আমার সমস্ত বক্তব্য শুনতে হবে।

আমার হাবভাব দেখে তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন।

এবার আমি বললাম—আমার এই যে যন্ত্রটা দেখছেন যাকে আপনি রেডিও বলে ভুল করেছিলেন, এটা হল এমন একটা যন্ত্র যা সমস্ত সুপারসনিক সাউণ্ডে অডিবল রেঞ্জে নিয়ে আসবে। অর্থাৎ এই যন্ত্রের সাহায্যে আমরা ষোল হাজার কম্পনের বেশি শব্দগুলোকে শুনতে পাবো।

এবার ডাক্তার মৃদু হেসে বললেন—ওই কালো বাক্সটা দিয়ে।

—হ্যাঁ।

—না, সত্যি তোমার মাথাটা দেখছি খারাপ হয়েছে। এই সামান্য বাক্স দিয়ে—কথাটা বলে ভদ্রলোক হেসে উঠে মুহূর্তের মধ্যে থমকে গেলেন। আমার দু'চোখ দিয়ে তখন আগুন ঝরছে। বলে কি লোকটা—আমি পাগল? আমি ওর দিকে দু-এক পা এগিয়ে যাওয়া মাত্র ডাক্তার ভয়ে দরজার কাছে পৌঁছে গেলেন।

আমি চিৎকার করে বললাম—গেট আউট।

ডাক্তার দ্রুত বেরিয়ে গেলেন।

আমার রাগে শরীর কাঁপছিল। অস্ফুট স্বরে বললাম—স্কাউন্ড্রেল।

তারপর এসে দাঁড়ালাম আমার তৈরি করা কালো বাক্সটার সামনে। ওর গায়ে বড় মমতা নিয়ে হাত বোলালাম। বলে কি লোকটা—আমি পাগল। আমার মাথা খারাপ। আমি পাগল হলে এমন একটা যন্ত্র তৈরি করতে পারতাম। নিশ্চয় নয়। এর জন্য আমাকে বহুদিন বহু শ্রম করতে হয়েছে। প্রথম প্রথম শব্দগুলো ইন অডিবল রেঞ্জেই থেকে যেত। ইনটেনসিটি মিটার দেখেই সেটা বুঝতে পারতাম। কিন্তু এটা যদি সফল হয় তখন...তখন কি আমাকে কেউ পাগল বলতে সাহস পাবে? আমার বাবা যে কাজ করতে করতে একদিন পাগল সাব্যস্ত হয়েছিলেন, আমি সেই অসম্পূর্ণ কাজকে পরীক্ষার মাধ্যমে সফল করে তুলেছি।

বাবার মুখটা ভেসে উঠলো। বললাম, বাবা তুমি আমায় আশীর্বাদ করো। আমাকে শক্তি দাও। সাহস দাও। আমার দিকে লক্ষ্য রাখো। শুনলে তো তোমার ওই গুণধর বন্ধু ডাক্তার স্কটের কথা। লোকটা বলে কিনা আমি পাগল—একদম মিথ্যা কথা। আমার ব্লাডপ্রেসার আছে, কিন্তু...

এরপর আমার যা যা করণীয় কাজ ছিল সেগুলো করে বাড়ি ফিরে এলাম।

বিকালে আবার গেলাম গ্রীনহাউসে। কালো বাক্সটায় হাত দিলাম। কি অসম্ভব ভার। অনেক কষ্টে ওটাকে ওঠালাম। তারপর নিয়ে এলাম বাগানে। বিকালের রোদ এসে পড়েছে বাগানে। চারদিকে পাখি ডাকছে। পড়ন্ত রোদে বিকালের বাগানকে ভারি সুন্দর লাগছে।

যন্ত্রটাকে একটা জায়গায় নামিয়ে রেখে আবার গ্রীনহাউসে এলাম আমার ইয়ার ফোনটা আনতে।

এবার ফিরে এসে ইয়ারফোনের টার্মিনাল দুটো যোগ করে দিলাম বাক্স থেকে বেরিয়ে আসা ইয়ারফোনের লীড দুটোয়। তারপর তাকালাম চারদিকে।

শান্ত পরিবেশ।

ঘড়িটা দেখলাম। ঠিক পাঁচটা বাজে। পাখিদের কিচির মিচির ডাক অনেক শান্ত

হয়ে গেছে। এবার ইয়ারফোনটা এঁটে নিলাম কানে। তারপর ধীরে ধীরে ফ্রিকোয়েন্সি নবটা ঘোরালাম। মিটারের কাঁটাটা তিরিশ হাজারের কাছাকাছি আসতেই আমি চমকে উঠলাম উফ্—কি আর্তনাদ!

ওই আর্তনাদ কানে যেতেই আমি একরকম প্রায় লাফিয়ে উঠলাম। ইয়ারফোন ছিটকে গেল। আমি চারিদিকে তাকালাম। কোথা থেকে আসছে আর্তনাদ বোঝার চেষ্টা করলাম। কাছাকাছি বাড়ি বলতে মিসেস সণ্ডার্স। তিনি বাড়িতে নেই। বাগানের এক কোণে ফুল তুলছেন। তার হাতে একটা সুন্দর ডালি তাতে ফুল বোঝাই।

আমার কি মনে হল, আমি ওর দিকে দৌড়ে গেলাম।

বললাম—মিসেস সণ্ডার্স, আপনি কি কোন চিৎকার শুনেছেন?

—চিৎকার কই নাতো!

—সত্যি আপনি কিছু শুনতে পাননি।

—না।

—আমি শুনেছি এই মাত্র।

মহিলা হেসে বললেন—আমি তো ফুল তুলছি।

আমি আবার ফিরে এলাম সুপারসনিক মাইক্রোফোনের সামনে। এবার কানে ইয়ারফোন লাগিয়ে আড়চোখে নজর রাখলাম মিসেস সণ্ডার্স এর দিকে। তারপর ঘোরাতে লাগলাম ফ্রিকোয়েন্সি মিটারের নবটা আবার সেই একই ঘটনা ঘটলো। তিরিশ হাজারের কাছে কাঁটা আসতেই শোনা গেল তীব্র আর্তনাদ।

এবার সত্যি অবাক হলাম। আশ্চর্য মিসেস সণ্ডার্সের মধ্যে তো কোন ভাবান্তর ঘটেনি। উনি দিব্যি হাসি হাসি মুখে ফুল তুলছেন।

তাহলে এই আর্তনাদের কারণ কি হতে পারে? কোথা থেকে আসছে এই শব্দ?

এরপর লক্ষ্য করলাম, মিসেস সণ্ডার্স যখনই একটা করে ফুল ছিঁড়ছেন তখনই শোনা যাচ্ছে ওই আর্তনাদ। বুকের ভিতর রক্ত যেন লাফিয়ে উঠলো। আমি ইয়ার-ফোন ছেড়ে দৌড়ে গেলাম মিসেস সণ্ডার্সের কাছে।

বললাম—প্লিজ আমার একটা কথা রাখুন।

—কি কথা?

—দয়া করে একটা ফুল তুলুন আমার জন্য। ঠিক আমি যখন বলবো তখন তুলবেন ফুলটা।

মিসেস সণ্ডার্স আমার কথায় কি ভাবলেন কে জানে। তারপর মৃদু হেসে বললেন—ঠিক আছে, তোমার কথা রাখছি।

আমি আবার দৌড়ে চলে এলাম কালো বাক্সটার কাছে। কানে ইয়ারফোন লাগিয়ে ফ্রিকোয়েন্সি মিটারের নবে হাত ছোঁয়ালাম। কাঁটা ঘুরতে ঘুরতে তিরিশ

হাজারের কাছাকাছি আসতেই আমি মহিলার দিকে তাকিয়ে হাত তুলে ইশারা করলাম ফুল ছিঁড়তে। আমার ইশারা পাওয়া মাত্র মহিলা একটা ফুল ছিঁড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে আমার কানে এসে ধাক্কা দিল সেই সুতীব্র আর্তনাদ। আনন্দে আমি লাফিয়ে উঠলাম। আমার স্বপ্ন সফল হয়েছে। আমার সাধনা সার্থক। এরপর আমি মিসেস সণ্ডার্সকে হাত দিয়ে ইশারা করলাম অপেক্ষা করতে। মহিলা তো অবাক। উনি আমার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন। আমি এগিয়ে গেলাম ওর দিকে। কাছে গিয়ে মহিলাকে বললাম—আপনি কি কখনও ভেবে দেখেছেন ফুল ছেঁড়াটা আপনার উচিত নয়। আপনার মাথা থেকে চুল ছিঁড়লে ঠিক যতটা লাগে, ঠিক ততোটাই কষ্ট হয় একটা গাছের যখন আপনি গাছ থেকে ফুল ছেঁড়েন। আপনার তো বোঝা উচিত গাছের প্রাণ আছে। মানুষের যেমন একটা নার্ভাস সিস্টেম আছে, তেমনি গাছেরও আছে। হয়ত সেটা ঠিক মানুষের মত নয় একটু অন্য রকম। একবার ভেবে দেখুন তো আপনি যখন ডাল ধরে ফুলগুলোকে টেনে টেনে ছিঁড়ছেন তখন গাছগুলো কি অসম্ভব কষ্ট পাচ্ছে। তারা কষ্টে চিৎকার করছে অথচ আপনি শুনতে পাচ্ছেন না।

মহিলা ফ্যালফ্যাল করে আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। কথা শেষ হওয়া মাত্র তিনি ভয়ে ভয়ে আমাকে বললেন—আমি যাই এখন কেমন।

ওর কথাটা আমি শুনতে পাইনি। আসলে আমার পরীক্ষা সফল হয়েছে। আনন্দে উত্তেজনায় আমি তখন কাঁপছি। মহিলাকে বলতে লাগলাম ধরুন এখন যদি আমি আপনার গলাটা ধরে একটানে ছিঁড়ে ফেলি।

উত্তেজনায় আমার একটা হাত আমার অজান্তে এগিয়ে গেল মিসেস সণ্ডার্সের দিকে। তিনি ভয় পেয়ে চিৎকার করলেন। আমি কিন্তু ওর চিৎকার উপেক্ষা করে বলতে লাগলাম—আপনি বোঝেন না গাছগুলোর কষ্ট হয়। ওরা মানুষ নয় বটে তবে প্রাণী জগতের মধ্যে পড়ে। প্রত্যেক প্রাণীর প্রাণ আছে। যেমন কুকুর, বিড়াল এদের প্রাণ আছে, অনুভূতি আছে, তেমনি গাছেরও আছে।

মিসেস সণ্ডার্স নীরব। হতচকিত। কি বলবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। আমি বললাম—খবরদার আর কোনদিন ফুল ছিঁড়বেন না। ওদের কষ্ট হয়। ওরা প্রতিবাদ করে—চিৎকার করে, কিন্তু সেই চিৎকার আমরা শুনতে পাই না, এর কারণ আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয় তীব্র শক্তিসম্পন্ন নয়। যেহেতু আপনি ওই চিৎকার শুনতে পান না, তার মানে এই নয় যে ওরা চিৎকার করে না।

আমার মুখচোখের চেহারা দেখে মহিলা কি ভয় পেয়েছিলেন? হয়ত—তা না হলে ওভাবে তিনি বাগান পেরিয়ে দৌড়ে পালালেন কেন। ছুটে পালাবার আগে ওর সাজি থেকে ফুলগুলো মাটিতে পড়ে গেল।

আমি ফুলগুলোকে মাটি থেকে কুড়োলাম। আহারে, তোমাদের বড় কষ্ট হচ্ছে।

বড় লেগেছে। তারপর বললাম ওদের গায়ে হাত বুলিয়ে তোমাদের জন্য সমবেদনার প্রকাশের ভাষা আমার নেই।

এরপর আমি ফিরে এলাম আমার সুপারসনিক মাইক্রোফোনের কাছে। আবার নতুন করে ইয়ারফোন কানে লাগালাম। নবটা ঘুরিয়ে ঘাস ছিঁড়তে লাগলাম।

শুনতে পেলাম হিসহিস কিছু শব্দ। তাকালাম ফ্রিকোয়েন্সি মিটারের দিকে। কাঁটাটা থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে যাচ্ছে। পার হয়ে যাচ্ছে...তিরিশ...পঁয়ত্রিশ...আটত্রিশ হাজার...শব্দ আরো তীব্র হল।

আনন্দ। বড় আনন্দের দিন আজ আমার। আমার সাধটা সফল হয়েছে।

সেদিনের মত চলে এলাম গ্রীনহাউস থেকে।

সারারাত ঘুম হল না। অথচ আমার একটু ঘুমের দরকার।

মাথার মধ্যে উত্তেজনায় কে যেন ড্রাম বাজাচ্ছে।

পরের দিন ঘুম ভাঙলো বেশ দেরিতে। কিছুক্ষণ বিছানায় বসে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে ভাবতে চেষ্টা করলাম আমার যেন কী কাজ করণীয় আছে। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম আমার বিছানায় কিছু ছেঁড়া ফুল পড়ে আছে। ব্যস সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল মিসেস সণ্ডার্সের কথা। রক্তগোলাপের আর্তনাদের কথা। আমি ছুটলাম বাগানের দিকে।

ওই অর্বাচীন ডাক্তারকে আজ আমি দেখাতে চাই আমি কতটা সফল হয়েছি। আমার মাথা আদৌ খারাপ হয়নি।

গ্রীনহাউসে পৌঁছে আমি কালো বাক্সটাকে নিয়ে এলাম। রাখলাম একটা বিশাল বড় দেবদারু গাছের নিচে। তারপর একটা কুড়ুল নিয়ে এসে, প্রথমে হেডফোনটা কানে লাগিয়ে নিলাম। তারপর হেডফোনের সঙ্গে যোগ করলাম আমার যন্ত্রটাকে। নব ঘোরালাম। সুইচ অন—

শুরু করলাম গাছটার গায়ে আঘাত করতে।

শুনতে পাচ্ছিলাম ঝড়ের মত শোঁ শোঁ শব্দ। তারপর অদ্ভুত কিছু অজানা শব্দ...বুঝলাম এই শব্দগুলো হল আর্তনাদ। ক্রমশ শব্দ বাড়লো। কাঁটা এগিয়ে যাচ্ছিল। এবার কুড়ুল ফেলে গাছের ক্ষতস্থানটা দেখলাম। দেখলাম তরল এক বস্তু বেরিয়ে আসছে গাছের গা দিয়ে। ও কি গাছের রক্ত? পকেট থেকে নিজের রুমালটা বার করে গাছের ওই ক্ষতস্থানে চেপে ধরে বললাম—ভাইরে আমি খুব দুঃখিত। কিন্তু এছাড়া আমার কোন উপায় ছিল না। পরীক্ষায় সাফল্য লাভের জন্য আমাকে এই কাজ করতে হয়েছে। না-না এই ভাবে বসে থাকলে তো আমার চলবে না। কিছু একটা ব্যবস্থা আমাকে করতেই হবে। হতভাগা ডাক্তারটা আজ এখনও আসেনি। ওকে একবার ফোন করা দরকার।

বাড়ি এলাম। ফোন করলাম ডাক্তার স্কটকে। আপনি তাড়াতাড়ি একবার চলে আসুন।

—কোথায়?

—বাগানে। গ্রীনহাউসে আমি অপেক্ষা করছি।

—তোমার শরীর ভাল আছে তো?

—হ্যাঁ-হ্যাঁ এলেই সব বুঝতে পারবেন।

আমি আবার বাড়ি থেকে একরকম প্রায় দৌড়ে এসে পৌঁছালাম গ্রীনহাউসের কাছে। তারপর সুপারসনিক মাইক্রোফোনের সামনে বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম ডাক্তার স্কটের জন্য।

প্রায় আধঘন্টা।

আমি ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছিলাম।

একসময় দেখতে পেলাম ডাক্তার স্কট আসছেন। হাতে সেই পরিচিত ব্যাগ। আজ কিন্তু তিনি আমার দিকে তাকিয়ে আদৌ হাসলেন না।

হাসলাম আমি।

বললাম আসুন ডাক্তার!

—কি ব্যাপার!

—ব্যাপারটা আপনি নিজের চোখে দেখবেন।

এবার ইয়ারফোনটা এগিয়ে দিলাম ডাক্তারের দিকে।

ডাক্তার ইতস্তত করলেন। বললেন—এটা দিয়ে আমি কি করবো।

—কানে লাগান।

ডাক্তার অবাক হলেও প্রতিবাদ করলেন না। হাতের ব্যাগ মাটিতে নামিয়ে রেখে ইয়ারফোন কানে লাগালেন।

এবার আমি কুড়ুলটা হাতে নিলাম।

তিনি কুড়ুল হাতে নিয়ে আমাকে এগিয়ে আসতে দেখে অবাক হয়ে বললেন—ওটা দিয়ে কি হবে?

—কাজ আছে। এবার আমি উত্তর না দিয়ে কালো বাক্সটাকে দেবদারু গাছের নিচে নিয়ে গেলাম।

তারপর বললাম—আপনি সজাগ থাকুন ডাক্তার। কেবল লক্ষ্য করবেন কিছু শুনতে পান কিনা। এবার আমি কানেকসান দিয়ে কুড়ুল চালালাম। বারকয়েক কুড়ুল চালাবার পর গাছটার থেকে একটা ডাল মাটিতে ভেঙে পড়লো। আমি কোনরকমে পাশে সরে গেলাম।

ডাক্তার ভয় পেয়ে আমার নাম ধরে ডাকলেন।

আমি বললাম—কিছু শুনতে পেলেন?

—উঁহু ঠিক খেয়াল করিনি।

—সেকি কোন প্রাণীর আকুল আর্তনাদ শোনেননি?

—বারে শুনবো কি করে, যে ভাবে গাছের ডালটা ভেঙে পড়লো। হয়ত ডালটা ভেঙে না পড়লে কিছু শুনতে পেতাম।

ভীষণ রাগ হল আমার। বললাম, থাক খুব হয়েছে। আপনাকে শুনতে হবে না। দিন আমাকে ইয়ারফোনটা। একরকম প্রায় ডাক্তারের হাত থেকে ইয়ারফোনটা কেড়ে নিয়ে কানে লাগালাম। তারপর ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে বললাম—এইতো শোনা যাচ্ছে, শোঁ শোঁ একটা শব্দ—আহত প্রাণীর বুকচাপা কান্না।

তারপর দৌড়ে গিয়ে ডাক্তারকে বললাম—ডাক্তার শীঘ্রি আমাকে কিছুটা ব্যাণ্ডেজ দিন। অনেকটা ক্ষত হয়েছে।

—কিসের?

—গাছটার। আহা ভীষণ কষ্ট হচ্ছে ওর।

ডাক্তার এবার হেসে ফেললেন।

—হাসছেন কেন?

—তোমার ঠাট্টার বহর দেখে। সত্যি তুমি বটে ঠাট্টা করতে পারো।

—ঠাট্টা নয় ডাক্তার।

ডাক্তার হাসছিল।

আমার রাগ বাড়ছিল।

আমাকে লক্ষ্য করে ডাক্তার স্কট বললেন, তুমি একটু ঠাণ্ডা হও। তোমার হাই-প্রেসার। যে কোন সময় মাথার শিরা উত্তেজনায় ছিঁড়ে যেতে পারে।

—আমার জন্য ভাবতে হবে না আপনাকে যা বললাম তাই করুন, ব্যাণ্ডেজ দিন।

—আমার কাছে ব্যাণ্ডেজ নেই।

—আয়োডিন। ওটা তো আপনার ব্যাগে থাকে।

ডাক্তার স্কট বললেন, না সত্যি তোমার ইয়ার্কিটা আমার ভাল লাগছে না। ভেবেছিলাম তুমি সুস্থ হতে পারবে। এখন দেখছি আমার ধারণা ভুল। তোমার বাবা ঠিক এই ভাবে পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। তোমারও দেখছি ওই এক অবস্থা। ডাক্তার ব্যাগটা তুলে নিয়ে চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়ালেন। আমার যে কি হল।

কুড়ুলটা তুলে নিয়ে চিৎকার করে বললাম—তবে রে ডাক্তার আমি পাগল। আমার বাবাকে পাগল সাজিয়েছিলে বলে ভেবেছ আমাকেও পাগল সাজাবে। দিলাম সরাসরি পিছন থেকে কুড়ুলের ফলাটা ডাক্তারের পিঠে গেঁথে। ডাক্তার আর্তনাদ করে হুমড়ি খেয়ে পড়লো মাটিতে।

আমি কানে ইয়ারফোন লাগিয়ে শুনতে লাগলাম বিচিত্র আর্তনাদ। শব্দটা ধীরে

ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে। তারপর শোনা গেল একটা ছলছলানি...হাপরের মত হুস হুস শব্দ।

আমি অবাক হলাম। চোখের ওপর হঠাৎ ডাক্তারের রক্তাক্ত দেহ দেখে চিৎকার করে উঠলাম। শুনতে পেলাম শব্দটা। চিৎকারটা ঠিক ওই গাছটার মত বলে মনে হচ্ছিল। যখন আমি গাছটার গায়ে কুড়ুল বসিয়েছিলাম গাছটা ঠিক এইভাবে চিৎকার করে উঠেছিল। আমি বললাম—কি ডাক্তার বুঝেছেন তো আমার পরীক্ষা কতটা সফল হয়েছে। আপনি না আমাকে পাগল বলছিলেন। দেখলেন তো আমি পাগল নই। পাগল হলে কি আমি পরীক্ষায় সফল হতাম।

ডাক্তার স্কট নীরব।

আমার তখন কি আনন্দ। আনন্দে হাসছি। নাচছি। আর সেই ভয়ঙ্কর উত্তেজনার মধ্যে মনে হল আমার চোখ দুটো যেন বেরিয়ে আসতে চাইছে। গলার শিরা ফুলে উঠেছে।

উফ্ কি যন্ত্রণা! যন্ত্রণায় মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছে। ইয়ারফোনে টং করে শব্দ হল। মনে হল যেন ঠিক একটা তার ছেঁড়ার শব্দ। পরক্ষণে শুনতে পেলাম বাধ ভাঙা ঢেউ-এর মত উত্তাল কল্লোল। আমি ওই শব্দের মধ্যে ডুবতে শুরু করলাম। কিন্তু আমার মাথায় যে ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে। এ যন্ত্রণা যে অসহ্য।

মনে হল ডাক্তার বলেছিলেন, বেশি উত্তেজিত হয়ো না। তোমার প্রেসার আছে, যে কোন সময়ে মাথার শিরা ছিঁড়ে যাবে। তবে কি সত্যি তাই হল—শিরা ছিঁড়ে গেছে। মাথার মধ্যে রক্তপ্রবাহ ছুটছে। আমি কি আমার মৃত্যুবাজনা শুনতে পাচ্ছি ইয়ারফোনে!

—না, না, কিছুতেই না। ওই শব্দ আমি আর শুনতে চাই না। কোনরকমে ইয়ারফোনটা কান থেকে খুলে ফেললাম। কুড়ুলটা দু'হাতে চেপে ধরে কোনরকমে টলতে টলতে এগিয়ে গেলাম আমার নিজের তৈরি সুপারসনিক মাইক্রোফোনের দিকে। কালো বাক্সটা অসহ্য। আমার মাথার মধ্যে যন্ত্রণা বাড়ছে। চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে। শুনতে পাচ্ছি—ডাক্তার যেন বলছেন, তুমিও দেখছি তোমার বাবার মত পাগল হয়েছ।

দ্য লঙ্ ক্রাই ফর হেল্প

হিউ পেন্টি কোস্ট

নিউইর্য়কের গ্রাণ্ট স্টেশনের পাশেই একটা সুদৃশ্য আকাশচুম্বি বিশাল অট্টালিকা আছে—যার সর্বোচ্চ তলে আছে মিস্টার জুলিয়েন কোয়েস্টর ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান। বিশাল বড় ওই বাড়িটার দিকে তাকালে মনে হয় যেন বাড়িটা আকাশের সঙ্গে একাকার হয়ে মিশে গেছে।

আপনি যদি যেতে চান মিস্টার জুলিয়েন কোয়েস্টের প্রতিষ্ঠানে তাহলে লিফটে উঠে বোতাম টিপুন—টপ ফ্লোর।

ব্যস—একেবারে সর্বোচ্চ তলায় আপনি উঠে এলেন। মানে একেবারে আকাশের কাছে।

সামনেই কাঁচ ঘেরা একটা সুন্দর দরজা। ওটা ঠেলে ভিতরে প্রবেশ করলে ক্রমেই চমক লাগবে দু'ধারের সুপরিকল্পিত সুন্দর সুন্দর রুচিমার্জিত কারুকার্যগুলো দেখে। কি অসাধারণ শৈল্পিক ছাপ ফুটে আছে ঘরটায়। গোটা ঘরের দেয়ালগুলো ধূসর রঙে ঢাকা, সেই সঙ্গে মেশানো আলোর রঙ। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে চারদিক দেখতে দেখতে চোখ আটকে যাবে গোছানো আসবাবপত্রের দিকে। প্রতিটি আসবাবের মধ্যে আধুনিকতার ছাপ—শহরে যা এখনো ভালভাবে কারো নজরে পড়েনি, তা খুঁজে পাওয়া যাবে কোয়েস্টের অপিস ঘরে ঢুকে। কাজেই এর পরিবেশ এত সুন্দর আর এমন চমৎকার সাজানো গোছানো যে দেখলে চোখ ফেরানো যায় না। মনে হবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকলেও চোখের কোন ক্ষতি হবে না বরং চোখ জোড়া বাইরের আলোর থেকে অনেক বেশি আরাম বোধ করবে এবং মনটাকেও সজীব রাখবে।

কিন্তু মানুষের স্বভাব বড় বিচিত্র—বেশিক্ষণ কোনকিছুই একঘেঁয়ে ভাল লাগে না হয়ত সেই কারণেই দুচার মিনিট সৌন্দর্যের ঝিলিক কাটলে ছবিটা সোজা এসে ধাক্কা খাবে রিসেপসনিস্ট এর টেবিলে।

দেখা যাবে ভারি সুশ্রী দেখতে একজন মহিলা মুচকি হাসছেন। ওর নাম মিস গ্লোরিয়া চার্ড। এই গ্লোরিয়া চার্ডকে একবার দেখলে বার বার দেখতে ইচ্ছে করবে। কি সুন্দর আর মিষ্টি চেহারার মহিলা। শরীরের সঙ্গে মানানসই পোশাক। বেশির ভাগ সময় তিনি অবশ্য কালো পোশাক বেশি পড়েন। মহিলা

অর্থাৎ গ্লোরিয়া চার্ড বসে থাকেন ঘরের ঠিক মাঝখানে। তার সামনে অর্ধগোলাকার আর অতি আধুনিক ডিজাইনের তৈরি ছোট একটা টেবিল। টেবিলের ওপর মানানসই তিন চার ধরনের নানা রঙের টেলিফোন। ওর হাত যখন কোন টেলিফোনের রিসিভার ছোঁয়, তখনই ওর মাথার পাশ থেকে কিছুটা চুল কপালের একপাশে একভাবে এসে পড়ে মনে হয় যেন একটা ফুল কেউ গুঁজে দিয়েছে।

তার আকর্ষণীয় চেহারার জন্য তাকে একবার দেখলে বার বার দেখতে ইচ্ছে করে সে কথা তো আগেই বলেছি। আবার বলছি, ওকে দেখার পর মনে হয় না এই বিশাল শহরে আর কোন দ্বিতীয় মহিলা আছেন যাঁর দিকে তাকানো যায়। তাঁর মুখমণ্ডলের অনিন্দ্যসুন্দর লালিত্যের সঙ্গে মিশে আছে সুষমামিশ্রিত মধুর হাসি—সব মিলিয়ে মহিলা যেন যে কোন বয়সের যে কোন পুরুষকে কাছে টেনে আনতে পারেন। প্রায়শই দেখা যায় তার কাছে ডাকপিওন ভুল চিঠি আনছে, ছেলে ছোকরারা ভুল নামে কাউকে খোঁজ করতে আসছে। মহিলা কিন্তু সব বুঝতে পারেন, তবু তার মুখে কোন বিরক্তির রেখা ফোটে না। প্রত্যেকের প্রতি সেই একই ধরনের স্মিত হাসি তিনি ছড়িয়ে দিচ্ছেন।

কিন্তু এত সুন্দর মহিলার জীবনটা বড় নিঃসঙ্গ। তার নিঃসঙ্গ জীবনের ছাপ তার পোশাকের মধ্যে ফুটে ওঠে। সুন্দর চেহারায় সাজগোজ বড় একটা করেন না—সাদামাটা ঠিক বিধবার মত। বেশ বোঝা যায় তিনি সাজতে চান না বলেই তাঁকে আরো বেশি সুন্দর লাগে দেখতে, আর সেই কারণেই এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে তার জীবনটা আর দশজনের চাইতে অনেক আলাদা।

থাক—মিস গ্লোরিয়া চার্ডের কথা। এবার আসা যাক কোম্পানির আসল মালিক জুলিয়েন কোয়েস্টের কথায়। লম্বা ছিপছিপে চেহারার মানুষ হলেন জুলিয়েন কোয়েস্ট। কাঁধ যথেষ্ট চওড়া। চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত প্রতিটি রেখায় ফুটে উঠেছে গ্রীকদেশীয় প্রভাব।

পাবলিক রিলেসানের কাজে কোয়েস্ট কোম্পানির নাম আজ শহরের সকলের মুখে মুখে। বলা যায় জনসংযোগের ব্যাপারে ভদ্রলোক যেন এক নতুন মানসমূর্তি তৈরি করে ফেলেছেন সকলের মনের মধ্যে। একবার একজন বিখ্যাত লোক তো তাঁর প্রশংসায় অভিভূত হয়ে লিখলেন—কোয়েস্ট একজন সফল ধনী ব্যক্তি। তার প্রতিষ্ঠানের মূলধন তাঁর উপার্জনের হয়ত অর্ধেক নয়, যতটা তাঁর সফল ব্যক্তিত্ব। আমেরিকার প্রায় প্রতিটি সুন্দরী মহিলা চায় কোয়েস্টের সঙ্গ, তাঁর বন্ধুত্ব, তাঁকে পাওয়ার জন্য হয়ত কোন মহিলা তাঁর জীবনকেও বাজি ধরতে পারেন কিন্তু ভদ্রলোক সকলের ধরাছোঁয়ার বাইরে। তবে তাঁর এই ব্যবসাকে কেন্দ্র করে যে একজন সুন্দরী তাঁকে সারাক্ষণ আগলে রাখেন—তিনিই হচ্ছেন তাঁর ব্যবসায়ী

জীবনের মূল সৌভাগ্য। মনে হয় ব্যক্তিগত জীবনেও কোয়েস্ট এই সুন্দরীর পাশে সফল হতে পারবেন ঠিক ব্যবসায়ী হিসাবে যতটা সফল হয়েছেন।'

কি ভাবছেন কে এই সুন্দরী, কে এই ছায়াসঙ্গিনী? গ্নোরিয়া চার্ড? কি তাইতো? আজ্ঞে না!

তিনি গ্নোরিয়া চার্ড নয়—কোয়েস্টের সৌভাগ্য হিসাবে বাজারে যাঁকে নিয়ে এত আলোচনা চলে, যাঁর কথা সেই বিখ্যাত লোকটি লিখেছিলেন—তিনি হলেন লিসিয়া মর্টন।

গায়ের রঙটা ঈষৎ কালো, একটু দুলালী গোছের। মনে হয় মহিলা জীবনে আরও বেশি সফল হতে পারতেন যদি না তিনি কোয়েস্টের ব্যবসার সঙ্গে নিজেকে এতবেশি না জড়াতেন। বরং তাঁর উচিত ছিল পেশাদার মডেল হিসাবে আত্মনিয়োগ করা। এখন অবশ্য শহরের ছেলে বুড়ো সবাই জেনে গেছে কোয়েস্টের সঙ্গে তার কিসের সম্পর্ক। ভালবাসা, বন্ধুত্ব...কেউ কেউ বলেন যে তাঁদের সম্পর্ক নাকি স্বামী-স্ত্রীর চাইতেও আরো অনেক অনেক গভীর। মনে হয় বিয়ে করলে সম্পর্কটা এতটা গাঢ় হত না। আর এইসব কারণের জন্যই কোয়েস্টের উপর অধিকাংশ লোক ঈর্ষান্বিত।

সত্যি বলতে কি লিসিয়া মর্টনের চেহারার প্রশংসা না করে উপায় নেই। সাজ হীনতার মধ্যেও একটা জৌলুস যেন তাঁর মধ্যে উপছে পড়তে দেখা যায়। তাঁর শরীরের তীব্র আকর্ষণ যে কোন পুরুষকে তাঁর পায়ের নিচে নামিয়ে আনতে সক্ষম। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলি, লিসিয়ার এই আকর্ষণী ক্ষমতার মধ্যে মস্ত যে দিকটা আছে তা হল মমতা—ক্ষমাসুন্দর, মমতাময়ী, লাবণ্যময়ী লিসিয়াকে যেন দুরন্ত করে তুলেছে। জুলিয়েন কোয়েস্ট এসব কথা জানেন—আর জানেন বলেই তিনি লিসিয়াকে সবসময় তাঁর ছায়া দিয়ে আড়াল করে রাখেন।

সেদিনের সকালটা ছিল—''লণ্ড ক্রাই হেল্প্'' অনুষ্ঠানের শুরু হওয়ার দিন। মিস্টার কোয়েস্ট তাঁর অফিসের গোপন ঘরে প্রবেশ করলেন লিসিয়া আর ডন গারভেকে সঙ্গে নিয়ে। এই দুই সঙ্গী হল কোয়েস্টের প্রতিষ্ঠানের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান দুই সম্পদ।

মানুষ হিসাবে গাবভে কিন্তু সম্পূর্ণভাবে কোয়েস্টের বিপরীত। শরীরের ওজন অনায়াসে বলা যায় কোয়েস্টের তুলনায় কুড়ি থেকে পঁচিশ পাউণ্ড বেশি। চেহারার মধ্যে কোনরকম চমক নেই, নেই কোন বাহ্য আড়ম্বর, শৌখিনতার জৌলুস। এক কথায় বলা যায়, কোয়েস্টের মধ্যে যে আভিজাত্য দেখা যায়, তা গারভের মধ্যে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। চেহারায় এবং ব্যবহারে ভদ্রলোক খুব সাধাসিধে। আসলে উনি ছিলেন এক সময় বিখ্যাত অ্যাথলেট। বছর দশেক আগেও তাঁকে লোকে চিনতো একজন জনপ্রিয় ফুটবলার হিসাবে। হয়ত তিনি আরও কিছুদিন খেলাটা চালিয়ে

যেতে পারতেন, যদি না দুর্ভাগ্যবশত তাঁর হাঁটুতে আঘাত লাগতো। তবে এটাও ঠিক তাঁর অভিনয় ক্ষমতাও যা ছিল, তাতে তাঁর বন্ধু মহলের ধারণা তিনি যদি চেষ্টা করতেন তাহলে খেলা ছাড়ার পর অনায়াসে চলচ্চিত্রে অভিনয় করে জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারতেন।

মানুষ হিসাবে জন গারভে একজন নিপাট ভদ্রলোক। কম কথার মানুষ। মনে হয় তিনি সব সময় তাঁর মনের গোপন ড্রয়ারে তালা বন্ধ করে রাখেন। তাঁর ওই স্বভাবের মধ্যেই আছে তাঁর জীবনের বহু গোপনীয় তথ্য যার হদিশ পাওয়া আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোন কীটের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

এ হেন সেই স্বল্পভাষী গারভে প্রথম প্রশ্ন করলেন কোয়েস্টকে ; কি হে সব কাজ ঠিকঠাক করা হয়ে গেছে, নাকি কিছু বাকি রেখেছ?

—হ্যাঁ সব শেষ।

—আমার দিককার সব কাজও শেষ হয়ে গেছে। প্যাট আর তাঁর ছেলে ঠিক করেছেন জনসনের ফ্ল্যাটে থাকবেন। তাঁর ফ্ল্যাটটা প্যাটের খুব পছন্দ। তাছাড়া ওই ফ্ল্যাটে জ্যাকসনের ছেলে পলও আছে—ও সেখানে থাকবে। ওই প্যাটের ছেলের দিকে নজর রাখবে। ওরা তো দুজনে প্রায় একই বয়সি।

জন গারভে কথাটা শেষ করা মাত্র কোয়েস্ট প্রশ্ন করলেন—প্যাটের ছেলের যেন কি নাম? মনে হয় টম—তাই না?

—হ্যাঁ।

—ওর বিষয়ে কিছু বলো তো আমায়।

গারভের ঠোঁটের একটা পাশ মুহূর্তের মধ্য সংকুচিত হল। বললেন—কি বলি বলো তো ওর কথা। ও তোমাকে না দেখলে বোঝানো যাবে না। তারপর একটু থেমে বললেন—আমার যতদূর জানা আছে প্যাটের ছেলের বয়স এখন হবে উনিশ বছরের মত—আপাতদৃষ্টিতে দেখতে সুন্দর, বাচনভঙ্গিও ভালো। প্রথম দেখা হলেই তোমাকে প্রশ্ন করবে—তুমি কেমন আছো? আবার বিদায় নেবার সময় হেসে বলবে—গুড বাই। এই দুটো সম্ভাষণ ছাড়া মাঝখানে তাকে দিয়ে আর কোন কথা কেউ বলাতে পারে না। চুপ করে থাকে সবসময়। অদ্ভুত এক অস্বাভাবিক চাউনি তার সারা মুখে ছড়ানো। তাকে অন্য সময় কেউ কোন কথা বললে সে শুনতে পেয়েছে বলে আমার মনে হয় না। তবে এটা ঠিক জ্যাকসনের ফ্ল্যাটটা ওর খুব পছন্দ হয়েছে। মনের ভাব দেখে তো কিছু বোঝা যায়। এই ব্যাপারে প্যাটকে প্রশ্ন করা হলে, তিনি বলেন তাঁর ছেলে টম এমন ভাবে তার দিকে তাকিয়েছিল, আর হাসছিল যার অর্থ হল সে খুব খুশি হয়েছে। তার হাবভাব দেখে আমারও তাই মনে হয়েছিল। একেবারে যেন চারবছরের বাচ্চা শিশু বলেই তাকে মনে হয়। অথচ তার বয়স যা তাতে ওই ধরনের অভিব্যক্তি অত্যন্ত অস্বস্তিকর।

—কি মর্মান্তিক।

লিসিয়া সবিস্ময়ে বললে কথাটা।

গারভে তাকালেন তাঁর দিকে। তারপর বললেন, ভয় নেই, তোমাকে কায়দা করার জন্য এখুনি তাঁর কাছে ছুটে যেতে হবে না। আর তাছাড়া তাকে তুমি কিভাবেই বা সাহায্য করবে বলো?

—কেন ভালবাসা দিয়ে।

এবার কোয়েস্ট তাকালো লিসিয়ার দিকে। তারপর বললেন সহজভাবে—তাতে হয়ত টমের কোন পরিবর্তন হবে না, পরিবর্তন হবে প্যাটের মনের।

কোয়েস্টের মনের মধ্যে মুহূর্তের জন্যে পুরনো একটা ছায়া চলচ্চিত্রের মত সরে সরে যাচ্ছিল। এখনও তিনি ভুলতে পারছেন না প্যাট উইলিয়ামসের কথাগুলোকে। সেবছর প্রথম হলিউডে এসে ব্যবসার পত্তন করেছিলেন কোয়েস্ট। তাঁর হোটেলে এসে উঠেছিলেন প্যাট—তাঁর এই আগমনের ব্যাপারে কোন পূর্ব ঘোষণা ছিল না।

ব্যাপারটা খুবই আকস্মিক হওয়ায় মিস্টার কোয়েস্ট সেদিন খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। হাজার হোক প্যাট হলেন একজন নামী মানুষ। তাছাড়া তাঁর সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছিলেন মিস্টার কোয়েস্ট। তখন তিনি নতুন ব্যবসায়ী। ফলে সব মিলিয়ে সেই দিকটা ছিল কোয়েস্টের কাছে এক নতুন অভিজ্ঞতা। ভদ্রলোক যথেষ্ট শৌখিন বলে শুনেছিলেন। শুধু শৌখিনতার জন্য নয়, খ্যাতি ছিল তাঁর সুরেলা কণ্ঠের জন্য। পৃথিবীময় তখন তাঁর সুরেলা কণ্ঠের জয়জয়কার চলেছে। হাজার হাজার ডলার রেকর্ড বিক্রি হচ্ছে। এককথায় বলা যায় প্যাট উইলিয়ামস হচ্ছেন একজন নামকরা গাইয়ে।

যতদূর জানা যায়—প্যাট উইলিয়ামস জীবনে দুজনকে বিয়ে করেছিলেন। প্রত্যেকেই ছিলেন সুদর্শনা। অথচ আশ্চর্য শেষ পর্যন্ত এদের কারো সঙ্গেই প্যাটের জীবন দীর্ঘ সময়ের জন্য বাধা পড়েনি। পরিত্যক্ত প্রসাধনের মত তিনি সেই সমস্ত মহিলাদের ত্যাগ করে, বর্তমানে অন্য একজন মহিলাকে নিয়ে দিন কাটাচ্ছেন। শোনা যায় এই মহিলাটির সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল হোয়াইট হাউসের এক সভায়। মহিলা ছিলেন প্রেসিডেন্টের নির্বাচিত প্রণয়প্রার্থীদের একজন। কাজেই ব্যাপারটা জানাজানি হওয়ার পর প্রেসিডেন্ট প্যাটের ওপর অসন্তুষ্ট হন।

এই সমস্ত ঘটনা ঘটেছিল কোয়েস্টের হলিউড হোটেল খোলার মাসখানেক আগে। এই হোটেলে অবস্থান কালেই কোয়েস্ট শুনেছিলেন প্যাটের গ্রাম্যজীবনের এবং তাঁর প্রথমা স্ত্রীর কথা। তাঁর স্ত্রী লিনডারের সঙ্গে প্রায় বিশবছর হল তাঁর কোন সম্পর্ক নেই। বিবাহ বিচ্ছেদের সময় তাঁদের একটি সন্তান হয়। এই সন্তানকে তাঁরা তিন মাস বয়সে একজন রক্ষিতার হাতে তুলে দিয়ে, যে যাঁর মত আলাদা

হয়ে যান। প্যাট এরপর ভেসে চলেন জীবনসমুদ্রে এলোমেলো ভাবে, তবে তিনি ছেলের ভরণপোষণের জন্য ওই রক্ষিতাকে নিয়মিত অর্থ পাঠাতেন। তবে এটাও ঠিক ওই ছেলের বিষয়ে তিনি আর কিছু জানবার চেষ্টা কোনদিন করেননি। এমনকি তাঁর কোন ধারণাই ছিল না যে তাঁর সন্তানটি ঠিক কত বড় হয়েছে বা সে এখন কি করছে।

কোয়েস্টের মনে পড়ে সেই দিনটার কথা। তাঁর সামনে বসে বিচলিত প্যাট তাঁর হাত ধরে বললেন—জুলিয়েন তুমি বিশ্বাস করবে, কয়েক মাস আগে একদল ছেলে আমায় ফোন করেছিল। তারা আমায় সরাসরি প্রশ্ন করলো—আমি আমার ছেলের জন্য কি করেছি? তার জন্য আমার কিছু করার পরিকল্পনা আছে কি না?

বিশ্বাস করো—সত্যি বলতে কি আমি আমার ছেলের কথা তখন প্রায় ভুলতে বসেছিলাম। যার কথা আমার স্মরণে নেই, আমি তার জন্য কি পরিকল্পনা করবো? তাছাড়া মনে মনে হিসাব করলাম তার বয়স কত হতে পারে—তারপর নিজেকে সহজ স্বাভাবিক করে নিয়ে জবাব দিলাম—শোনো, আমার হিসাবে তার বয়স এখন কুড়ি বছর। এই বয়সের একটা ছেলের জন্য তার বাপের আর কিছু করা সম্ভব নয়। বরং উচিত এখন তার নিজের পথে চলা। যদি অর্থের দরকার হয় তো আমি দিতে পারি। তারপর একটু থেমে কোয়েস্টের দিকে তাকিয়ে বললেন—আমি বালকদের সেইকথা বলা মাত্র, উত্তরে তারা আমায় কি বললে জানো। ছেলে আপনার চার-পাঁচ বছরের বালক ছাড়া কিছুই নয়।

কথাটা শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে যাই। মনে হল বাবা হিসাবে তাহলে তো আমার কিছু কর্তব্য আছে। এরপর আমি তার খোঁজ করি। তাকে দেখার পর প্রথমটায় আমার মনে হয়েছিল কেউ আমাকে ঠকাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু সে আমার দিকে এমনভাবে তাকিয়েছিল যে আমি কিছুতেই তাকে উপেক্ষা করতে পারলাম না। মনে হল সন্তান হয়ত রক্তের সম্বন্ধ নিয়ে আমাকে ঠিক চিনেছে।

ওর মা লিনডা কাছে থাকলে সে তার সন্তানকে ঠিক চিনতে পারতো। নিশ্চয়ই সে তার সন্তানের প্রতি যত্নবান হত। কিন্তু আমি পিতা—কি করে আমি তাকে ফেলে আসি—ওই করুণ চাউনি আমাকে বেঁধে ফেললো। আমি পারলাম না তাকে এড়িয়ে চলে আসতে। ওকে আমি আমার সঙ্গে নিয়ে চলে আসি। এখন সে আমার কাছেই আছে। চেষ্টা করছি তাকে প্রাণপণ সঙ্গ দিতে।

সেই প্যাট উইনিয়ামস এখন নিজেকে অনেকটা সামলে নিয়েছেন। এখানে আসার পর কোয়েস্ট প্যাটের কাছ থেকে ফোন পান। ফোনে তাঁকে প্যাট বলেছেন, চব্বিশ ঘণ্টা ব্যাপী একটা গানের আসর পরিচালনা করতে। এই আসরে ঘড়ির প্রতিটি সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গান গাইবেন প্যাট—মনে হয় এই অনুষ্ঠানে

অনেক অর্থ উঠবে। সেই অর্থ দিয়ে তিনি জুলিয়েনকে অনুরোধ করেছেন অনাথ শিশুদের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্য একটা প্রকল্প গড়ে তুলতে।

টেলিফোনে বারবার অনুরোধ করেছেন প্যাট—অর্থের জন্য ভাবতে হবে না। অর্থ যদি বেশি লাগে আমি দেব—শুধু অনুষ্ঠানটা যেন সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়। আমার ধারণা কোয়েস্ট এই কাজ তুমি ছাড়া আর কেউ করতে পারবে না।

জুলিয়েন কোয়েস্ট রাজি হয়েছেন।

আজ সেই অনুষ্ঠানের দিন। স্বভাবত কারণে সবাই উত্তেজিত। তবু বিচক্ষণ কোয়েস্ট নিজের মেজাজকে শান্ত রাখার চেষ্টা করলেন। শুক্রবার মাঝরাত থেকে শনিবারের মাঝরাত পর্যন্ত এই অনুষ্ঠান চলবে।

এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বিজ্ঞাপন দিতে কুণ্ঠিত হননি কোয়েস্ট। সর্বত্র বিজ্ঞাপনে ছেয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে টিকিটও বিক্রি হয়েছে প্রচুর। এত কিছুর মধ্যে কেবল একটা জিনিসকে গোপন রাখা হয়েছে তা হল মিস্টার প্যাট উইলিয়ামস ও তার ছেলে টম কোথায় আছে। তিনি যে তিনদিন নিউইর্য়কে কোথায় থাকবেন—সেই ব্যাপারটা কাউকে বলা হয়নি, কেবল মাত্র প্যাটের নিরাপত্তার কথা ভেবে। তাছাড়া প্যাট নিজেও চান না তাঁর ছেলের কথা অথবা তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা কেউ জানুক।

প্রথমে ঠিক ছিল টমকে নিয়ে গানের আসরে যাবেন প্যাট। কিন্তু পরে তিনি মত বদল করেন। কারণ এতে প্যাটের ধারণা তাঁর ছেলেকে সবাই চেনে—হয়ত তাতে প্যাটের সুনামের ক্ষতি হবে এবং তাঁর ছেলে টমেরও ক্ষতি হবে।

কাজেই সিদ্ধান্ত বদল করা হয়েছে। এই ভার ছিল কোয়েস্টের উপর। কোয়েস্ট তারপর সেই দায়িত্ব দিয়েছেন তাঁরই বিশ্বস্ত সঙ্গী গারভেকে। কারণ গোপন যোগাযোগ রক্ষার ব্যাপারে জন গারভের কোন জুড়ি নেই। তার বাজারে স্পোর্টসম্যান হিসাবে বিস্তর খ্যাতি। অনেকের সঙ্গে চেনা-জানা। সেই ঠিক করেছে জ্যাকসনের ফ্ল্যাট। জ্যাকসনের সঙ্গে জনের বহুদিনের বন্ধুত্ব। জ্যাকসনের ফ্ল্যাটটাও খুব নিরিবিলি জায়গায়। সেন্ট্রাল পার্ক—ওয়েস্ট। একবারে রাস্তার উপরে। বাড়িতে লোক বলতে সে আর তার ছেলে পল, সে একেবারে টমের বয়সি। কাজেই এইরকম একটা নির্জন ফ্ল্যাটে টমকে নিয়ে থাকতে প্যাটের কোন আপত্তি হয়নি। পলও আছে।

টম ও পল বয়স ওদের দুজনের কাছাকাছি হলেও চরিত্র সম্পূর্ণ আলাদা। তবুও ওদের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়েছে। ঘনিষ্ঠতা হয়েছে।

গানের আসর মাঝরাতে শুরু। অতএব সন্ধ্যে পার হওয়ার পরেই কোয়েস্ট এসে হাজির হলেন প্যাটের সঙ্গে দেখা করতে। সঙ্গে আছেন গারভে আর লিসিয়া। এই প্রথম লিসিয়া টমকে দেখলো। পল ও টম কাছাকাছি ছিল। লিসিয়া হাতছানি

দিয়ে কাছাকাছি ডাকলো টমকে, টম তার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়েছিল। নিজের পাশে বসিয়ে, লিসিয়া তাকে সস্নেহে জানলার দিকে তাকিয়ে বললে—জায়গাটা তোমার কেমন লাগছে টম।

—খুব ভাল। আমার সবচেয়ে ভাল লাগছে ওই পার্ক আর পার্কের ফুলগুলো।

লিসিয়া তার পিঠে হাত বুলিয়ে বললে—আগামীকাল তোমার বাবা গানের অনুষ্ঠানে বেরিয়ে গেলে আমি তোমার জন্য ওই পার্কে অপেক্ষা করবো। তুমি যাবে তো—

—যাবো।

—মনে থাকবে?

—থাকবে।

কথা যখন হচ্ছিল, তখন শুধু ঘরের মধ্যে টম একা ছিল না। পল জ্যাকসনও ছিল। তবে সে একবারের জন্য লক্ষ্য করছিল না তাদের।

খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে প্যাট উইলিয়ামস লক্ষ্য করছিলেন লিসিয়াকে। প্যাটের ছেলের সঙ্গে লিসিয়ার সান্নিধ্য একসময় কোয়েস্টের নজরে পড়লো। তারপর সিগারে অগ্নি সংযোগ করতে করতে কোয়েস্ট বললেন, কি ভাবছেন মিস্টার প্যাট?

প্যাট হেসে বললেন, ভাবছি না, দেখছি তোমার পরম পছন্দের রমণীটিকে নিয়ে আমার ছেলে কেমন মশগুল হয়ে আছে।

কোয়েস্ট জবাবে বললেন, কি আর করি বলুন, আমি তো সারাটা জীবন প্রতিদ্বন্দ্বীতার মধ্যে এগুলাম। ভাবছি শেষে না ওই উনিশ বছরের ছেলেটির সঙ্গে আমাকে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করতে হয়।

প্যাট উইলিয়ামস হো-হো করে হেসে বললেন—কথাটা একবারে অযৌক্তিক নয়। ওই উনিশ বছর বয়সটা বড় সাংঘাতিক। ওই বয়সে আমি তো আমার বাবার প্রেমিকার সঙ্গে প্রেম করে বাবার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বীতায় নেমেছিলাম।

—বলেন কি, তাতে কি সফল হয়েছিলেন?

—আলবাৎ। তারপর মুহূর্তের মধ্যে তাঁর মুখটা ঘন মেঘের মত জমাট বেঁধে কালো হয়ে গেল। একটু সময় নিয়ে বললেন—দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই ছিল আমার প্রথমা স্ত্রী টমের মা।

কোয়েস্ট তাকালেন।

তারপর দ্রুত প্রসঙ্গ বদলে নিয়ে প্রখর বুদ্ধিদীপ্ত ব্যবসায়ী কোয়েস্ট স্বাভাবিক মেজাজে বললেন—চলুন মিস্টার প্যাট, আর কথা বাড়িয়ে সময় নষ্ট করা উচিত হবে না। সময় হাতে নিয়েই আমাদের কাজের জায়গায় পৌঁছনো ভাল।

বাইরে চলে আসার সময় প্যাট তাকালেন পলের দিকে। দু'চোখে তার অনুরোধের দৃষ্টি। পল বললে—আপনি কোনরকম চিন্তা করবেন না, আমি বাড়িতেই আছি। সারাক্ষণ ওকে নিয়ে আগলে রাখবো আর টিভিতে আপনার গানের অনুষ্ঠান শুনবো।

—ভাল ছেলে।

—টম টমি, আমি যাচ্ছি বাবা, আসার সময় তোমার জন্য একটা চমৎকার জিনিস আনব।

টম হাসলো।

পল বাউ করলো।

প্যাট হাসি মুখে বিদায় নিলেন।

অনুষ্ঠানের সূচনা ভালই হল। চমৎকার সুবেলা কণ্ঠে দর্শকদের মন মাতালেন প্যাট উইলিয়ামস। অনেকে আবার তাকে মোটা মোটা সুরে একেকটা আলাদা গানের জন্য অনুরোধ করতে লাগালো। প্যাট দর্শকদের প্রত্যাশা পূরণ করে চললেন। চমৎকার ব্যবস্থা।

প্যাটকে অনুষ্ঠানে পাঠিয়ে দেবার পর লিসিয়া আর কোয়েস্ট এসে বসলেন থিয়েটার হলের রেস্তরাঁয়। সারাটা দিন দারুণ ধকল গিয়েছে। জনসংযোগের কাজ করা মুখের কথা নয়। সব কিছু একেবারে ঘড়ি ধরে। জন গারভে টেলিফোনের পাশে বসে। ঘন ঘন ফোন আসছে, নানান জায়গা থেকে। সেই কারণে একজনকে সারাক্ষণ টেলিফোন পাহারা দেওয়ার জন্য দরকার মনে করেই কোয়েস্ট জন গারভেকে টেলিফোনের কাছে বসিয়েছেন।

প্রথম ঘণ্টা অনুষ্ঠান পার করার পর প্যাট অল্প সময়ের জন্য মঞ্চ ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন। তারপর প্রচণ্ড খুশি গলায় বললেন—দারুণ ব্যবস্থা করেছেন মিস্টার কোয়েস্ট, এত ভাল ম্যানেজমেণ্ট আমি আশা করতে পারিনি। গোটা ব্যাপারটা যেন সুইস ঘড়ির মত চলছে।

সেই রাতটা নির্বিঘ্নে কাটলো।

পরের দিন শনিবার।

লিসিয়া আর কোয়েস্ট তখন রেস্তরাঁয় বসে কফিতে চুমুক দিচ্ছিল। এমন সময় ফোন এলো। অপ্রসন্ন চিত্তে ফোনটা হাতে তুলে নিলেন কোয়েস্ট।

—হ্যালো কে কথা বলছেন।

—হ্যালো, আমি জন গারভে বলছি। এখুনি একবার চলে এসো।

—কেন এত জরুরী তলব। প্যাট কি মঞ্চে ফিরে যাননি—তিনি কি মদ খেতে বসে গেছেন?

—আরে না না ও সব কিছু নয়—ব্যাপারটা খুব জরুরী, তোমার এক্ষুনি আসাটা দরকার।

—এক্ষুনি?

—হ্যাঁ। মনে হচ্ছে ঘটনাটা "কিডন্যাপ"—

—কি বললে "কিডন্যাপ"?

—হ্যাঁ তবে মনে হয় কেউ রসিকতা করেছে। যাই হোক আমার একার পক্ষে এ ক্ষেত্রে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয়, তাই আসতে বলছি।

টেলিফোন নামিয়ে রেখে লিসিয়াকে সঙ্গে নিয়ে দ্রুত পায়ে মিস্টার কোয়েস্ট এসে প্রবেশ করলেন টেলিফোন ঘরে।

—কি ব্যাপার গারভে?

—কিডন্যাপ। মানে জ্যাকসনের ফ্ল্যাট থেকে টম উধাও। ওকে পাওয়া যাচ্ছে না। খানিক আগে প্যাটের নামে আসা অসংখ্য টেলিফোনের মধ্যে এটাও হল একটা। আমি জ্যাকসনের বাড়িতে ফোন করেছিলাম। টেলিফোনটা বেজে যাচ্ছে কিন্তু কেউ ধরছে না। মনে হয় বাড়িতে তাহলে কেউ নেই।

—কি বলছো তুমি? মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়লো মিস্টার কোয়েস্টের।

—ঠিকই বলছি। তবে যতদূর খবর পেয়েছি ছেলেটা ভালই আছে। তবে প্যাট তোমার সাহায্য চান। তিনি একবারে ভেঙে পড়েছেন।

—এটা তো স্বাভাবিক।

প্যাটের নামে যে অনর্গল টেলিফোন আসবে এই ধারণা নিয়েই মিঃ জন গারভেকে টেলিফোনের সামনে সারাক্ষণ বসিয়ে রেখেছিলেন মিস্টার কোয়েস্ট। টেলিফোনের সঙ্গে চালু করা ছিল টেপ, যাতে টেলিফোনে নাম ও ঠিকানা জেনে রাখতে কোনরকম ভুল না হয়।

জন গারভে কোন রকম ভনিতা না করে টেপটা চালু করলেন। বললেন—মন দিয়ে শোনো, আমার মনে হয় টেপটা শুনলেই তুমি আসল ঘটনাটা আঁচ করতে পারবে।

জন গারভে টেপটা চালু করলেন।

শুরু হল কথোপকথন।

—হ্যালো কে কথা বলছেন, মিঃ উইলিয়ামস প্যাট কি?

—হ্যাঁ।

—শুনুন মিস্টার উইলিয়ামস, আমার কথাগুলো শোনা আপনার পক্ষে খুবই জরুরী। আশা করি মন দিয়ে শুনবেন—আপনার ছেলে আমাদের কাছে আছে, যদি তাকে আপনার দেখতে ইচ্ছে হয় তাহলে আমার নির্দেশ মত কাজ করুন। প্যাটের কণ্ঠস্বর। যথেষ্ট উত্তেজিত।

—মানে কি বলতে চাও?

—খুব সোজা। মানে আপনার ছেলেকে আমরা নিয়ে এসেছি। আমরা তাকে মুক্তি দিতে পারি আড়াই হাজার ডলারের বিনিময়ে। সময় দিলাম মাত্র এক ঘন্টা—এখন দশটা বাজে—অর্থাৎ এগারোটার মধ্যে আশা করি ডলারটা পাঠিয়ে দেবেন। পুলিশকে খবর দেবার চেষ্টা করলে বিপদটা আপনার ছেলের হবে। কাজেই ছেলের ভালমন্দ বিচার করে যা ব্যবস্থা গ্রহণ করার করবেন। আপনি শুধু ডলারের ব্যবস্থা করুন।

—আমি ডলার না হয় দেব, কিন্তু আমার ছেলে যে সুস্থই আছে আমি তা জানবো কি করে?

প্যাট জানতে চাইলেন, ওপাশ থেকে উত্তর এলো—কেন তাহলে আপনার ছেলে আপনাকে বলুন সে কেমন আছে। এরপরেই শোনা গেল অদ্ভুত একটা ফ্যাসফ্যাসে কণ্ঠস্বর—"আমাকে ওরা একদম মারেনি, বকেনি ড্যাড, আমি খুব ভাল আছি। দয়া করে শুধু ওরা যা চায় সেটা পাঠিয়ে দাও। আমি ভাল আছি। আমার জন্যে ভেবো না।

টেপটা বন্ধ করে জন গ্রেভার বললেন—কি শুনলে তো ব্যাপারটা নিজের কানে?

হ্যাঁ শুনলাম।

গ্রেভার গম্ভীর ভাবে বললেন—বেচারা বড় আপসেট হয়ে পড়েছে। যাক ইতিমধ্যে আমাদের একঘন্টার মধ্যে অনেকটা সময় পার হয়ে গেছে। কিছু তো একটা করতে হবে?

—কি করবো ডলারটা ব্যাঙ্ক থেকে তুলে আনবো।

ঠিক সেই মুহূর্তে ঝড়ের বেগে ওই ঘরে ঢুকলেন প্যাট উইলিয়ামস। উৎকণ্ঠিত মুখচোখ। তাকালেন কোয়েস্টের দিকে। বললেন শুনেছেন তো সব কথা?

—শুনেছি।

—কি করবো আমি?

—ভাবছি।

—আমি কিন্তু ঘটনাটাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছি না। প্যাট বিহ্বলভাবে বললেন।

—কেন?

—আমার ছেলে আমাকে কোনদিন ড্যাড বলেনি। বিশ্বাস করুন জুলিয়েন, ও ছাড়া এই সংসারে আমার আর কেউ নেই। হায় ভগবান আমি জানি না এখন সে কি অবস্থায়, কি ভাবে আছে।

—আচ্ছা মিস্টার প্যাট, আপনার ছেলে আপনাকে কি বলে ডাকতো?

—সে আমাকে সাধারণতঃ দাদা বলে ডাকতো।

কি নরম ওর কণ্ঠস্বর। আমি জানি না সে এখন কোথায় আছে।

মিঃ কোয়েস্ট এবার গারভের দিকে তাকালেন।

—তুমি কি জ্যাকসনের ফ্ল্যাটে ফোন করেছিলে?

—হ্যাঁ। কোন উত্তর পাইনি।

কি যেন একবার ভাবলেন মিস্টার কোয়েস্ট। তারপর বললেন নিজের মনে—ছেলেটার কণ্ঠস্বর তো খুব মন দিয়ে শুনলাম। মনে তো হয় ওটা ঠিক টমের কণ্ঠস্বর। মিস্টার কোয়েস্ট আবার টেপটা চালু করলেন। আবার একবার শোনার চেষ্টা করলেন টমের স্বরটা—"আমাকে ওরা একদম মারেনি, বকেনি ড্যাড, আমি খুব ভাল আছি। দয়া করে শুধু ওরা যা চায় সেটা পাঠিয়ে দাও। আমি ভাল আছি। আমার জন্যে ভেবো না।"

খুব মন দিয়ে নতুন করে টেপটা শোনার পর কোয়েস্ট সশব্দে টেবিলের উপর একটা ঘুষি মারলেন। বললেন—না, এটা কিছুতেই টমের কণ্ঠস্বর নয়। হতে পারে না। তারপর একটু থেমে বললেন—গলাটা শুনলে মনে হয় বুঝি টম—টমই কথা বলছে। কিন্তু এখন আমার বিশ্বাস ওটা টমের কণ্ঠস্বর নয়। মনে হয় কেউ ইচ্ছাকৃত ভাবে গলা চেপে ধীরে ধীরে কথাগুলো বলেছে। আমার মনে হয় তারা টমের বদলে অন্য কাউকে ধরে নিয়ে গেছে।

প্যাট বললেন—আপনার অনুমান সঠিক। আমারও মনের স্থির বিশ্বাস এটা আমার ছেলের কণ্ঠস্বর নয়। কেউ ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা করছে। মাউথপীসের উপর পাতলা কিছু রেখে গলা চেপে টমের গলাকে নকল করা হয়েছে। কিন্তু মিস্টার জুলিয়েন—

মিস্টার জুলিয়েন কোয়েস্ট সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে কেবল অস্ফুট স্বরে বললেন—আমি পলের কথা ভাবছি। তারপরেই তিনি লিসিয়ার দিকে ঘুরে বললেন—গতকাল তো তুমি টমের সঙ্গে কথা বলেছ—তোমার কি মনে হয় টেপটা শুনে—এটা কি পলের কণ্ঠস্বর?

—কিন্তু পলকে ধরে তাদের লাভ কি?

—লাভ কিছু নেই, আসলে ভুল করে তারা একজনের বদলে অন্যজনকে নিয়ে গেছে। আর সেই কারণেই পল অভ্যাস মত কথাটা বলেছে।

—তা হতে পারে, কিন্তু পল তো ধরা পড়ার পর বলবে সে পল, টম নয়।

—মনে হয় বিপদ বুঝে সে গোপন করে গেছে। এই রকমের ছেলেদের ভাবসাব বোঝাই মুশকিল।

লিসিয়া এবার কথা বললো। সে কোয়েস্টের দিকে তাকিয়ে বললে—আমার মনে হয় টমকে ওরা বাড়িতে খুঁজে পাইনি।

—কোথায় যাবে সে? কোয়েস্ট তাকালেন লিসিয়ার দিকে।

—পার্কে আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য যেতে পারে। গতকাল তাকে সেই রকম প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। মনে হয়, সে আমার কথা মত পার্কে যাওয়ায় তারা তার কোন হদিশ পাইনি।

—তাহলে এখুনি একবার পার্কে যাওয়া যাক।

কথাটা বলে ব্যস্ত হয়ে প্যাট বাইরের দরজার দিকে পা বাড়ালেন। পিছন থেকে তার হাতটা চেপে ধরলেন জুলিয়েন কোয়েস্ট। বললেন—আপনার অনুষ্ঠান কিন্তু এখনও শেষ হয়নি। শ্রোতারা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। আপনি ওদের নিরাশ করবেন না। তাছাড়া কাজটা খুব বোকামো হয়ে যাবে। আপনি যেমন গান গেয়ে যাচ্ছেন, সেইভাবে গান গেয়ে যান। আপনার জন্য আমরা আছি। আমরা চিন্তা করছি কি আমাদের করতে হবে। এখানে আপনাকে সাহায্যের জন্য জন থাকল।

—যদি সত্যি ওকে পাওয়া না যায়?

—আপনি বিচলিত হবেন না মিস্টার প্যাট। আমি আর লিসিয়া এখুনি বেরিয়ে যাচ্ছি টমের খোঁজে। ওর সন্ধান পাওয়া মাত্র আমরা আপনাকে জানিয়ে দেব। প্যাট তাকালেন অসহায় দৃষ্টিতে। তারপর অস্ফুট স্বরে বললেন—যদি তারা সত্যি ভুল করে অন্য কাউকে ধরে নিয়ে গিয়ে থাকে তো, আমি তার জন্য ডলার দিতে যাবো কেন?

—এখন আর ডলারের চিন্তা না করাই ভাল। বরং মনে করুন আপনি আরও চারটে সন্তানের জীবন দিতে চলেছেন।

জুলিয়েন কোয়েস্ট বললেন—এখন মাথা গরম না করে মাথা ঠাণ্ডা রাখাটাই হল সবচেয়ে বেশি জরুরী।

কথাটা বলে কোয়েস্ট আর দাঁড়ালেন না। লিসিয়াকে সঙ্গে নিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়লেন।

মাথার মধ্যে একটা প্রশ্ন কেবল ঘুণ পোকার মত কুরে কুরে খাচ্ছিল মিস্টার কোয়েস্টকে। সেই প্রশ্নটা হল জ্যাকসনের ফ্ল্যাটের কথা। কোথায় এসে মিস্টার প্যাট তার ছেলেকে নিয়ে উঠেছেন, এই কথাটা কারও জানার কথা নয়। এমনকি শহরের নিরাপত্তা কর্মীদের প্রধানেরও জানার কথা নয়। তাহলে তারা খবরটা পেল কি করে? কার কাছ থেকে?

রাস্তায় বেরিয়ে দ্রুত ট্যাক্সি নিলেন মিস্টার কোয়েস্ট। উঠে বসলেন—সঙ্গে লিসিয়া।

—কোথায় যাচ্ছি আমরা?

—পার্কে। ওখানেই আগে ওর খোঁজ করা দরকার।

—আমারও তাই ধারণা, পার্কে গেলেই হয়ত আমরা ওই হতভাগ্য ছেলেটির সন্ধান পেয়ে যাব।

—নিশ্চয়। তোমার কি তাতে কোন সন্দেহ আছে লিসিয়া।

—ঠিক বুঝতে পারছি না, সবকিছু কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে।

একসময় ট্যাক্সি এসে দাঁড়ালো পার্কটির গেটের সামনে। সেই কোণের দিকের ফুলগাছ। লিসিয়া ট্যাক্সি থেকে নেমে পার্কের দিকে ফুলগাছের বাগানের দিকে ছুটতে লাগলো।

সামনেই একজন পুলিশের লোক। সে লিসিয়াকে দেখে প্রশ্ন করলে—ম্যাডাম, আপনি কি কাউকে খোঁজ করছেন?

লিসিয়া তার দিকে তাকালো। তারপর বললে—হ্যাঁ।

পুলিশটি বললে—আপনাকে দেখে এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হলাম। সকাল থেকে একটা ছেলে ওই বাগানের বেঞ্চিতে একা একা বসে আছে। আমি তাকে বারবার প্রশ্ন করেছি—সে এখানে কেন? সে কেবল বলছে—একজনের জন্য। ব্যস আর কোন কথা নেই। মনে হয় ছেলেটি স্বাভাবিক নয়। আমিও ঠিক সেই কারণে ওকে এখানে একলা ফেলে রেখে যেতে পারছিলাম না। ওই যে ছেলেটি— । পুলিশ কর্মচারীটি আঙুল দিয়ে জায়গাটা দেখিয়ে দিল।

এতক্ষণে মিস্টার কোয়েস্ট ওদের কাছে এসে গেছেন। তিনিও সব শুনেছেন। বললেন—আপনার অনুমান ঠিক—ছেলেটি আর দশটি ছেলের মত স্বাভাবিক নয়। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। পুলিশ কর্মচারীটি বললেন—ধন্যবাদ দিচ্ছেন কেন স্যার, এটা তো আমার কাজের অঙ্গ। আমি আমার কর্তব্য পালন করেছি মাত্র।

এবার লিসিয়া এগিয়ে গেল ফুলের বাগানের দিকে। দেখতে পেল টমকে। গিয়ে বসলো ওর পাশে। উত্তেজনায় সমস্ত শরীরটা যেন থরথর করে কাঁপছে, টমকে নিজের বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে, তাকে আদর করতে করতে লিসিয়া বললে—কি হল এবার বিশ্বাস হল তো, আমি এসেছি। কথা রেখেছি। কোয়েস্ট কাছে এগিয়ে এলেন। লিসিয়া বললে—টম ভেবেছিল আমি হয়ত আসবো না।

কোয়েস্ট সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে শুধু বললেন লিসিয়াকে—ওকে জিজ্ঞাসা করো, পল কোথায় আছে?

কোয়েস্টের কথামত লিসিয়া প্রশ্ন করলো টমকে। টম তার চোখের জল হাতের চেটো দিয়ে মুছে নিতে নিতে বললে—পল ঘুমোচ্ছে—

—তুমি চলে আসার সময় সে ঘুমোচ্ছিল তো?

টম মাথা নাড়লো।

—কিন্তু সে তো অনেকক্ষণ হয়ে গেছে টম।

—হ্যাঁ। অনেকক্ষণ হয়েছে। আমি তো সকালে চলে এসেছি।

এবার লিসিয়া তার পিঠে হাত বুলিয়ে বললে—তোমার কাছে নিশ্চয় ঘরের একটা চাবি আছে।

—হ্যাঁ আছে।

—তোমার চাবিটা আমাকে একটু দেবে?

—নিশ্চয় দেব। এই নাও।

প্যান্টের পকেট থেকে চাবিটা বার করে সে লিসিয়ার হাতে দিল। লিসিয়া চাবিটা দিল মিস্টার জুলিয়েন কোয়েস্টের হাতে। কোয়েস্ট বললেন—তুমি ওকে নিয়ে সোজা আমাদের ঘরে চলে যাও। মনে হয় ওর খুব খিদে পেয়েছে। কি টম তোমার খুব খিদে পেয়েছে?

—হ্যাঁ—খুব।

—ঠিক আছে, সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।, তুমি আমার সঙ্গে চলো টম। টম হাসি মুখে উঠে দাঁড়ালো। শক্ত করে ধরলো লিসিয়ার হাতটা।

কোয়েস্ট বললেন—খুব সাবধানে তুমি ওকে নিয়ে যাও, আর মিস্টার প্যাটকে একটা খবর দিও।

—আমাকে মনে করিয়ে দিতে হবে না। তবে আপনি একটু সাবধানে কাজ করবেন।

—ভয়ের কোন কারণ নেই। জ্যাকসনের ফ্ল্যাটটা মনে হয় এখন শহরের সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা। তরপর একটু থেমে বললেন—আমি তৈরি হয়েই এসেছি লিসিয়া। লিসিয়া হাসলো।

টমকে নিয়ে সে পার্কের উল্টোদিকের গেটের দিকে এগুতে লাগলো। কোয়েস্ট এগিয়ে গেলেন জ্যাকসনের ফ্ল্যাটের দিকে। হাতের মুঠোয় ঘরের চাবি।

স্বয়ংক্রিয় এলিভেটার চালু করে কোয়েস্ট উঠে এলেন চারতলায়। যতদূর খেয়ালে আছে জ্যাকসনের ফ্ল্যাট নম্বর ৪-বি হবে।

হ্যাঁ, ঠিক তাই। একেবারে নির্ভুল অনুমান।

বাইরে দাঁড়ালেন কোয়েস্ট। দরজাটা বন্ধ। ভিতরে টেলিভিশন চালু হওয়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে। তাহলে কি ঘরের মধ্যে কেউ আছে?

—না, ঘরে কেউ নেই। নিঃশব্দে ঘরে এলেন কোয়েস্ট। ঘরের দেয়ালে বহুদিনের সব পুরনো আলোকচিত্র সাজানো আছে। জ্যাকসন কোন এক সময় ভাল ফুটবলার ছিলেন। জাতীয় দলের হয়েও খেলেছেন। ঘরভর্তি তার সেই পুরনো দিনের ছবি। কয়েকটা ছবির মধ্যে মিস্টার কোয়েস্ট গারভেকেও দেখতে পেলেন।

এরপর বুদ্ধিমান কোয়েস্ট শুরু করলেন তদন্ত। ভালভাবে লক্ষ্য করতে চোখে পড়লো একটা টেলিফোন কেসের পাশে একটা ছোট্ট মোমের প্যাড—আর তাতে লেখা আছে টেলিফোন নাম্বার। নম্বরটা দেখেই চোখ কপালে উঠলো কোয়েস্টের—একি এই নম্বর ওই ঘরে এলো কি করে? তাহলে কি এই টেলিফোন থেকেই প্যাটকে হুমকি দেওয়া হয়েছিল—এতো তাদের থিয়েটার হলের ফোন নাম্বার। মনে হয় পল তাদের এই কাগজে টেলিফোন নাম্বারটা লিখে দিয়েছে।

কিন্তু পল কোথায় গেল? তবে ওরা টমকে না পেয়ে পলকেই কি ধরে নিয়ে গেছে? শান্ত মাথায় কোয়েস্ট চারদিক তল্লাসী করতে লাগলেন। এবার একটা টেপরেকর্ডার চোখে পড়লো। বুক কেসের পিছনে লুকনো। আচ্ছা টেপটা বুক কেসের পেছনে লুকনো কেন? কেউ কি লুকিয়ে রেখেছে ইচ্ছাকৃত ভাবে? নাকি ওটা স্থানচ্যুত হয়ে পড়েছে—হতেও তো পারে? টেপটা এবার হাতে নিলেন কোয়েস্ট। একবার বাজিয়ে শোনা যাক। বাচ্চা ছেলের টেপে কি আর থাকতে পারে—বড়জোর মিউজিক বা পপ্‌ গান। তবু কৌতূহলে টেপটা চালালেন কোয়েস্ট।

সুইচে আঙুল দেওয়া মাত্র টেপ ঘুরতে লাগলো।

দু-এক সেকেণ্ডের মধ্যেই ভেসে এলো তাদের টেপ শোনা টমের কণ্ঠস্বর—"আমাকে ওরা একদম মারেনি, বকেনি ড্যাড—আমি খুব ভাল আছি। দয়া করে শুধু ওরা যা চায় সেটা ওদের পাঠিয়ে দাও। আমি ভাল আছি। আমার জন্যে ভেবো না।"

মুহূর্তের মধ্যে কোয়েস্টের মুখটা উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠলো। মাথার চুলের ফাঁকে কিছু কিছু ঘাম জমতে লাগলো। কি করবেন ভাবতে পারলেন না। তার আগেই তিনি শুনতে পেলেন নিচে থেকে দরজা খোলার শব্দ। দ্রুত টেপটা বন্ধ করে দিয়ে ঘুরে তাকালেন। মনে হয় কেউ ভিতরে আসছে।

কোয়েস্ট যে ভিতরে আছে মনে হয় আগন্তুক সেটা বুঝতে পারেনি। দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে একেবারে থ হয়ে গেলেন।

—আপনি, আপনি মিঃ কোয়েস্ট—এখানে?

—তোমার খোঁজে। খানিক আগে আমরা টেলিফোন করেছিলাম। ফোনটা বেজে গেল কেউ ধরলো না।

—আমি না সকাল থেকে টমকে খুঁজে পাচ্ছি না। মনে হয় সে কোথাও বাইরে বেরিয়ে গেছে। একা একা বহুদূরে কোথাও চলে গেছে। খানিক আগে আমি ওর খোঁজে পার্কে গিয়েছিলাম, কিন্তু ওকে খুঁজে পাইনি।

কোয়েস্ট দৃঢ়কণ্ঠে পলের দিকে তাকিয়ে বললেন—ওর খোঁজ আমরা পেয়েছি। এখন আমার শুধু জানা দরকার, তোমার হাতে ওটা কি?

—এটা একটা বাক্‌স?

—আমি ওটা একবার দেখতে চাই।

—না মিস্টার কোয়েস্ট এটা পাওয়ার কোন চেষ্টা করবেন না।

—আরে আমার একটা এই ধরনের বাক্‌সের প্রয়োজন আছে। পকেটে আমার অনেক ডলার আছে—এই ভাবে তো শহরে ঘোরা যায় না। তুমি বাক্‌সটা দিলে আমি ডলারগুলো রাখতে পারতাম।

—ডলার! তারপর হেসে পল বললে—ডলারের চিন্তা না করে যে দরকারী বস্তুটা খোওয়া গেছে তার চিন্তা করলেই মনে হয় ভাল করতেন।

—সে চিন্তা শেষ করে তবেই তো আমি তোমার কাছে এসেছি পল। পল তাকালো।

কোয়েস্ট বললেন—তোমার টেলিফোনের সামনে দেখলাম একটা মোমের প্যাড আছে। তাতে দেখলাম আমাদের থিয়েটার হলের হট লাইনের নাম্বারটা লেখা। তাছাড়া তোমার টেপটাও শুনলাম। যাক সৌভাগ্যবশত টমের কিছু হয়নি, কিন্তু পল তুমি বাড়াবাড়ি করে ফেলেছ। সত্যি করেই বলো আমায় ওই বাক্‌সের মধ্যে কি আছে? আমি দেখবো—দেখতে চাই।

—না মিস্টার কোয়েস্ট সে চেষ্টা করবেন না।

মুহূর্তে পলের চেহারাটা বদলে গেল। সরল বয়সের চিহ্নগুলো মুছে গিয়ে ফুটে উঠলো শয়তানির বলিরেখা। বালক মুহূর্তে রূপান্তরিত হল দানবে। সে জ্যাকেটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে রিভালবার উঁচিয়ে ধরলো। বললে—মিঃ কোয়েস্ট শুনে রাখুন, এই বাক্‌সের মধ্যে অনেক ডলার আছে। এই ডলার আমার বাবার। তার পাওনা। এই ডলারগুলো না হলে বাবাকে সর্বস্ব হারাতে হবে। তারপর একটু থেমে বললে—শুনুন স্যার, আমার বাবার সিণ্ডিকেটের কাছে কিছু ডলার ধার আছে। সেই ডলার সময়ের মধ্যে দিতে না পারলে তারা বাবাকে খুন করবে। কিন্তু আমার বাবা এত ডলার কোথায় পাবেন? কে তাকে দেবে? মিস্টার উইলিয়ামস প্যাটের অনেক ডলার আছে—তার ধার দেওয়ার ক্ষমতাও আছে—আপনিও পারেন এতগুলো ধার দিতে—কিন্তু আমার বাবা কোথায় পাবেন। আপনার মত তার সুন্দর অফিস নেই, সুদৃশ্য ফ্ল্যাট নেই। নেই সুন্দরী রক্ষিতা।

কথাটা পল শেষ করা মাত্র প্রচণ্ডভাবে ধমকে উঠলেন মিস্টার কোয়েস্ট। চিৎকার করে বললেন—ওহে বালক তুমি তোমার স্পর্ধার সীমা লঙ্ঘন করছো। তোমার দুর্গন্ধময় মুখটা আমি পারি ইচ্ছে করলে সাবান দিয়ে ধুয়ে দিতে, কিন্তু সে সময় এখন আমার হাতে নেই।

—সে সময় তাহলে আপনার হবে না মিস্টার কোয়েস্ট আমি এখুনি চলে যাচ্ছি। আমাকে বাধা দেবার চেষ্টা করলে আমি বাধ্য হব গুলি চালাতে। আমার

বাবার ডলারগুলো দরকার—যে করেই হোক এই ডলার আজ আমাকে তার হাতে পৌঁছে দিতে হবে।

কোয়েস্ট কোন রকম উত্তেজনা প্রকাশ না করে বললেন—তুমি জানো, তুমি কি করতে চলেছ?

—জানি, নিশ্চিত মৃত্যুকে নিয়ে খেলা করছি। দেখুন স্যার আমি আমার বাবার মত নীতিবাগীশ নই—আমি সম্পূর্ণ আলাদা। আমার কাছে প্রয়োজন হল আসল, তারপর আদর্শ—নীতি কথা।

—তা না হয় বুঝলাম, তুমি কি জানো এর ফলে কি ঘটবে?

—জানি, সব জানি—জেনেশুনেই আমি যা ভাল মনে করেছি তাই করেছি। কেবল দয়া করে অনুরোধ করবো আমায় বাধা দেবেন না।

কোয়েস্ট স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। কি করবেন তিনি? তিনি তো জানেন না বেপরোয়া পাগলা ঘোড়ার রাশ কি ভাবে টেনে ধরতে হয়।

শুধু দেখতে পেলেন নিঃশব্দে পল রিভলবার তাক করে পিছন দিকে একটু একটু করে পিছিয়ে যাচ্ছে দরজার দিকে। তারপর দরজা খুলে একপা বাইরে দিল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে প্রচণ্ড একটা শব্দের ধাক্কায় চমকে গেলেন কোয়েস্ট। দেখতে পেলেন টলতে টলতে পল ঘরে ঢুকে স্প্রিংয়ের মত মাটিতে আছড়ে পড়লো। ছিটকে গেল তাঁর হাতের রিভলবার। চকিতে ঘরে ঢুকলেন জন গারভে। উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন—খুদে শয়তান।

—গারভে!

—হ্যাঁ আমি, একদিন খেলার মাঠে এই ভাবেই ট্যাকল করতাম বিপক্ষকে। এখনও সেই পুরনো অভ্যাসটা পুরোটা ঠিক আছে কিনা একটু ঝালিয়ে নিলাম।

কোয়েস্ট নিচু হয়ে মাটিতে ছিটকে পড়া পলের রিভলবারটা হাতে তুলে নিয়ে বললেন—তোমাকে এখানে দেখতে পেয়ে খুশি হলাম। কিন্তু তুমি এখানে এলে কি করে?

এবার মুখ খুললেন জন গারভে। বললেন—তোমরা চলে যাওয়ার পর আমার কাছে নির্দেশ আসে, আমি যেন কাছাকাছি টেলিফোন বুথে ডলার ভর্তি বাক্সটা রেখে আসি। কি মনে হল আমার—কাউকে কিছু না বলে আমি বাক্স ভর্তি ডলার নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। নির্দেশ মত রাখলাম টেলিফোন বুথের সামনে। তারপর খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা লক্ষ্য করতে লাগলাম। দেখলাম একটু বাদে একটি অল্পবয়সী মেয়ে এলো। সে চারিদিক তাকিয়ে বাক্সটা হাতে নিয়ে হাঁটতে লাগলো। এরপর একটা গলির মধ্যে দেখলাম এই শয়তানটাকে। ও আমাকে লক্ষ্য করেনি। আমি ওকে অনুসরণ করে সোজা এখানে চলে এসেছি।

কোয়েস্ট বললেন—ঠিক সময়ে এসেছ, একটু দেরি হলে ওকে হয়ত আর পাওয়া যেত না।

গারভে বললেন—টমের কি খবর? তাকে কি পাওয়া গেছে?

—হ্যাঁ। টম ভাল আছে। লিসিয়া তাকে নিয়ে গেছে।

তারপর একটু থেমে ডনের পিঠে হাত রেখে কোয়েস্ট শান্ত গলায় বললেন—উত্তেজনার বশে মনে হয় কাজটা ভাল করা হল না।

—বলো কি?

—ঠিকই বলছি ডন, একটা ছেলে তার বাবাকে বাঁচাবার জন্য নিজেকে নিশ্চিত মৃত্যুর মধ্যে টেনে এনেছে।

—মানে?

কোয়েস্ট বললেন—ওর কাছেই শুনলাম তোমার বন্ধু জ্যাকসনের নাকি এই মুহূর্তে প্রচুর ডলারের দরকার—বাজারে তার অনেক ডলার দেনা। সে খুব বিপদের মধ্যে আছে। আমার মনে হয় আমাদের এখুনি একবার জ্যাকসনের খোঁজ করা দরকার।

—আশ্চর্য আমি তো এসব কিছুই কোনদিন শুনিনি জ্যাকসনের কাছে।

কোয়েস্ট বললেন—আমি ওর ছেলের কাছ থেকে সব শুনেছি। ছেলেটির সাহসকে প্রশংসা না করে পারছি না, সেই সঙ্গে অভিভূত হয়েছি বাবার প্রতি ভালবাসা আর সহানুভূতি দেখে। ও যা কিছু করেছে, কেবল ওর বাবাকে বিপদ থেকে বাঁচাবার জন্য।

—কিন্তু এই বাচ্চা শয়তানটাকে নিয়ে আমরা এখন কি করবো?

—সবটাই নির্ভর করছে আমাদের উপর। আমরা ইচ্ছে করলে ওকে ক্ষুধার্ত হায়নার মুখে তুলে দিতে পারি, কিংবা পারি সাহায্যের জন্য অসহায় বালকের দিকে আমাদের সহানুভূতির হাতটা বাড়িয়ে দিতে। আমার মনে হয় দ্বিতীয় কর্তব্যটাই আমাদের করা উচিত।

কথাটা শেষ করে কোয়েস্ট তাকালেন জন গারভের দিকে। তারপর তাঁর দৃষ্টি আটকে গেল মাটিতে পড়ে থাকা অসহায় পলের দিকে। তার পায়ের পাশ দিয়ে নদীর মত এঁকেবেঁকে এগিয়ে যাচ্ছিল রক্তের ধারা। কিছুক্ষণ ওই দিকে তাকিয়ে থাকার পর কোয়েস্ট বললেন—এসো জন, সবার আগে এই বাচ্চা ছেলেটাকে আমরা বাঁচাবার চেষ্টা করি।

নেভার—টু-বি লস্ট

জ্যা ডারলিং

আমার কিছু ভাল লাগে না। সারা দিন শুধু একভাবে বসে থাকা জানলার ধারে। কখন জানলা দিয়ে রোদ ঢুকবে ঘরের মধ্যে। আজ প্রায় এক সপ্তাহ হল আকাশটা মরে ছিল। বৃষ্টি ছিল না, মেঘ ছিল। আজ প্রথম সূর্যকে ভালভাবে দেখা গেল। আমার ঘরের জানলা দিয়ে বাইরের বেশ অনেক অংশ দেখা যায়। আগে আরো ভালভাবে সব কিছু দেখা যেত, এখন আর দেখা যায় না। কিছুদিন হল আমার বাবা পিছনের বাগানের অনেকটা অংশ বিক্রি করে দিয়েছেন একজন ব্যবসায়ীর কাছে।

ওই ফাঁকা জায়গায় সুন্দর একটা ছিমছাম বাড়ি উঠেছে। বাবা এখন আর বড় একটা ওই জানলার দিকে আসেন না। আমি বসে থাকি।

বসে বসে, অনেককে দেখতে পাই।

সবচেয়ে এখন যাকে খুব বেশি করে দেখি সে হল রনি। আমি ওকে মনে মনে রনি বলে ডাকলেও ওকে সবাই বলে রণ। আমাদের প্রতিবেশি। খুব কাছের প্রতিবেশি। ওর স্বভাব চিরকাল একটু অন্যরকম। কোন জায়গায় স্থির থাকে না। কিছুদিন আগে পর্যন্ত ও থাকতো বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র। এখন সে বাড়িতে ফিরে এসেছে। এর কারণ হল যে বাড়িতে সে থাকতো আরো কয়েকজনের সঙ্গে সেখানে পুলিশ হানা দিয়েছিল। পুলিশের হানা দেওয়ার অন্য কোন কারণ ছিল না— আসলে বাড়িটার পরিবেশ ছিল ভীষণ রকমের অস্বাস্থ্যকর। ফলে ওই আস্তানা ছেড়েও নিজের বাড়িতে চলে আসে।

রণ বাড়ি আসায় আমাদের প্রতিবেশিরা সবাই খুব চিন্তায় পড়লো। আমার বাবাও চিন্তায় পড়লেন। আসলে সবাই বলতো রণ খুব—খুব খারাপ। অথচ কেউ বলতে পারতো না রণ ঠিক কতটা খারাপ অথবা কেন খারাপ। বাবা বিব্রত হয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু তার করণীয় কিছু ছিল না। কি করবেন তিনি—আমাদের বিক্রি করা জমিতে এখন যে নতুন বাড়িটা উঠেছে সেটা রণের বাবার তৈরি। অতএব ওই বাড়িতে থাকার অধিকার রণের আছে।

মিথ্যে বলবো না—আমি কিন্তু অনেকদিন বাদে রণকে দেখে বেশ খুশি হয়েছি। ও আমাকে দেখে। কথা হয় না—কেবল দূর থেকে হাসে, হাত নাড়ে। রণ কেমন

ছেলে—ওকি সত্যি আমাকে ভালবাসে এসব কথা কোনদিন মনে হয় নি। শুধু মনে হত রণ বড় ভাল। আহা, ওকে আমি বড় ভালবাসি।

এবার আমার কথায় আসা যাক। আমার নাম জুলি। পুরো নাম জুলি বেনসন। তবে সবাই জুলি বলে ডাকে। আর আমার বাবা—নাম টেরেন্স বেনসন। একজন নামকরা লেখক। তিনি বহুদিন আফ্রিকার অনেক দেশে রাষ্ট্রদূতের কাজ করেছেন।

শুনলেন তো আমার কথা। আবার আসি রণ প্রসঙ্গে। রণ কেমন ছেলে তা বলতে পারবো না সেকথা আগেই বলেছি, শুধু জানি ছেলে হিসেবে দেখতে সে ভারি সুন্দর। একজন পুরুষের চেহারা যতটা আকর্ষনীয় হওয়া উচিত ঠিক সেই রকম। বেতের মত নমনীয় তার শরীর। তার হাঁটাচলার মধ্যে একটা ছন্দ আছে। দেখে মনে হয় ও যেন সর্বক্ষণ নেচে বেড়াচ্ছে। আমারও নাচতে ভাল লাগে। ভাবি মনে মনে নৃত্যশিল্পী হব। রণের হাত ধরে নাচবো। নাচার সময় আমার ওড়না উড়বে পাখির ডানার মত। আমার পরণে থাকবে ফোলা ফোলা সাদা পরীর মত ঘাগরা, পায়ে সাদা ফিতে বাঁধা জুতো। রণের পায়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে আমি নাচবো। নাচবো মঞ্চে...মঞ্চে অসংখ্য দর্শকের সামনে। সবাই অবাক হয়ে আমাদের নাচ দেখবে। নাচ শেষ হলে আমাদের দুজনকে সকলে ছেঁকে ধরবে। আমরা ওই দর্শকদের স্রোত সাঁতরে বাতাসে ভাসতে ভাসতে পাখির মত নিরুদ্দেশ হয়ে যাবো দেশ থেকে দেশান্তরে।

হাসি পাচ্ছে!

কেন জানেন—যে স্বপ্নের কথা এতক্ষণ বললাম সেগুলো কোনদিন সম্ভব হবে না বলে। স্বপ্ন—আমার কাছে স্বপ্নই থেকে যাবে। তবু ভাবতে দোষ কোথায়। ভাবতে তো বাধা নেই। বৃষ্টি যেমন করে চারদিকের সবকিছু ধুয়ে মুছে নিয়ে যায় সেই ভাবে সন্ধ্যে হলেই আমার স্বপ্ন দেখার পালা শেষ হয়। আমি জানি আমি নৃত্যশিল্পী নই। রণ আমার প্রেমিক নয়। আমাদের কোনদিন মিল হবে না। আমার জীবনটা একটু অন্য রকম।

আমি খুব শিগ্রি নার্স হচ্ছি। আফ্রিকার একটা জায়গায় আমায় নার্স হয়ে যেতে হবে। শুনলে হয়ত মা রাজি হবেন না। বলবেন, আফ্রিকা—ওই ওরকম কালো দেশে যাওয়ার কোন দরকার নেই। আসলে আমার মা ভীষণ বর্ণবিদ্বেষী। বাবা অবশ্য ভীষণ উদার। হাজার হোক তিনি মানুষ। তিনি লেখক।

কেন জানি না আমার মনে হয় নার্স হওয়া শেষ পর্যন্ত আমার হবে না। আমাকে এই আশা ত্যাগ করতে হবে। কিন্তু এটাও ঠিক আমি কিছুতেই পারবো না কোন দোকানে বসে কারো সহকারি বা দোকানের বিক্রেন্তা হতে। ও সব কাজ

আমার ভাল লাগে না। তবু কিছু তো একটা আমায় করতে হবে। দেখতে দেখতে বয়স তো কম হল না—বাইশ বছর। সামনের মাসে আমি বাইশে পা দেব।

আমরা বাড়িতে তিনজন প্রাণী। আমি-বাবা আর মা। তিনজন তিন ধরনের। তবে আবার এই তিনজনের মধ্যে মা হলেন একেবারে আলাদা। অন্য এক ধাতুতে গড়া। আমার বাবার সঙ্গে মায়ের স্বভাবে, আচরণে কোন মিল নেই। বাবা সময় পেলেই আমার কাছে আসেন। বাবা বসেন। আদর করেন। মা'র কাছে আমি এসব কিছুই পাই না। আমাকে মা একদম পছন্দ করেন না। আসলে আমি আমার মায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাবার আন্তরিক ইচ্ছায় আর ঈশ্বরের দোহাইতে ভূমিষ্ঠ হয়েছি। আমার তো ভূমিষ্ঠ হওয়ার কথা ছিল না। আমি ভূমিষ্ঠ হওয়ায় মার মন সবচেয়ে বেশি খারাপ হয়েছিল।

যতদূর জেনেছি আমার বাবার বিয়ে হয়েছিল পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে। তখন আমার মায়ের বয়স ছিল আমার মত। মা কোন সন্তান চাইতো না। বাবার খুব ইচ্ছে ছিল। ওদের বিয়ে. হয়েছিল ভালবেসে। বাবা ভীষণ ভালবাসেন মাকে। বিয়ের আগে মা যদি বলতেন তিনি ড্রাকুলার মেয়ে তবু বাবা তাঁকে বিয়ে করতেন। মা যে আমার সুন্দরী একথা অস্বীকার করবো না। এখনও এই বয়সে মায়ের বয়স ধরা যায় না। ঠিকঠাক সাজলে অনেক অল্পবয়সী মেয়েদের মত লাগে। মায়ের ধারণা ছিল সন্তান হলে তার এই সুন্দর শরীরটা থাকবে না। এই কারণে আমার আগে যাদের ভূমিষ্ঠ হওয়ার কথা ছিল তারা কেউ ভূমিষ্ঠ হতে পারেনি। প্রথমবার সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে একজন অঙ্কুরে বিনষ্ঠ হয়। দ্বিতীয়বার বাবার আপত্তি সত্ত্বেও মা ঘোড়ায় চড়ে নষ্ট করেন। আমার বেলাতেও মা সাঁতার কেটেছেন, ঘোড়ায় চড়েছেন, যা যা ওই সময় করণীয় নয় বাবার বারণ সত্ত্বেও তিনি তাই তাই করেছেন। অথচ ভাগ্যের এমন নিষ্ঠুর পরিহাস সমস্ত বাধা সত্ত্বেও বাবার ইচ্ছের জোরেই আমি পৃথিবীর মুখ দেখেছি।

একটা সত্যি কথা বলবো—আপনারা বিশ্বাস করবেন? বিশ্বাস করলেন বা নাই করলেন তবু আমাকে বলতে হবে সত্যি কথাটা—তা হল আমার মায়ের সঙ্গে আমার কিন্তু সদ্ভাব নেই। আমার সমস্ত ভালবাসা আমার বাবাকে ঘিরে। আমার বাবাই হলেন আমার ধ্যানজ্ঞান, প্রেরণা, ভালবাসা।

আসলে খুব ছোটবেলা থেকেই আমি বাবার কোলেই বেশি উঠেছি। রাতে ঘুম ভাঙতে দেখেছি বাবার মুখ। যখনই কেঁদেছি বাবা এসে বুকের মধ্যে জাপটে ধরেছেন। আবার যখন যা কিছু চেয়েছি বাবা আমাকে এনে দিয়েছেন। আর এই সব কারণে আমাকে বাবা খুব ভালভাবে বোঝেন যেমন বাবাকে আমি বুঝি।

বাবার মনে বড় দুঃখ আছে। এই দুঃখ মায়ের জন্য। বাবা যা যা পছন্দ করেন না মা তাই করেন। আমারও ভাল লাগে না মায়ের উগ্র সাজগোজ। তিনি যখন হাইহিল জুতো পরে হেঁটে যান তখন পিছন থেকে তাকে খুব বিশ্রী দেখায়। কিন্তু বোঝাবে কে? ইদানিং আবার দেখছি মা হিপিদের মত পোশাক পড়ছেন—ওই পোশাকে তাকে একদম মানায় না। বাবা এইসব দেখে কষ্ট পান। মনে হয় তাঁর মর্যাদার হানি হচ্ছে। কিন্তু বলার উপায় নেই। বললেই মহাবিপত্তি ঘটে যাবে। আসলে আমার মা বড় বেশি স্বাধীনচেতা।

কিছুদিন হল দেখছি মা'র কাছে একটা ছেলে আসছে। ছেলেটার বয়স বেশি নয়। ছেলেটি মাকে গ্রীক বোঝায়। আচ্ছা বলতে পারেন—গ্রীক ভাষা কি ফ্রেঞ্চ বা ইতালির চেয়ে বেশি কঠিন বা গভীর? কোনটাই নয়—অথচ মার ভারি অদ্ভুত খেয়াল। বাবা অবশ্য বাধা দেননি মায়ের এই গ্রীকচর্চাকে। যে ছেলেটি গ্রীক বোঝায় তাকে দেখতে বেশ রোগা আর লম্বা। সারা মুখে ব্রনয় ভর্তি। আমার তো কদাকার লাগে দেখতে।

ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে মা বড় বেশি বাড়াবাড়ি করেন। আমাকে সুযোগ পেলেই যা নয় তাই বলেন—ভাবটা এমন যেন আমি ওর সৎ মেয়ে। আমার খুব কষ্ট হয়। মনে হয় বাবাকে বলি। আবার ভাবি বলে কি হবে বাবা শুনলে কষ্ট পাবেন। আমি প্রাণপণ চেষ্টা করি বাবার কাছে সব কথা, সব ব্যথা লুকিয়ে রাখতে। আসলে আমি বাবাকে একদমই কষ্ট দিতে চাই না।

মনে আছে একবারের ঘটনা। সেটা ছিল রবিবার। আমরা প্রায়ই রবিবার সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যাই। সেদিনও গিয়েছিলাম। মা সাঁতারের পোশাক পরে জলে নেমেছিলেন। আমি জলে নামি নি। বালিতে বসে আমি একা একা খেলা করছিলাম। বাবা বললেন—তোমার জন্য একটা আইসক্রিম নিয়ে আসি।

আমার খুব আনন্দ হল। আসলে ওই সময় আমার আইসক্রিম খেতে ভীষণ ইচ্ছে করছিল। বাবা দ্রুত হেঁটে গেলেন। তিনি আমার দৃষ্টির বাইরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মা উঠে এলেন জল থেকে। আমাকে জোর করে নিয়ে গেলেন সমুদ্রে। সমুদ্রের ঢেউ-এর তালে নাচতে নাচতে আমি অনেকদূর চলে গিয়েছিলাম। আমার মুঠি আলগা হয়ে এসেছিল। মাকে খুঁজে পাচ্ছিলাম না। সমুদ্রে তখন একা আমি ভাসছি। মনে হচ্ছিল কে যেন আমায় জলের নিচে টানছে।

চিৎকার করবো সাধ্য নেই। কিছু ধরবো কাছে কিছুই নেই। ঠিক সেই মুহূর্তে বুঝতে পারলাম কে যেন আমায় সমুদ্রের জল থেকে টেনে তুলে আনলো। বালিতে শুইয়ে দিল। হাতে হাত ঘষতে লাগলো। এই স্পর্শ আমার চেনা। বুঝলাম যিনি আমার হাতে হাত ঘষছেন তিনি আমার বাবা ছাড়া আর কেউ হতে পারেন না। ঠিক তাই—চোখ মেলে দেখলাম বাবা আমার দিকে ঝুঁকে আছেন। আমি সেই

যাত্রায় বেঁচে গেলাম। বাবার ভীষণ আনন্দ হয়েছিল। অথচ কেঁদেছিলেন আমার মা। সেইদিন আমার কাছে সবকিছু জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল। ভাবি মা আমার সঙ্গে ওরকম আচরণ করলেন কেন। আমি তো তাঁর নিজের সন্তান। সন্তানের জন্য তাঁর কি কোন মায়া নেই? মা কখনও এমন হয়। কি জানি হয়ত হয়। সব মা তো মা হতে পারে না।

ভাবনায় ছেদ পড়লো।

দরজায় বেল বাজলো। দরজাটা বন্ধ। আমি জানি মা দরজা খুলবেন। কিন্তু বেলটা বাজলো একাধিকবার তবু দরজা খোলা হল না। আমি জানি এই সময় কে আসতে পারে। নিশ্চয় ডাক্তার। এই সময় ডাক্তার ছাড়া আর কেউ আসে না। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। বেল বাজছে। মা নিশ্চয় শুনেছেন, অথচ দরজা খুলছেন না। মনে হয় উনি এখন নিজের প্রসাধন নিয়ে ব্যস্ত। মাথায় স্যাম্পু করছেন, এরপর চুল আঁচড়াবেন, গালে-ঠোঁটে রঙ দেবেন। আয়নায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিজেকে দেখবেন এবং তারপর দরজা খুলবেন। আসলে মা যৌবনকে নিত্য সঙ্গী করতে চান। বয়স ভুলে যৌবনকে ধরে রাখার চেষ্টায় তাঁর খুব ইচ্ছে সুইজারল্যাণ্ডে গিয়ে প্লাস্টিক সার্জারি করে আসেন। ভাল্লুকের পশমের কোট পরেন...কিন্তু কে তাঁকে ডলার যোগাবে। আমার বাবা—তাঁর তো এত ডলার নেই। তাঁর সব ডলারই তো ডাক্তারের পিছেনে খরচ হচ্ছে।

বহুবার কলিং বেলের শব্দটা হতে হতে একসময় থামলো। মা সাজগোজ সেরে দরজা খুললেন। ততক্ষণে ডাক্তার ভিজে গেছেন। তবে ডাক্তার কিন্তু রাগ করলেন না। মায়ের সঙ্গে কথা বলতে বলতে হাসিমুখে আমার ঘরে ঢুকলেন। ওঁদের সঙ্গে মাকে যে গ্রীক পড়ায় সেও ঘরে এলো। মায়ের সঙ্গে ডাক্তারের যে এত কি কথা হয় আমি জানি না। অথচ ওই ডাক্তার কিন্তু বাবার বন্ধু। ওঁদের আমি আমার ঘরে দেখে আদৌ খুশি হলাম না।

ডাক্তার দু-একটা কথা আমায় জিজ্ঞাসা করলেন। মামুলি প্রশ্ন। আমি দেখলাম মা তাকে চোখের ইশারায় কাছে ডাকলেন। ভদ্রলোক এগিয়ে গেলেন রুম হিটারের কাছে। চেয়ার টেনে বসে শুরু করলেন তাঁরা গুলতানি। তিনজনে গল্পে ডুবে গেলেন। বাবা বাড়ি নেই।

আমি ঘরে একা।

বুঝলাম ওরা কেউ আমাকে নজর দিচ্ছে না। ডাক্তার আসেন আমাকে দেখতে অথচ সময় কাটান তিনি মায়ের সঙ্গে বসে।

ওরা তিনজনে আমার দিকে পিছন করে বসেছিল। আমাকে দেখার উপায় ছিল না। বুঝলাম আমি ওদের কাছে ভীষণ অবাঞ্ছিত।

সেই মুহূর্তে মা একটা ভীষণ ধরনের ভুল করলেন। আমার জানলার উপর যে

মোমবাতিটা ছিল সেটা তিনি জ্বালিয়ে দিয়ে আবার গিয়ে বসলেন ডাক্তারের পাশে। ওদের হাসাহাসি আমি শুনতে পাচ্ছিলাম।

আমার মাথার মধ্যে তখন একরাশ পোকা কিলবিল করছিল। মনে পড়লো সমুদ্রের সেই ঘটনার কথা। আমার মধ্যে একটা ক্ষোভ, একটা প্রতিহিংসা সেই থেকে মনের মধ্যে দানা বেঁধেছিল।

ভাবতে গিয়ে মনে পড়লো বাবার মুখটা। আহা কি সরল আর দুঃখী মানুষ। আচ্ছা আমি কি পারি না বাবাকে মুক্তি দিতে? বাবা মুক্তি পেলে আমি সবচেয়ে বেশি সুখী হব। বাবার সমস্যা এই মুহূর্তে আমি পারি সমাধান করে দিতে।

ভাবতে গিয়ে আমি যেন সাহসী হয়ে উঠলাম। মনে মনে ঠিক করলাম আমাকে আমার বাবার জন্য কিছু একটা করতে হবে। বাবা পারেন একজন পরমা সুন্দরী কাউকে বিয়ে করে নিজেকে সুখী করতে।

আমি তৎপর হয়ে উঠি। আর সেই মুহূর্তে পা দিয়ে আমি জ্বলন্ত মোমবাতিটা উল্টে দিলাম। মুহূর্তের মধ্যে জ্বলন্ত মোমবাতিটা গিয়ে পড়লো পর্দার উপরে। তারপর দাউ দাউ আগুনে ধরে গেল গোটা ঘরটা। ধোঁয়ায় ধোঁয়া। আমি আগুন দেখে চিৎকার করে আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠলাম। বললাম—মা বিদায়। বিদায় ডাক্তার। বিদায় বোকা গ্রীক মাস্টার। বাবা তুমি খুশি তো।

দেখতে দেখতে আগুন গোটা ঘরময় ছড়িয়ে পড়লো। এই আগুন থেকে গোটা বাড়িটা নিস্তার পেল না। আমি সে আগুন থেকে বেরিয়ে আসবো উপায় নেই। হঠাৎ দেখতে পেলাম ধোঁয়ার মধ্যে একটা মানুষকে আমার দিকে এগিয়ে আসতে। ওকে চেনা যাচ্ছে না। গোটা মুখটা আগুনে ঝলসে গেছে। কোন রকমে ওই লোকটা আমার হুইল চেয়ার ধরে আমাকে আগুন থেকে বাঁচিয়ে বাইরে বার করে দিল। তারপর চারপাশের আগুনে আটকা পড়ে গেল নিজে।

ইতিমধ্যে দমকল এসে পড়েছে। ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। বাইরে আমি হুইল চেয়ারে বসে। দেখছি চারদিকে সবকিছু জ্বলে যাচ্ছে। আমার খুব কাছে দাঁড়িয়ে টহলদারী দুজন পুলিশ। ওরা কথা বলছিল।

একজন জানতে চাইলো—আগুনটা জ্বললো কি করে? অন্যজন বললে—শুনলাম, পঙ্গু মেয়েটা মোমবাতি উল্টে ফেলেছে।

—কি ভয়ানক আগুন। কেউ মারা যায়নি তো?

অন্যজন বললে—হ্যাঁ একজন মারা গেছে, ওই পঙ্গু মেয়েটির বাবা। ভদ্রলোক ঠিক সময় বাড়িতে এসে পড়ে পঙ্গু মেয়েটাকে কোনরকমে বাঁচিয়েছেন। ওঁর মা তো হিস্টিরিয়া রুগীর মত চিৎকার করে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। ঘরে আর যে দুজন ছিল তারাও বেরিয়ে আসতে পেরেছে—তবে ওদের অবস্থা সঙ্গীন।

একজন পুলিশ অফিসার বলল—পঙ্গু মেয়েটাকে ফেলে এইভাবে সবাই ঘর ছেড়ে পালালো কি করে—ওরা কি মানুষ?

ভদ্রলোক কপালের ঘাম মুছলেন।

মনে মনে বললাম, আপনারাই বুঝুন, কেমন আমার মা। কেন আমি মোমবাতিটা ইচ্ছে করে উল্টে দিয়েছিলাম।

ভাবছিলাম আমি আমার মায়ের কথা। কি ভাগ্য আমার মায়ের।

আমার মনের কথা মনে হয় পাশে দাঁড়ানো পুলিশ অফিসারদের একজন টের পেয়েছিলেন। বললেন অন্যজনের উদ্দেশে—মহিলার ভাগ্যটা দারুণ ভাল। শুনেছি এই বাড়িটার জন্য অনেক ডলার ভদ্রলোক বিমা করেছেন। মহিলা এসব ডলার পেয়ে যাবেন। তাছাড়া বাজারে ভদ্রলোকের যা বই আছে, তার ডলারও কম নয়। রাতারাতি মহিলা অনেক ডলার পেয়ে ধনী হয়ে গেলেন।

আমি ওঁদের কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছিলাম।

আগুন তখনও নিভে যায়নি।

পুলিশ অফিসার বললেন—মহিলা একেবারে অক্ষত।

ওদের কথার ফাঁকে অ্যাম্বুলেন্সের গাড়ি এলো।

দূর থেকে দেখলাম একজনকে তোলা হল।

—মনে হয় পঙ্গু মেয়েটির বাবার ডেডবডি, এখান থেকে মর্গে যাবে।

—বাকি দুজন?

—ওদের আগেই হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

আগুন দেখতে দেখতে একসময় আমার চোখে জল এসে গেল। মনে পড়লো বাবাকে।

বুঝতে পারলাম এই পৃথিবীতে আজ থেকে আমি কত নিঃসঙ্গ। একজন পুলিশ অফিসার অন্যজনকে বললেন—মহিলার এখন থেকে এই পঙ্গু মেয়েটির কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

—ঠিক বলেছ, মেয়েটি মোমবাতি উল্টে না দিলে মহিলার ভাগ্য এত সহায় হত না।

আমার দু'চোখ বেয়ে অশ্রুধারা নেমে এসেছিল। গলা শুকিয়ে গিয়েছিল। কথা বলার অবস্থায় ছিলাম না। কেবল নিজেকে নিজের মনে বললাম, বাবা তুমি বিশ্বাস করো, আমি তোমাকে ভালবেসে মুক্তি দিতে চেয়েছিলাম, তবে এইভাবে নয়। আমি তো হারাতে চাইনি—হারাতে চাইনি তোমাকে।

দ্য ব্ল্যাডেড স্ট্রিং

ফ্লেচার ফ্লোরা

ঘড়িতে ঠিক তখন কাঁটায় কাঁটায় আটটা।

রাত আটটা।

বৃহস্পতিবার।

শেষ শীতের রাত। চারদিক নির্জন। আসলে শীতের রাত বলেই হয়ত রাস্তায় লোক কম। আবছা কুয়াশায় চারপাশ অস্পষ্ট...আর এই অস্পষ্ট আবছা কুয়াশার মধ্যে মনে হল যেন তিনটে ছায়ামূর্তি।

তিন ছায়ামূর্তি একসময় এসে দাঁড়ালো এনড্রু ম্যাকডের বাড়ির সামনে। ওদের ভালমত চেনা যাচ্ছে না। ওরা পরস্পরের দিকে ঘন হয়ে দাঁড়িয়ে। মনে হয় কিছু একটা বলাবলি করছে। হয়ত ওরা ঠিক করছে—ওদের মধ্যে কে এনড্রু ম্যাকডের দরজার বেলে হাত ছোঁয়াবে।

কে ওরা? কিসের জন্য ওরা এসেছে? শেষ মুহূর্তের শলাপরামর্শ ওদের কি কারণে? মুখগুলো স্পষ্ট দেখতে না পাওয়ার জন্য যা কিছু সমস্যা...যা কিছু অবাস্তব ভাবনা।

এবার পাঠকদের একটু বলে রাখি—কে এই এনড্রু ম্যাকড। কি করেন ভদ্রলোক?

ভদ্রলোক হলেন একজন অধ্যাপক। ইতিহাসের অধ্যাপক হিসাবে স্থানীয় অঞ্চলে তাঁর যথেষ্ট নামডাক আছে। শুধু এইটুকু পরিচয় অবশ্য এনড্রুর বিষয়ে যথেষ্ট নয়। আসলে এনড্রু অধ্যাপক হলেও নিজে একজন ভাল বেহালাবাদক—বাদ্যযন্ত্রের ভাল সমঝদার। প্রায়ই তার ঘরের সামনে দিয়ে গেলে বেহালায় সুরমূর্ছনা শোনা যায়। ভদ্রলোক একাই থাকেন। স্ত্রী গত হয়েছেন বেশ কয়েকবছর। তাঁকে দেখে বয়স অনুমান করা কঠিন। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী এনড্রুকে একঝলক দেখলে যা মনে হয়, তার তুলনায় বয়স তাঁর যথেষ্ট পাকা। তবে একজন ভদ্রলোককে তো আর চটজলদি তার বয়সের কথা জিজ্ঞাসা করা যায় না—তবে যতদূর জেনেছি তাতে তাঁকে মধ্যবয়সী বলাই বাঞ্ছনীয়।

ভাবতে গিয়ে মনে পড়লো—ওহো আজ তো বৃহস্পতিবার। আজ তো ওর কাছে ওর বন্ধুদের আসার কথা। আমি যতদূর জানি, প্রতি বৃহস্পতিবার রাত

আটটার পর এনড্রুর বন্ধুরা একেকজনের বাড়িতে এসে একেকবার হাজির হয়, সেখানে বসে তাদের জোরদার 'মজলিশ'। শোনা যায় তাদের পালা করে বাজনা বাজানোর নমুনা। মনে হয় অধ্যাপক এনড্রু তৈরি ছিল।

অপেক্ষা করছিল আগন্তুক ওই তিন বন্ধুর জন্য। আজ বৃহস্পতিবার ওদের মজলিশ বসার কথা এনড্রুর বাসায়। কাজেই বেলের শব্দ হওয়া মাত্র দরজা খুলে দিলেন এনড্রু।

বন্ধুরা তিনজন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন। এতক্ষণে ওদের মুখগুলো স্পষ্ট দেখা গেল। ওদের পরণে ছিল লম্বা ধরনের পশমের কোট আর মাথায় হ্যাট।

ঘরে ঢুকে তিনজনে আসন গ্রহণ করলেন। এদের মধ্যে যিনি কোণের দিকে বসেছিলেন তাঁর নাম হল ফিলিপস ম্যাসার। ভদ্রলোক অঙ্কের অধ্যাপক। ডানপাশে যার হাতে পাইপ, তার নাম ফেমিল ইসগার। ভদ্রলোক জীববিদ্যার ও ওদের দুজনের মাঝখানে বসে বেঁটেখাটো চেহারার এবেল হুকার হলেন দর্শনের অধ্যাপক।

এনড্রু দরজা বন্ধ করে ওদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। ইসগার মুখ থেকে পাইপের ধোঁয়া উড়িয়ে বললেন—কি ব্যাপার তুমি কি ঘুমিয়ে পড়েছিলে নাকি? দু'দুবার বেল বাজাতে হল।

এনড্রু জবাব না দিয়ে হাসলেন।

—মনে হচ্ছে, তুমি যেন একটু অন্যমনস্ক। কথাটা এনড্রুকে হুকার বললেন।

বুদ্ধিমান এনড্রু এসব কোন প্রশ্নের জটিলতার মধ্যে প্রবেশ করলেন না। কেবল সহজভাবে উত্তর দিয়ে বললেন—সত্যি আমি ভীষণ দুঃখিত। বিশ্বাস করবে কি না জানি না, আজ আমি ভীষণ ব্যস্ত আছি।

বন্ধুরা যে যার মুখের দিকে তাকালেন। এনড্রু ততোধিক সহজ গলায় বললেন—আমার ব্যস্ততার জন্য তোমাদের কাজের কোন ব্যাঘাত ঘটবে না। আয়োজন আমি তোমাদের জন্য করেই রেখেছি দেখেই বুঝতে পারছো।

—তা না হয় বুঝলাম, কিন্তু তোমার ব্যস্ততার কি কারণ ভাই।

—আর বলো না, বেশ কিছুদিন ধরে একটা লেখা মাথার মধ্যে কিলবিল করছিল। ভুলবশত ওটা আজ বিকেলের দিকে লিখতে শুরু করেছি। লাইব্রেরিতে বসে এতক্ষণ লিখছিলাম আর সেই কারণে তোমাদের বেল বাজানো মাত্র আমি উঠে যেতে পারিনি। আর বুঝতেই পারছো, লেখা শেষ না করে উঠলে হয়ত খেই হারিয়ে ফেলবো। তাই বলছিলাম, তোমরা কাজ শুরু করে দাও। আমি মাত্র পনেরো মিনিট তোমাদের কাছ থেকে সময় চেয়ে নিচ্ছি। লেখাটা শেষ করেই আমি ফিরে আসছি।

বন্ধুরা এনড্রুর কথায় বিশেষ আপত্তি করলেন না। তারা জানে, এনড্রুর বেশ কিছু ভাল বই বাজারে চালু আছে। ছাত্রমহলে বইগুলো যথেষ্ট জনপ্রিয়।

হুকার বললেন—পনেরো মিনিটের মধ্যে লেখাটা শেষ করে চলে আসতে পারবে তো।

—হ্যাঁ হ্যাঁ খুব পারবো। প্রায় শেষ করেই এনেছিলাম।

—ঠিক আছে। আমরা বসে পড়ছি। তুমি কিন্তু বেশি দেরি করো না।

—আরে না, বলছি তো পনেরো মিনিট সময় যথেষ্ট।

এনড্রু দেখলেন তার বন্ধুরা মাথার হ্যাট খুলে আসর জমানোর জন্য তৈরি হয়ে নিচ্ছে। এনড্রু তাদের দিকে তার ঘরে রাখা বাড়তি যন্ত্রগুলো এগিয়ে দিলেন। বন্ধুরা খুশি। তারা যে যার জায়গা নেওয়া মাত্র এনড্রু স্বাভাবিক পদক্ষেপে বাইরের ঘর ছেড়ে ভিতরের ঘরে প্রবেশ করলেন। দ্রুত হাতে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন ভিতর থেকে।

তারপর খুব ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন টেবিলের ওপর রাখা নিজের বেহালার বাক্সটার দিকে। প্রথমে দ্রুত হাতে বাক্স খুললেন। বার করলেন বেহালাটা। এরপর বেহালা থেকে খুব আলতোভাবে খুলে নিলেন একটা সতেজ সরু তার। তারটা আঙুলে জড়িয়ে দরজাটা আলতো ভাবে খুলে বেরিয়ে এলেন বাইরে।

চারদিকে একবার ভালভাবে দেখে নিলেন।

না—কেউ লক্ষ্য করেনি তাকে। পিছনের দিকে যে কটা বাড়ি আছে সেই বাড়ির জানলা দিয়ে যদি ওরা কেউ দেখার চেষ্টা করে তবু তারা এই কুয়াশার মধ্যে এনড্রুকে দেখতে পাবে না।

একঝলক নিজের মনে কি ভাবলেন। তারপর দ্রুত পায়ে হাঁটতে লাগলেন।

আশ্চর্য—বন্ধুদের ঘরের ভিতরে বাজনার আসরে মাতিয়ে দিয়ে কোথায় চলেছেন এনড্রু। ওঁর উদ্দেশ্য কি? এত জোর পায়ে তিনি কোথায় যাচ্ছেন? কাজ কি খুব জরুরী?

এবার এনড্রু বড় রাস্তায় এসে পড়লেন। না—মানুষজন কাউকে চোখে পড়লো না। এই ঠাণ্ডায় মানুষ কি বেরুতে পারে রাস্তায়? তাছাড়া মনে হয় অন্য দিনের তুলনায় আজ কুয়াশার দাপটও অনেক বেশি। এত ঘন কুয়াশা যে সামনের কোন কিছু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না।

এনড্রু হাঁটছিলেন।

হাতে মাত্র পনেরো মিনিট সময়—এর মধ্যে তাকে ফিরে আসতে হবে বন্ধুদের আড্ডায়। সামনে ইউনিভারসিটি ক্যাম্পাস। এনড্রু ক্যামপাসের ভিতর প্রবেশ করলেন। যত তিনি অন্ধকার থেকে অন্ধকারের দিকে হেঁটে যাচ্ছেন ততই তার মুখের চেহারাটা বদলে যাচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে কিছু একটা তিনি করতে চলেছেন। এমন কিছু কাজ যে কাজে পাপ আছে...আছে গোপনীয়তা।

এনড্রু আরো জোরে জোরে হাঁটতে শুরু করলেন। ওখানে এই সময় এই

অন্ধকারে শীতের রাতে কেউ এদিকে থাকবে না। দূরে একটা উঁচু টিলা। ওই জায়গায় সামান্য আলো আছে, কারণ ওখানে বসার একটা জায়গা আছে। দিনেরবেলায় অনেক ছেলেমেয়েকে এই নির্জন জায়গায় বসে গল্প করতে দেখা যায়। দেখা যায় গরমের দিনে সন্ধ্যের পর।

এনড্রু নিজেও জায়গাটাকে পছন্দ করেন। এই নির্জন জায়গায় বসে কতদিন তিনি নিকিনির সঙ্গে গল্প করেছেন।

ভারি সুন্দর মেয়ে নিকিনি। দেখতে শুনতে চমৎকার। ঝরঝরে চেহারা—একনজরে যে কোন মানুষের দৃষ্টিকে নিজের দিকে টেনে রাখতে পারে। বয়সে এনড্রুর অর্ধেক বলাই ভাল। তবে মেয়েটির পেশা আদৌ ভাল নয়—সে একজন পেশাদার নর্তকী। শহরের একটা নামী হোটেলে নাচে। এই অঞ্চলে সকলেই চেনে নিকিনিকে।

এনড্রু নিকিনির সঙ্গে প্রথম যখন মেলামেশা শুরু করেছিল তখন ভেবেছিল সম্পর্ক বুঝি ওই মেলামেশাতেই শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু মিশতে গিয়ে এনড্রু নিজেই বুঝতে পারেন যেন তিনি তার মধ্যে কেমন হারিয়ে যাচ্ছেন। বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা ঠিক হচ্ছে না। তিনি একজন অধ্যাপক। বাজারে তার সুনাম আছে। ছাত্র-ছাত্রীরা তাকে শ্রদ্ধা করে। বন্ধুরা সমীহ করে—এই অবস্থায় তিনি চেষ্টা করেছিলেন নিকিনির সঙ্গে সম্পর্কটা সকলের চোখ থেকে আড়াল করে রাখতে। কিন্তু তা কি হয়। ছোট্ট শহর। খবর এখন সকলের মুখে মুখে ফিরছে। আর সেই কারণে এনড্রু ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন নিকিনির সঙ্গে বন্ধুত্বের পর্বটাকে ছিন্ন করতে। কিন্তু ছিন্ন করতে তিনি চাইলে কি হবে—নিকিনি তো চায় না। বরং সে আরও বেশি করে যেন জড়িয়ে পড়তে চাইছে অধ্যাপকের সঙ্গে।

এনড্রুর শরীরটা উত্তেজনায় কাঁপছে। এই ঠাণ্ডার মধ্যে তার শরীরে ঘাম জমেছে। দূর থেকে কিছু যেন লক্ষ্য করার চেষ্টা করলেন এনড্রু। তারপর এদিক ওদিক দেখে নিয়ে এগিয়ে গেলেন সেই উঁচু টিলার পিছনের দিকে।

নিকিনিকে আজ এখানে দেখা করতে বলেছেন এনড্রু। বলেছেন সন্ধ্যে আটটার পর আসতে।

ভাবতে গিয়ে শরীরটা শিরশির করে ওঠে।

কি অসম্ভব দুঃসাহস মেয়েটার। বলে কিনা সে এনড্রুকে বিয়ে করতে চায়। এতবড় একটা কথা সে বলতে পারলো কি করে। মেয়েদের এতটা উচ্চাশা থাকা ঠিক নয়।

প্রথম আলাপেই নিকিনি বলেছিল—আমার আসল নাম নিকিনি নয়। ওটা আমার প্রফেশানাল নাম। আমি একজন নর্তকী। ইমপিরিয়াল হোটেলে আমি নাচি। শহরের সকলে আমায় ওই নামেই চেনে।

এনড্রু বলেছিল—জানি।

—চমৎকার, তো আপনার পরিচয়?

—আমি একজন অধ্যাপক।

—কিসের?

—ইতিহাসের।

—দারুণ, ইতিহাস আমার খুব প্রিয়। আপনি নিশ্চয় ল্যাটিন পড়তে পারেন?

—নিশ্চয়। ল্যাটিন না জানলে ইতিহাসের একটা বড় অংশ জানা যায় না।

নিকিনি যেন আরও অবাক হয়েছিল। বলেছিল, আমার কি পরম সৌভাগ্য, আপনার মত একজন জ্ঞানী মানুষের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছি।

এনড্রুরও কম ভাল লাগেনি সেদিন। তার মত একজন মধ্যবয়সী মানুষের সঙ্গে নিকিনির মত একজন যুবতীর ঘনিষ্ঠতা তাকে যথেষ্ট গর্বিত করে তুলেছিল।

এরপর থেকে প্রায়ই গোপনে ওদের দেখা হত। তারপর ধীরে ধীরে শহরে অনেকের কাছেই ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যায়। এনড্রুর এখন ইচ্ছে নিকিনির সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করতে। কিন্তু নিকিনি নারাজ।

একটা ব্যবস্থা তো করতে হবে। এই ভাবে সকলে তার দিকে সন্দেহের চোখে তাকাবে এটা তার একদম ভাল লাগছে না। ভাল লাগছে না এই ভাবে নিকিনির মত একজন নর্তকীর সঙ্গে তার মেলামেশা নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা আড়ালে আবডালে হাসাহাসি করছে।

প্রথমটায় এতটা গুরুত্ব দেননি এনড্রু—পরে যখন বন্ধুমহলে কথাটা উঠলো তখনই ঠিক করে নিয়েছিলেন আর নয়—সময় থাকতে মেয়েটাকে সাবধান করে দিতে হবে।

কিন্তু সাবধান করতে গিয়ে হিতে বিপরীত ফল হল। এনড্রু দেখলেন নিকিনির অন্য চেহারা।

সে তো ভালভাবেই নিকিনিকে বলেছিল, দেখ নিকিনি আমি ভাবছি আর আমাদের এইভাবে মেলামেশা করা উচিত হচ্ছে না।

নিকিনি অবাক হয়ে বলেছিল—সে কি আমি তো ভাবছি অন্য কথা?

—কি কথা?

—ভাবছি তোমাকে বিয়ে করবো।

—বিয়ে করবে!

—হ্যাঁ আপত্তি কিসের?

—আপত্তি অনেক কিছুর। তার মধ্যে প্রথম আপত্তি হল আমার বয়স।

—দূর তোমাকে কে বলবে বুড়ো। তুমি এখনও যে কোন যুবকের চাইতে

অনেক বেশি তরতাজা। তাছাড়া আমি তো বিয়ে করবো—আপত্তি তো আমার হওয়ার কথা, তোমার নয়।

—না, নিকিনি তা হয় না।

এবার নিকিনিকে বোঝাবার চেষ্টা করলো। কিন্তু কোন বোঝানোতে কোন কাজ হল না। শেষে নিকিনি বেয়াড়া মেয়ের মত আবদার ধরলো—বেশ আমি তোমাকে মুক্তি দিতে পারি, যদি তুমি আমার সঙ্গে আর্থিক বোঝাপড়া করো।

—আর্থিক বোঝাপড়া মানে?

—খুব সহজ। আমাকে তুমি কিছু ডলার দিয়ে দাও, আমি চলে যাই।

এনড্রু চমকে উঠে বললেন—আমাকে তুমি ব্ল্যাকমেল করতে চাইছো?

—মোটেই না। আমি খুব সাধারণ দাবী করেছি। মনে করো আমি একজন প্রফেশানাল মেয়ে। তোমার সঙ্গে দেখা করে আমি যে সময় নষ্ট করেছি, সেই সময়ে আমি অনায়াসে বেশ কিছু ডলার রোজগার করতে পারতাম। তাই বলছি সময়ের ক্ষতিপূরণ হিসাবে আমায় কিছু ডলার দাও—আমি তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি।

—ডলার ধরো যদি না দিতে পারি?

—তাহলে খবরটা শহরে যারা এখনও জানেনি, তারা জেনে যাবে।

এনড্রু একটু গুম হয়ে গেলেন। তারপর বললেন—আমি তোমাকে ডলার কি ভাবে দেব। আমার আয় তো তুমি জানো। একজন অধ্যাপক কত ডলার মাইনে পায়।

—বারে, তোমার তো বাজারে বেশ কিছু বই আছে। ওই বইগুলোর বিক্রি ভাল। তুমি ওই বই বিক্রি থেকে ডলার আমায় দিতে পারো।

নিকিনির নাছোড়বান্দা মনোভাব বেশ একটু বিস্মিত করলো এনড্রুকে। এনড্রু প্রশ্ন করলেন—কত ডলার তুমি চাও?

—খুব সামান্য—দশ হাজার ডলার।

—এত ডলার!

—হ্যাঁ, যদি সাতদিনের মধ্যে এই ডলার আমায় দিতে পারো তাহলে আমি আর তোমাকে বিরক্ত করবো না। আর যদি সাতদিনের মধ্যে না দাও, তাহলে ডলারের অঙ্ক আরও বেড়ে যাবে।

—ঠিক আছে।

সেই শেষ।

তারপর সাতদিন পার হয়ে গেছে। আজ নিকিনি ফোন করেছিল।

—একবার দেখা করুন। দেখা না করলে আপনার বিপদ ; ডলারের অঙ্ক দ্বিগুণ হয়ে যাবে।

—ঠিক আছে, যাব। কোথায় অপেক্ষা করবে?

—ইউনিভারসিটি ক্যামপাসে, যেখানে আমরা দেখা করতে অভ্যস্ত।

—ঠিক আছে, রাত আটটার পর চলে যাব।

এনড্রু তাই নিঃশব্দে বন্ধুদের ঘরে বসিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছিলেন।

হাতে মাত্র সময় পনেরো মিনিট, ইতিমধ্যে অনেকটা সময় পার হয়ে গেছে।

এনড্রু লক্ষ্য করলেন টিলার পিছন থেকে নিকিনিকে।

বসে ছিল। উঠে দাঁড়াচ্ছে। কাউকে খুঁজছে। নিশ্চয় এনড্রুকে। আটটা সাত...আট মিনিট হয়েছে। এত জোর কদমে আসার জন্য হাঁপাচ্ছিলেন এনড্রু।

নিকিনি এবার বসে পড়লো উঁচু বাঁধানো ঢিবিটার উপর। এনড্রু কোটের পকেটে হাত রাখলেন। তারপর নিঃশব্দে উপরে উঠে এলেন পিছন থেকে। নিকিনি টের পায়নি। কুয়াশার ঘন আবরণের মধ্যে নিকিনির পক্ষে ঠাওর করা সম্ভব হয়নি কিছু।

ধীর পায়ে এগিয়ে গেলেন এনড্রু। তারপর পকেট থেকে সরু তারটা বার করে হাতে করণীয় কাজ নিঃশব্দে করে ফেললেন। চিৎকার করার অবকাশ পায়নি নিকিনি। এনড্রু নিজেও ভাবতে পারেনি এত সহজে এতবড় একটা কঠিন কাজ তিনি করে উঠতে পারবেন।

কাজটা নিপুণ হাতে অতি দ্রুত শেষ করে একবার পিছন ফিরে তাকালেন। দেখলেন মাটিতে পড়ে মেয়েটা ছটফট করছে।

মনে মনে হাসলেন এনড্রু...আর কয়েক মুহূর্ত তারপর সবশেষ হয়ে যাবে।

এবার তিনি দ্রুত পা চালালেন।

বাড়িতে তাকে খুব তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। বন্ধুদের বসিয়ে রেখে এসেছেন।

ইউনিভারসিটি ক্যামপাস পার হয়ে কুয়াশা সাঁতরে এনড্রু রাস্তা পার হলেন। তারপর দ্রুত পিছনের সরু গলিপথ ধরে এগিয়ে গেলেন দ্রুতপায়ে। একবার তাকালেন পিছন ফিরে—না কেউ তাকে অনুসরণ করছে না। কেউ দেখতে পায়নি। এবার তিনি খুব সন্তর্পণে দরজা ঠেলে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। তারপর নিজের টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলেন। বেহালা রাখার বাক্সটা যথারীতি খোলা। বেহালাটা আলগা পড়ে আছে। এনড্রু পকেট থেকে তারটা বার করে নিয়ে নতুন করে বেহালায় লাগালেন। না—তারটার কোন ক্ষতি হয়নি, অক্ষতই আছে। তারপর একবার বেহালাটা নিজের হাতে তুলে নিয়ে ভালভাবে পরীক্ষা করলেন। না—কোনকিছু বোঝার উপায় নেই। বেহালার তারটা খুব স্বাভাবিক, কেবল সামান্য একটা জায়গা লাল হয়ে আছে। এনড্রু বুঝতে

পারলেন তারের ওই অংশটাই নিকিনির মত নরম মেয়ের মাংসটা কেটে নিয়েছে। মনে মনে হাসলেন একবার। তারপর অত্যন্ত সহজ ভাবে বেহালাটা হাতে নিয়ে ঘরের দরজাটা খুলে সোজা চলে এলেন বৈঠকখানায়।

এনড্রুর সারা মুখে তৃপ্তির রেখা। দেখে কারো কিছু বোঝার উপায় নেই। এই মুহূর্তে তিনি যেন এক নতুন মানুষ। বন্ধুরা তখন নিজেদের মধ্যে সুর তরঙ্গের সমুদ্রে ডুবে আছে। এনড্রুকে তারা কেউ লক্ষ্য করেনি। এনড্রু নিঃশব্দে এসে ভালমানুষের মত বন্ধুদের মাঝখানে বসলেন। তাকে দেখে কেউ বুঝতে পারলো না সে খানিক আগে কি করে এসেছে। বরং ঘরময় যে সুরের মাদকতা ছড়িয়ে ছিল তার মধ্যে এনড্রু কোন মৃত্যুর গন্ধ পেল না। শুধু সুর...আর রাগ ছড়িয়ে ছিল...ছড়িয়ে যাচ্ছিল ঘরের চারদিকে। সেই রমনীয় সুর আর রাগের ঝঙ্কারে দেবতার মত নিজেকে পরম পবিত্র বলে মনে হতে লাগলো এনড্রুর।

পাইপ স্মোকার

মার্টিন আর্মস্ট্রং

প্রচণ্ড বৃষ্টি, সেই সঙ্গে দুরন্ত বাতাস। বৃষ্টির মধ্যে হাঁটতে ভীষণ অসুবিধা হচ্ছিল। যদিও আমার গায়ে রেনকোট, টুপি সবই ছিল, তবু বাতাসটাকে অসহ্য লাগছিল।

বৃষ্টিতে যে আমি হাঁটতে পারি না এমন নয়। বয়স যখন একটু কম ছিল, কয়েক বছর আগেও এই ধরনের বৃষ্টিকে তোয়াক্কা না করে হাঁটতাম। আজ পারলাম না—এর কারণ একটাই, তা হল হেঁটে যেতে হলে আমার গন্তব্যে পৌঁছবার জন্য আমাকে আরও দশ মাইল পথ হাঁটতে হবে, যা একেবারে অসম্ভব।

অতএব কাছাকাছি একটা বাড়ি দেখতে পাওয়ায় আমি আশ্বস্ত হলাম। ভাবলাম বৃষ্টিতে ওই বাড়িতে গিয়ে একটু আশ্রয় নিলে ভাল হয়।

আমি দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেলাম বাড়িটার দিকে। বাড়িটা খুব একটা জমকালো নয় বরং মন ও চোখ না টানার মত সাধাসিধে। পুরনো দিনের বাড়ি। নিচে একটা ঘর। জানলা দরজা সব বন্ধ। বাড়ির সামনে একটা বাগান। বাগান বলতে বুনো গাছের স্তূপ। গাছের পাতার উপর বৃষ্টির জল পড়ছিল। আমি সেই শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম।

ঘাসের উপর জল জমেছে। কোন কোন জায়গায় কাদা। আমি বাড়ির ধার দিয়ে দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেলাম। আসলে বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচার জন্য আমার এই মুহূর্তে একটা আশ্রয়ের প্রয়োজন।

আমি দ্রুতপায়ে হাঁটছিলাম। লোহার গেট পার হয়ে বাগানের ঝোপ-ঝাড় টপকে যখন হাঁটছিলাম, তখন ভাবতে পারিনি ঠিক ওই সময় আমি কাউকে দেখতে পাব। আপনারা শুনলে হয়ত অবাক হবেন আমি যখন ঝোপগুলোর পাশ দিয়ে কাদা টপকে টপকে হাঁটছিলাম, ঠিক তখনই দেখতে পেলাম ঝোপের মধ্যে থেকে কেউ একজন বেরিয়ে এলো। ধীর পদক্ষেপে সে হাঁটছিল—ঠিক আমি যে দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম সেই দিকে—আমার আগে আগে। প্রথমটায় লোকটাকে দেখে চমকে উঠেছিলাম। দেখলাম বৃষ্টিতে সেও একেবারে ভিজে গেছে। যাকে বলে কাকভেজা। তবু তার ভ্রূক্ষেপ নেই। বাচ্চাদের মত লোকটা যেন জলে ভিজতে ভিজতে হাঁটছে। আমার চমকে ওঠার কারণ ছিল, ওকে যে ওই সময় দেখতে পাব তার জন্য আদৌ তৈরি ছিলাম না।

লোকটা অপেক্ষাকৃত মোটা। পরণে পুরোহিতদের মত ঢোলা লম্বা কোট। মনে হয় ভদ্রলোক স্থানীয় পুরোহিত হবেন। মাথার চুলগুলো ধূসর। ওর কাঁধের দু'পাশে হাতজোড়া অদ্ভুত ভাবে ঝুলছিল। মনে হয় হাত দুটো যেন হ্যাঙারে ঝুলছে।

বন্ধ দরজার কাছে পৌছে লোকটি আমার দিকে ঘুরে তাকালেন। আমি বললাম—দেখুন কিছু যদি মনে না করেন তো একটা কথা বলতে পারি?

ভদ্রলোক তাকালেন।

আমি বললাম—বাইরে যা বৃষ্টি, যদি দয়া করে আমাকে একটু আশ্রয় দেন তো ভাল হয়। বৃষ্টিটা থামলেই আমি চলে যাব। আমার কথায় ভদ্রলোক অবাক হয়ে বললেন—ভারি আশ্চর্য লাগছে মানে আপনি আশ্রয় চাইছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। বৃষ্টির জন্য চাইছি, বৃষ্টিটা থামলেই আমি চলে যাব।

ভদ্রলোক একবার আমার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বললেন—আশ্রয় যখন চাইছেন আমি তো আর ফেরাতে পারবো না। নিশ্চয় পাবেন। আপনি ভিতরে আসুন তাহলে।

ভদ্রলোক বললেন—কোন ভয় নেই আপনার। আপনি স্বচ্ছন্দে আশ্রয় পেতে পারেন। তারপর তিনি দরজাটা ভেজিয়ে দিলেন।

ঘরটা খুব বড় না হলেও বেশ বড়। সাধারণত এতবড় ঘর এখনকার দিনে হয় না। আগের দিনের বাড়ি বলেই ঘরটা এত বড় লাগছে। বাড়িটা যে বহুদিনের পুরনো তাতে কোন সন্দেহ নেই। বড় দেয়ালের গায়ে একটা মাত্র বড় জানলা। জানলাটা পাঁচটা শার্সি বিশিষ্ট। দেখতে জানলাটাকে ধনুকের মত। আসবাবপত্র বলতে ঘরের মধ্যে কিছু নেই। খান দুয়েক চেয়ার একটা লম্বা বেঞ্চি। কোণের দিকে দেখলাম গোল মেহগনি কাঠের টেবিল। টেবিলের উপর একটা বাতিদান। বাতিদানটা অবশ্য নেভানো ছিল।

—আপনি এই চেয়ারে বসুন স্যার।

ভদ্রলোকের ব্যবহারের মধ্যে একটা পুরনো ঢঙ অনুভব করলাম। এমনকি হাসিটি পর্যন্ত। আমাকে বসতে বললেও নিজে কিন্তু বসলেন না। বরং তাঁকে দেখলাম জানলার দিকে এগিয়ে যেতে। বাইরের দিকে তাকিয়ে কি যেন দেখলেন। ওঁর হাত দুটো তখনও কাঁধ থেকে দু'পাশে ঝুলে ছিল। তাঁর দৃষ্টি আমার দিকে ছিল না। আমি তাঁকে পিছন থেকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম। আমার ভীষণ অস্বস্তি লাগছিল। তাই বললাম—আপনি বসবেন না?

—বসবো।

—বাইরে কি খুব বৃষ্টি পড়ছে, নাকি ধরে এসেছে?

ভদ্রলোক আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—বৃষ্টি বৃষ্টির মত পড়ছে।

ভদ্রলোক শরীরটাকে প্রায় একসঙ্গে ঘোরালেন। আমরা সাধারণত এই ভাবে শরীর ঘোরাতে পারি না।

আমি থতমত অবস্থায় পড়ে বললাম—মানে?

—ও কিছু নয়। আপনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হবেন না। এই মুহূর্ত পর্যন্ত আমার বৃষ্টির বিষয়ে কিছু মনে হয়নি।

—কিন্তু আপনি তো দেখছি ভীষণ ভিজে গেছেন? আমি বললাম।

ভদ্রলোক বললেন—তাতে কি হয়েছে। বৃষ্টি হলে লোকে একটু ভেজে।

—তা না হয় ভেজে, কিন্তু আপনার তো উচিত ভিজে পোশাকটা খুলে ফেলা।

ভদ্রলোক বললেন—পোশাকটা আমার যে ভাবে ভিজেছে ঠিক সেই ভাবেই শুকিয়ে যাবে। এখানে মানে, এই ঘরে তো আর বৃষ্টি পড়ছে না।

আমি অবাক হয়ে তাকালাম লোকটার দিকে। আশ্চর্য লোক তো আমি বললাম, এক ভাবে, আর উনি উত্তর দিলেন কি রকম—মানুষ এত নির্লিপ্ত হয় কিভাবে? তবু বললাম—আমি ঠিক সেইজন্য বলিনি, আমি জানি ভিজে জামা গায়ে শুকিয়ে যায়। কিন্তু আপনার শরীর খারাপ হতে পারে তাই বললাম। ভদ্রলোক হো হো করে হেসে বললেন—সত্যি আপনি দেখছি খাঁটি ভদ্রলোক, অন্যের জন্য ভাবতে পারেন। কিন্তু আমি দুঃখিত যে আপনাকে আমি কিছু অফার করতে পারছি না। একজন মহিলা প্রতিদিন এখানে আসেন। ঠিক এই সময় ট্রাম থেকে নামেন। তিনি আজ না আসা পর্যন্ত আমি কিছু করতে পারছি না। তবে হ্যাঁ রান্নাঘরে সব সাজানো আছে, আপনি যদি নিজে করে নিতে পারেন তো আমার কোন আপত্তি নেই।

আমি হেসে বললাম—একটা সিগারেট তো অফার করতে পারেন?

—আমি পাইপ ব্যবহার করি।

কথাটা শেষ করে তিনি পকেট থেকে পাইপ আর তামাক বার করলেন। আমি এটা দেখে স্বস্তি পেলাম যে তিনি তাঁর ওই অদ্ভুতভাবে কোট থেকে ঝোলানো হাতজোড়া ব্যবহার করছেন দেখে। ফলে আমি আমার পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করলাম। একেবারে ভিতরের পকেটে থাকার জন্য রেনকোট ভেদ করে প্যাকেটটা ভিজে যেতে পারেনি। তিনি পাইপ আর আমি সিগারেট ধরালাম। তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন। আবছা আলোয় তাঁকে অস্পষ্ট দেখছিলাম। কেমন শুকনো আধমরা বেচারা।

এবার কোন কথা নেই, চারদিক নির্জন। আবার আমাকে নির্জনতা ভাঙতে হল। চুপচাপ কি বসে থাকা যায়, বিশেষ করে ঘরে যখন একজন আছে। তাই বললাম—ঘরটা বড় ফাঁকা। এতবড় ঘর সে আন্দাজে আসবাবপত্র একটু বেশি থাকা উচিত ছিল।

—তা হয়ত ছিল।

—আপনি কি বেড়াচ্ছিলেন?

—বেড়াচ্ছিলেন! কোথায় বেড়াবো?

—মানে এই ঘরটাই তো বেড়ানোর পক্ষে মনোরম।

ভদ্রলোক হাসলেন। আমার দিকে তাকালেন। তারপর ম্লান হেসে বললেন—আরে না না—এখানে আর বেড়াবার মত জায়গা কোথায়? কি আছে দেখবার? এখানে তো আমি অনেকদিন আছি। তা প্রায় বহু বছর হল। আমার আগে আমার যে পূর্বসূরী, তিনি ছিলেন, তিনি ছিলেন আরও পাঁচবছর আগে থেকে। হ্যাঁ—হিসাব ধরলে তিনি প্রায় মাস সাতেক হল মারা গেছেন। বিশ্বাস করুন—আমি একদম মিথ্যে বলছি না। তার কণ্ঠস্বর অত্যন্ত করুণ বলে মনে হল। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—আমি জানি আপনি হয়ত বিশ্বাস করবেন না, আসলে কেউ বিশ্বাস করে না। আচ্ছা আমি যদি বলি আমি এখানে সাত মাস আছি, আপনি কি বিশ্বাস করবেন?

আমি দ্রুত উত্তর দিলাম। বললাম—যদি তাই হয় তো, তবে আমি আপনাকে বিশ্বাস করবো না কেন? আমার কথায় খুশি হয়ে ভদ্রলোক আমার দিকে এগিয়ে এলেন। তারপর আমার দিকে ডান হাত প্রসারিত করে বললেন—ধন্যবাদ। সত্যি আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ। আপনিই মনে হয় প্রথম একজন ভদ্রলোক, যিনি আমার কথায় এমন উত্তর দিলেন।

কথাটা বলার সময় ভদ্রলোক আমার হাতটা বিশ্রীভাবে ধরলেন। তারপর মুক্ত করে দিলেন। তবে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হল তিনি যেন আরও কিছু বলতে চান। তাই বললাম—আপনি কি আরও কিছু বলতে চান?

—কি করে বুঝলেন?

—আপনার মুখ দেখে।

—চমৎকার। হ্যাঁ আমার সত্যি সত্যি আরও কিছু বলার আছে। এটা বলে আমার দিকে তাকিয়ে তার না বলা কথাগুলো বলতে শুরু করলেন—সত্যি বলতে কি সব কিছুই ঠিকঠাক নিয়মে ভালোই চলছিল, যদি না আমার মানে আমার পূর্বসূরী খুড়ো তাকে এই বাতিটা দিয়ে যেতেন।

—কাকে?

—ভদ্রলোক ছিলেন একজন পুরোহিত, আমার গায়ে এই যে পোশাক দেখছেন এইগুলো হল সবই তার—মানে আমার পূর্বসূরীর।

আমি অবাক হয়ে তার কথাগুলো শুনছিলাম। বিস্মিত না হয়ে পারলাম না। আমাকে অবাক করে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে ভদ্রলোক বললেন, আচ্ছা মশাই আপনি কি স্বীকারোক্তি বিশ্বাস করেন?

—স্বীকারোক্তি। হেসে বললাম—এটা তো একটা ধর্মীয় অনুষ্ঠান, বা আচার—

অনেকটা সংস্কারাশ্রিত। তবে স্বীকারোক্তিতে যে একেবারে বিশ্বাস আমার নেই এমন নয়।

ভদ্রলোক আমার দিকে কয়েক পা এগিয়ে এলেন। তিনি এত কাছে এসে দাঁড়ালেন যে আমার অসম্ভব অস্বস্তি হতে লাগলো। তিনি ওইভাবে দাঁড়িয়ে আমাকে নিশ্বাসে বিদ্ধ করে বললেন—আচ্ছা—আপনি কি আমার কোন পাপ, মানে অতি ভয়ানক যদি কোন স্বীকারোক্তি আমি দিই তবে কি সে সব আপনি বিশ্বাস করবেন।

আমি একটু অবাক হলাম। মনে মনে ভাবলাম ভদ্রলোক আমাকে কি বলতে চান? কোন্ পাপ? কি ধরনের পাপ সেটা? মনে হয় ব্যাপারটা খুব সাংঘাতিক? শোনাই যাক না—এই বৃষ্টির মধ্যে কিছুটা সময় তো তবু কাটবে। তাই বললাম সহজ গলায়—দেখুন স্বীকারোক্তি জিনিসটার একটা গুরুত্ব আছে। এতে আর কিছু হোক বা না হোক মনের মধ্যে জমানো কথাগুলো বার করে দিয়ে অনেক হালকা হওয়া যায়।

—সত্যি আপনি মহানুভব। এমনভাবে কথা বলতে কাউকে শুনিনি। কথাটা বলে ভদ্রলোক তাঁর একটা হাত ভারি অদ্ভুতভাবে মাথার ওপর তুললেন। তারপর বললেন—আপনার হাতে কি সময় আছে? মানে আমি যা বলবো তা শোনার মত সময় বা ধৈর্য আছে। হেসে বললাম—এখনও বাইরে বৃষ্টি পড়ছে, অতএব যদি কিছু বলার থাকে তো আপনি বলতে পারেন।

আমার কথায় খুশি হয়ে ভদ্রলোক একেবারে আমার পাশ ঘেঁষে বসলেন। যাকে বলে একেবারে শরীর ছুঁয়ে বসা। ওর হাঁটুটা আমার পা স্পর্শ করছিল। আমি অস্বস্তি বোধ করলাম। বললাম—দেখুন, কোন কিছু ভালভাবে জানতে বা শুনতে হলে মুখোমুখি বসাটাই ভাল। এতে আমরা পরস্পর পরস্পরকে সর্বক্ষণ দেখতে পাব। তারপর একটু থেমে বললাম—সামনে তো একটা বেঞ্চি আছে, তাই বললাম।

ভদ্রলোক আমার কথায় খুশি হলেন না দুঃখিত হলেন ঠিক বুঝলাম না। তবে উঠে দাঁড়িয়ে আমার পাশ থেকে গিয়ে সামনের বেঞ্চিতে বসলেন। তারপর কিছুক্ষণ চুপচাপ। লক্ষ্য করছিলাম তিনি বার বার জানলার ধারে দরজাটার দিকে তাকাচ্ছেন। মনে হয় কিছু একটা দেখার চেষ্টা করছিলেন। তারপর একসময় নৈঃশব্দতা ভেঙে বললেন—আপনাকে যা বলবো সেটা একেবারে আমার একান্ত ব্যক্তিগত। মানে একরকম গোপনীয় কথা বলতে পারেন।

—কি ধরনের গোপনীয় কথা?

—ধরুন কোন খুনের ঘটনা। আমার একটা খুন করার অভিজ্ঞতার ঘটনা। আমি তো একজন খুনী।

আমি চমকে উঠলাম। অবাক হয়েছিলাম। তার হাবভাব, গল্প বলার ধরন

সবকিছু আমার কাছে সন্দেহজনক বলে মনে হচ্ছিল। ভয় যে আমি একেবারে পাইনি তা নয়। খুব ভয় পেয়েছিলাম। তবু যখন বুঝলাম এখান থেকে এই মুহূর্তে চলে যাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই, তখন আমি নিজেকে সামলে নিয়ে সহজ ভাবে বললাম—কি হল শুরু করুন?

—তাহলে বলবো। শুনতে রাজি তো? দেখুন ধৈর্য আছে তো শোনার মত?

আমি ঘাড় নেড়ে বললাম—আছে।

ভদ্রলোক মুখ থেকে তার পাইপটা নামিয়ে সামনের ছোট টেবিলটার উপর রাখলেন।

তারপর বলতে শুরু করলেন : এই যে বাড়িটা দেখছেন, এই বাড়িটার শর্তই হচ্ছে এর জন্য দায়ী। যদি এই বাড়ির শর্ত না থাকতো তাহলে হয়ত এমন ঘটনা সত্যি ঘটতো না। আগেই বলেছি আমাদের সবকিছু ঠিকঠাক চলছিল। আমি মানে আমার পূর্বসুরী যদি তিনি এই বাড়িতে না আসতেন, তাহলে আমাকে কষ্ট করে এই ঘটনায় জড়াতে হত না। সত্যি বলতে কি আমার পূর্বসুরী আদৌ সুখী লোক ছিলেন না। নিজের পরিধির মধ্যে তিনি সব সময় সন্দেহজনক ও নির্বান্ধব অবস্থায় বাস করতেন। সেই কারণে তিনি প্রথম এই বাড়িতে উঠে আসেন এবং বাস করতে থাকেন। পরীক্ষামূলক ভাবে থাকার জন্য। দলিলে অবশ্য তিনি এই বাড়িটা ছাড়া আর কিছুই পাননি। অর্থকরি ও আসবাবপত্র কিছুই না। এখানে আসবার পর তিনি দু-একটা জিনিস কিনতে শুরু করেন। ঐ যে টেবিলটা দেখছেন এই বেড...এই ছোট গোলটেবিল, আর সেই সঙ্গে রান্নার কিছু সরঞ্জাম আর সঙ্গে আনেন একটা ভাঁজ করা বিছানা। আসলে তিনি চেয়েছিলেন ধীরে ধীরে বাড়িটার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে। সব বাড়ি তো সমান হয় না—সকলের মনের মত বাসযোগ্য নাও হতে পারে। আপনি হয়ত জানেন কিছু কিছু বাড়ি আছে, যেগুলো ঠিক বাসযোগ্য নয় আর কিছু বাড়িতে নির্দ্বিধায় বাস করা যায়। আসলে সেই দিক দিয়ে বিচার করে তিনি নিশ্চিত হতে চেয়েছিলেন। কথাগুলো বলে ভদ্রলোক তাকালেন আমার দিকে। তারপর উপদেশ দেবার ভঙ্গিতে বললেন, আপনাকে আমি একটা কথা বলি বন্ধু, সব সময়ে মনে রাখবেন কোন বাড়িতে যাওয়ার আগে সেই বাড়িটার ব্যাপারে একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে নেওয়া। দেখে নেওয়া বসবাসের উপযুক্ত কিনা। আমি তাঁকে সমর্থন করে বললাম—ঠিক কথা। বিশেষ করে পুরনো বাড়ির ক্ষেত্রে। নোনাধরা দেয়াল, ভাঙাচোরা খোপখাপ সত্যি সত্যি সন্দেহজনক।

ভদ্রলোক আমার কথায় অদ্ভুতভাবে সমর্থনসূচক ঘাড় নাড়লেন।

—ঠিকই বলেছেন, তবে আমি সে কথা বলতে চাইছি না। আমি বলছি বাড়ির মধ্যে তো অনেক সময় অনেক অপদেবতা থাকে। মানে সেই রকম কোন অপদেবতা আছে কি না। একটু থেমে তিনি আমার দিকে ঝুঁকে বললেন, আপনি

কি কিছু অনুভব করতে পেরেছেন? মানে আমি বলছি বাড়িটা খুবই সন্দেহজনক। আপনার কি সেইরকম কিছু মনে হচ্ছে? আমি সহজভাবে বললাম—কই না। সেরকম তো কিছু মনে হচ্ছে না। তবে পুরনো বাড়ি একটু সন্দেহজনক হবে বইকি?

—আপনি কি কিছু লক্ষ্য করেছেন?

—কী?

—সন্দেহজনক কিছু?

আমি ওর দিকে তাকালাম। আশ্চর্য এতক্ষণ তো কিছু অনুভব করিনি। এখন লোকটা বলার পর একটা ভয় ভয় ভাব অনুভব করলাম। পরক্ষণে মনে হল ওটা কিছু নয়—ওটা মনের বিকার। তাই বললাম—কই কিছু তো চোখে পড়ছে না। কেবল বাড়িটা ফাঁকা। আর পুরনো।

—আশ্চর্য এখনো আপনি কিছু টের পাননি। আর এটাও ঠিক, আমি মানে আমার পূর্বসুরী—তিনিও প্রথমটা আপনার মত কিছুই টের পাননি। কিন্তু সত্যি বলতে কি গোটা বাড়ির মধ্যে এই যে ঘরটা—এই ঘরটাই সবচেয়ে ভয়াবহ। এই ঘরই হল রহস্যময়।

এবার সত্যি আমার কেমন যেন অস্বস্তি বাড়তে লাগলো। মনে হল এই বাড়িটায় এসে ভুল করেছি। আমার উচিত ছিল বৃষ্টিতে ভিজে অন্য কোথাও চলে যাওয়া। আমার কিন্তু লোকটাকে আর ভাল লাগছিল না।

বাইরে বৃষ্টি তখনও অঝোরে পড়ে চলেছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের ঝিলিক ঘরে আসছে। বৃষ্টিটা চট করে যে ধরার নয় বুঝলাম।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে তিনি বললেন—আমি আপনাকে কিছু একটা জিনিস দেখাতে পারি। এই ঘরের আসল রহস্যময় জিনিসটা। যা অন্ধকার ছাড়া ভাল দেখা যায় না। আমার মনে হয় এখন সেই সময় উপস্থিত হয়েছে। চারদিক অন্ধকার হয়ে এসেছে।

কথাটা বলে তিনি ঘরের কোণের দিকে রাখা ছোট টেবিলটা এগিয়ে আনলেন। টেবিলের উপর একটা বাতিদান। এবার তিনি বাতিদানটা হাতে নিয়ে ছোট টেবিল থেকে এগিয়ে নিয়ে গেলেন বড় টেবিলটার দিকে। বাতিদানটা তার উপরে বসালেন। গোটা ঘরটার মধ্যে চাপা একটা থমথমে ভাব। আমি ভয় পেতে শুরু করলাম। সংকুচিত হয়ে পড়লাম। এবার তিনি আমাকে নির্দেশ দিলেন বড় টেবিলটার উপর উঠে বসতে। আমি ভদ্রলোকের কথামতো তাই করলাম। এবার তিনি ভেজানো জানলার পাঁচটি শার্সি উন্মুক্ত করে দিলেন। তারপর আমার দিকে পিছন ফিরে এবার তিনি ভেজানো কাঁচের উপর হাত ছুঁয়ে বললেন—বেশ এবার বলি শুনুন, তারপর পূর্বসুরী তিনিও এই টেবিলের উপর ঠিক ওইভাবে বসেছিলেন। এইভাবেই বই পড়তেন। খাওয়াদাওয়া করতেন।

কথাটা বলে তিনি পিছিয়ে গেলেন। তারপর আপশোসের সুরে বললেন—খবরদার একদম নড়াচড়া করবেন না, ঠিক যখন বলবো তখন কেবল পিছন দিকে তাকাবেন। তারপর আমাকে বললেন—কিছু দেখতে পাচ্ছেন?

আমি কাঠের পুতুলের মত বসেছিলাম।

একসময় ভদ্রলোক নির্দেশ করলেন। আমি পিছন ফিরে তাকালাম। বললেন—কিছু দেখতে পাচ্ছেন?

—একটা জানলা দেখতে পাচ্ছি।

—আর কিছু চোখে পড়ছে না?

—না, আমার তো আর কিছু চোখে পড়ছে না। গোল জানলার পাঁচটি শার্সি ছাড়া।

—ঠিক—ঠিক বলেছেন। সেও প্রথম প্রথম এই রকম দেখতো। এরপর তিনি কি দেখতে পেলেন জানেন, যখন সে একা একা বসে খাওয়াদাওয়া করতো—সে দেখতে পেত আরও পাঁচজনকে। তারাও তার মত খাওয়াদাওয়া করছে। যখন তিনি জল খেতেন তখন সেই পাঁচজন জল খেত। যখন তিনি সিগারেট ধরাতেন, তখন তারা পাঁচজন সিগারেট ধরাতো।

আমি হেসে বললাম—সত্যি।

ভদ্রলোক একটু থেমে বললেন, তার নাম জেমস কক্‌সটার। তাকে সকলে ওই নামেই চেনে। আপনিও নামটা মনে রাখবেন। যদি কেউ জানতে চায় এই বাড়িতে কে থাকেন, তাহলে বলবেন—রেভারেণ্ড জেমস কক্‌সটার। আসল কথাই কিন্তু কেউ জানে না—কেউ না।

—কি আসল কথা?

—আপনাকে যা বলেছি এবং যা বলবো, কাকপক্ষী কেউ যেন না জানে—মনে রাখবেন আপনিই প্রথম।

তার কণ্ঠস্বর আমাকে শিহরিত করলো। তিনি বললেন—কেউ জানে না, এমনকি মিসেস বোলস পর্যন্ত জানেন না, যিনি আমার পূর্বসূরীকে দেখাশোনা করতেন। তিনি আমাকেই চেনেন। তার মনে এই ব্যাপারে কোন সন্দেহ পর্যন্ত হয় নি।

আমি সবিস্ময়ে বললাম—বলেন কি কোন সন্দেহ তার মনে হয়নি?

—না। সে জানে আমিই সে—সে মানে আমার পূর্বসূরী। একটু হেসে বললেন—আসলে কি জানেন আমাদের দুজনকে দেখতে প্রায় একই রকম। মানে হুবহু একরকম বলতে পারেন। আপনাকে আমি তার একটা ছবি দেখাবো যা দেখলে আপনি সহজে বুঝতে পারবেন। তবে এখন নয়, ছবিটা দেখাবো আপনি চলে যাওয়ার আগে।

ওর কথাগুলো আমার কেমন যেন সন্দেহজনক বলে মনে হচ্ছিল। ইচ্ছে করছিল উঠে চলে যাই—কিন্তু বাইরে যা বৃষ্টি চলে যাওয়ার উপায় নেই। আমি তবু ওখান থেকে উঠি উঠি ভাব করার চেষ্টা করলাম। আমার ভাবসাব দেখে ভদ্রলোক বললেন—উঁহু এখন উঠবেন না। এখনও আসল কথায় আসিনি। কেবল শুরু করেছি মাত্র। আমি বিশ্বাস করি আমার কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আপনি অপেক্ষা করবেন।

অগত্যা কি আর করি বসতে হল। বেঞ্চিতে তিনি আবার আগের মত বসতে বললেন—আমি মানে পূর্বসুরী এখানে বসেই খাওয়াদাওয়া সারতেন। আর দেখতে পেতেন ঠিক পাঁচজন তারই মত একইরকম অঙ্গভঙ্গি করছে। ব্যাপারটা কি রহস্যময় নয়?

আমি হেসে বললাম—এতো খুব স্বাভাবিক ব্যাপার।

—কেন?

—ওটা তো প্রতিবিম্ব ছাড়া আর কিছুই নয়।

সে তাকালো। তারপর ধীর গলায় বলল—ঠিক তাই। সত্যি এটাই খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। তার কাছেও স্বাভাবিক বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু তারপরেই সেই আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছিল।

—কি ঘটেছিল?

—সেই কথাই তো বলবো এবার। একদিন তিনি মানে আমার পূর্বসুরী এই জায়গায় বসে একটা সিগারেট ধরালেন। এবং সেই প্রথম তিনি দেখতে পেলেন পাঁচটি ছায়ার মধ্যে একটি—একবারে বাঁদিকের কোণের ছায়াটির ঠোঁটের কোলে পাইপ আর বাকি চারজনের ঠোঁটে সিগারেট জ্বলছে।

তার কথা শেষ হতে না হতে আমি হেসে উঠলাম। বললাম—এই ব্যাপার। আমি জানি—বুঝেছি কি হয়েছে। লোকটি বললেন—সে বোঝেনি কি হয়েছে। ব্যাপারটা যে একটা মজার এটা আমি জানি। কিন্তু সত্যি বলুন তো ব্যাপারটার মধ্যে ভয় পাওয়ার মত কিছু ছিল কিনা। হঠাৎ করে আপনি যদি এই রকম ঘটনা দেখতেন তাহলে কি ভয় পেতেন না। বললাম নিশ্চয় পেতাম।

তার ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল। এই ব্যাপারটার মধ্যে সে অলৌকিক ব্যাপার দেখেছিল। সত্যি ভয়াবহ। আমি বললাম—আচ্ছা এসব ঘটনা আপনার সেই পূর্বসুরী মানে রেভারেণ্ড জেমস কক্‌সটারের তো। এসব কথা আপনি জানলেন কি করে? আমার কথার পর তার চোখ জোড়া জ্বলে উঠলো। বললেন দৃঢ় গলায়—আমি জানি—হলফ করে বলতে পারি সে ভীষণ ভয় পেয়েছিল।

—যদি তাই হত তাহলে একা একা এই ঘরে তিনি কিছুতেই থাকতে পারতেন না।

—তারও হয়ত সেই রকম ইচ্ছে ছিল। কিন্তু তার আগেই ঘটনাটা ঘটে গেল।

—কি ঘটনা?

বক্তার কণ্ঠস্বর আগের তুলনায় আরও দৃঢ় হল। বললেন—পাঁচটা দিন কোন রকমে কাটালো। কিন্তু সেই রাত্তিরে—তিনি দেখতে পেলেন সেই পঞ্চম প্রতিবিম্বটা হঠাৎ জানলার শার্সি থেকে উধাও হয়েছে।

—উধাও হয়েছে? কোথায় গেল?

—তা আমি জানি না। কেবল তাকে আর জানলায় অন্য চারজনের সঙ্গে দেখা গেল না। ভেঙেচুরে উধাও হয়ে গেল।

আমি ঢোক গিলে বললাম—তারপর?

—তারপর আর কি তিনি ভয় পেতে শুরু করলেন। আমার পূর্বসূরী ভাবতে লাগলেন এই ঘরের মধ্যে সেই ভয় ভয় মূর্তিটা তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে। তিনি পালাতে পারলেন না। কেবল মনে হতে লাগলো শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। একজোড়া হাত তাঁকে সাপের মত পেঁচিয়ে ধরেছে। ঠিক—ঠিক এই ভাবে—এই বলে তিনি নিজের হাতদুটো দিয়ে নিজের গলা চেপে ধরলেন। বীভৎস সেই মুখ—চাউনি। হাতদুটো শক্ত হয়ে উঠেছে। কেবল বলতে লাগলেন—ঠিক—ঠিক এইভাবে, এইভাবে তাঁর শ্বাসরুদ্ধ হয়ে এলো। আমি ভয়ার্ত কণ্ঠে বললাম—আপনি কি বলতে চান ওই হাতদুটো পঞ্চম প্রতিবিম্বের?

—হ্যাঁ, তাছাড়া আর কার হবে। আমার দিকে তিনি উজ্জ্বল চোখে তাকালেন। তারপর বললেন পাতা কাঁপার মত স্বরে—হ্যাঁ, ওই হাত তো আমার—আমার হাত।

এই প্রথম আমি চমকে উঠলাম। বললাম অস্ফুট স্বরে—আপনি তাহলে সেই পঞ্চম প্রতিবিম্ব?

—হ্যাঁ। আমি ছাড়া আর কে হবে? আমি তো সেই পাইপ স্মোকার।

আমি উঠে দাঁড়ালাম।

দ্রুত এগিয়ে গেলাম দরজার দিকে। আমার শরীরময় অদ্ভুত অনুভূতি ছড়িয়ে আছে। ভদ্রলোক একটু একটু করে আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। চেষ্টা করলাম পালাতে। কিন্তু পারলাম না। পারলাম না শেষ কৌতূহল দমন করতে। তাই বললাম—যদি তাই হয় তো, তাহলে আপনি সেই শরীরটাকে নিয়ে কি করলেন?

মুহূর্তে তিনি নিজের বুকের উপর খামচে ধরলেন। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে দ্রুত নিজের পরণের পুরোহিতের মত গায়ে দেওয়া কোটের বোতামগুলো খুলে ফেলে নিজের বুকের উপর আঙুল ঠেকিয়ে বললেন—এই তো সেই শরীর

দ্য ক্রুকেড লাইটিং

আর্লি স্ট্যানলী গার্ডনার

ট্যাকসি থেকে নেমে খানিক এদিকওদিক তাকালেন মিস্টার বব ফেয়ারফিল্ড। তারপর খুব ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে গেলেন রেল প্ল্যাটফর্মের দিকে। দূরে ভ্রমণে তাঁকে প্রায়ই বেরতে হয়। আর তাঁর অভিজ্ঞতা দূর ভ্রমণের সঙ্গে বেশি মালপত্তর বহন না করাই শ্রেয়। বাঁ হাতে নিজের ব্যাগটা ধরে খুব সহজভাবে হাঁটছিলেন বব ফেয়ারফিল্ড।

একসময় তিনি এসে পৌঁছলেন এগারো নম্বর কামরায়। গেটম্যানকে নিজের নম্বরটা বলে কামরায় উঠে পড়েন। তার মাত্র কয়েক মিনিট পরেই গেট বন্ধ হয়ে যাবে। ট্রেন ছুটবে সাঁই সাঁই করে। ইতিমধ্যে প্রায় সব প্যাসেঞ্জারই কামরায় উঠে পড়েছেন।

লম্বা বার্থগুলোতে অনেকেই বিছানা পেতে ফেলেছেন। কেউ কেউ আবার ছিটিয়ে ছড়িয়ে বসে আছেন। এক নজরে চারপাশ দেখে নিয়ে বব ফেয়ারফিল্ড নিজের জায়গায় বসে একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। তারপর খুলে নিলেন নিজের কোট, হ্যাট। ব্যাগটা তখন নিজের কোলের উপর। এক সময় চারপাশ দেখতে দেখতে ববের দৃষ্টিটা থমকে গেল! চমকে উঠলেন তিনি।

কি সর্বনাশ! এ যে স্নিক সিমস।

লোকটা কি তবে কোন খবর পেয়েছে। সাংঘাতিক ব্যাপার। এর দৃষ্টি এড়ানো তো ভারি কঠিন। কেন্টের একজন নামকরা জুয়েল থীফ হল এই স্নিক সিমস।

নামটা সবাই জানে। তবে চেনে তাকে অল্পজন। বব ফেয়ারফিল্ড কিন্তু সিমসকে দেখা মাত্র নিজের ডানহাত বাঁ বগলের নিচে নিয়ে যায়। স্পর্শ করে চামড়ার হলস্টারে রাখা পিস্তলের বাঁট।

বব অত্যন্ত সতর্ক। কোথাও গেলে সঙ্গে ওটা নিতে ভোলেন না। মনে মনে তিনি নিজেকে তৈরি করে নেন। যদি ওই শয়তান সিমস তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তবে তার ডানহাতে ধরা বস্তুটাকে সদব্যবহার করতে হবে।

আচ্ছা সিমস কি তাকে চেনে?

নিশ্চয় চেনে। যারা শহরের বিখ্যাত জুয়েল থীফ তারা বড় বড় রত্নব্যবসায়ীদের চিনে থাকে কিন্তু রত্নব্যবসায়ীদের পক্ষে এই সমস্ত ধুরন্ধরদের চেনা সহজ নয়। তবু

সিমসকে বব চিনে ছিলেন। দেখেছেন একবার। বন্ধু পুলিশ অফিসার পর্দার আড়াল থেকে সিমসকে চিনিয়ে দিয়েছিলেন।

পুলিশের লোকেরা তখন আসামীদের প্যারেড করাচ্ছিল। ববকে যে ওইদিন সিমস দেখতে পায়নি এটা সে একেবারে নিশ্চিত।

বব জানে সিমস লোকটা কী রকম সাংঘাতিক। গোটা শহরে তার এত নাম ডাক অথচ পুলিশ তাকে ধরেও কিছু করতে পারে না। বারবার প্রমাণের অভাবে সে বেকসুর খালাস হয়ে যায়।

আসলে সিমস এর চুরি করার ধরনটা একেবারে অন্য রকম। একভাবে সে কখনও চুরি করে না। তার প্রতিটি চুরির ধরনের মধ্যে অভিনবত্ব থাকে। ফলে তাকে হাতেনাতে ধরা খুব কঠিন। এইরকম একটা সাংঘাতিক লোককে একই কামরায় ট্রেনের যাত্রী হতে দেখে বেশ ভয় পেয়ে গেলেন বব ফেয়ারফিল্ড।

বব ফেয়ারফিল্ড কেন ভয় পাচ্ছেন, এবার সে কথায় আসি। আসলে ভদ্রলোক চলেছেন অর্ডার মত দামী রত্ন নিয়ে সাপ্লাই করতে। খদ্দেরের সঙ্গে কথা বলতে।।

. একবার ভাবলেন ট্রেন থেকে নেমে গেলে কেমন হয়। পরের ট্রেনে যাওয়াই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু এসব ভাবনা বড় দেরি হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে দরজার সাটার বন্ধ হয়ে গেছে। ট্রেন ছুটতে শুরু করেছে।

বব জানে ট্রেন বড় একটা দাঁড়াবে না। মাঝখানে একবার মাত্র ট্রেন দাঁড়াবে সান্তাবারবারায়। তারপর আবার হু হু করে চলবে...গোটা কয়েক টানেল পার হয়ে তারপর এসে পৌঁছবে লসএঞ্জেলসের আর্কেড স্টেশনে।

ফেয়ারফিল্ড কি যেন ভাবলেন। তারপর খুব দ্রুত নিজের জায়গাটা বদলে নিলেন।

আশ্চর্য বব দেখলেন সিমস সীট বদলে নিয়েছে। খানিক আগে বব যেখানে বসেছিলেন ঠিক সেই জায়গায় এসে বসেছে সিমস। বাঘ যেমন করে শিকারিকে অনুসরণ করে গুটি গুটি পায়ে নিঃশব্দে এগিয়ে যায় সিমস যেন ঠিক সেই ভাবে তার দিকে এগিয়ে আসছে। অথচ ভাবটা এমন যেন সে ববকে লক্ষ্য করেনি। কি প্রচণ্ড উদাসীনতা। বব দেখতে পেল সিমস অন্যদিকে তাকিয়ে তার আঙুলের নখগুলো খুঁটছে।

বাইরে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। জানলাগুলো বন্ধ করে দেয় প্যাসেঞ্জারেরা। বব একঝলক দেখে নেয় গোটা কামরার চেহারাটা। খুব বেশি লোক নেই। বার্থগুলো যথেষ্ট ফাঁকা। মনে হয় হঠাৎ ঝড় বৃষ্টি হওয়ায় অনেকে উঠতে পারেনি।

বব দেখতে পেল সিমস এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। অথচ একবারের জন্য তাকে লক্ষ্য করছে না। মনে হয় এটা একটা কৌশল। মনে হয় সিমসের লক্ষ্য অন্যদিকে। সেকি তবে অন্য শিকারের সন্ধানে উঠেছে? এবার বব তৎপর হলেন। দেখতে

পেলেন বারো নম্বরের নিচের বার্থে একটি মেয়ে আছে। মেয়েটি সুন্দরী। হাতের ভ্যানিটি ব্যাগটা আঁকড়ে ধরে আছে। সিমস ওকে দেখছে। যেন গিলে খাচ্ছে মেয়েটাকে। মেয়েটা আরষ্ট ভঙ্গিতে বসে আছে। মুখটা শুকিয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। তবে কি মেয়েটাকে সে নজর করছে?

হয়ত...মেয়েটা মনে হয় ভীষণ ভয় পেয়েছে। আহারে, এমন একটা সুন্দরী মেয়েকে আমার একটু সাহায্য করা উচিত ছিল এই সময়। মেয়েটা তো জানে না সিমসের চরিত্র। দেখে ভাবতে পারে বড়লোকের ছেলে। নামী ব্যবসায়ী। সুন্দরীর কপালে কি দুর্ভোগই না আছে।

আবার পরক্ষণে মনে হল নিজের কাছে গচ্ছিত থাকা রত্নগুলির কথা। ওগুলো বাঁচাতে হবে। আপনি বাঁচলে বাপের নাম। কি দরকার অযথা অন্যের ব্যাপারে নাক গলানোর। তাছাড়া ট্রেনে যাতায়াতের পথে বব বড় একটা কারো সঙ্গে কোন কথা বলে না। এটা বরাবরের অভ্যাস।

খানিকবাদে টিকিট চেক করার জন্য কনডাকটর এলো। ববের কাছে ভদ্রলোক আসা মাত্র বব তাকে ফিসফিস করে বললেন—দেখুন আমি আপনাকে একটা কথা বলতে চাই।

—কি বলুন। এবার বব ফেয়ারফিল্ড নিজের পরিচয় দিয়ে কনডাকটরকে সব কিছু বললেন। বললেন তার দুশ্চিন্তার কথা। তারপর বললেন—আমি চাই আমার এই নিচের বার্থের রিজার্ভেশন ক্যানসেল করে অন্য কোন কামরায় কোন ড্রইংরুম ভাড়া নিতে।

কনডাকটর কি যেন ভাবলেন। তারপর বললেন—সরি স্যার। অন্য কোন কামরায় তো আমি আপনার ব্যবস্থা করে দিতে পারবো না। এই কামরায় একটা মাত্র ড্রইংরুম ফাঁকা আছে। প্রয়োজনে আপনি ব্যবহার করতে পারেন।

বব ফেয়ারফিল্ড রাজি হলেন। বললেন—ঠিক আছে আপনি ব্যবস্থা করে দিন। আসলে আমি চাইছি এমন একটা রুম যাতে আমি ভিতর থেকে লক করে দিতে পারি।

—তা পারবেন কোন অসুবিধে হবে না। তবে আমার কথা হল মশাই এত মূল্যবান রত্ন সামগ্রী নিয়ে এই ট্রেনে যাতায়াত করাটা ঠিক নয়।

—আমি তো বরাবরই ট্রেনে যাতায়াত করি। আমি কখন কোথায় যাচ্ছি এই খবর কেউ জানে না। আমার মনে হয় ওই লোকটা আমার অফিসের কারো কাছ থেকে খবরটা সংগ্রহ করেছে। তবে একবার ওই ড্রইংরুমে ঢুকে গেলে আমার কাছ থেকে ওর ব্যাগটা টেনে নিয়ে পালানো সোজা ব্যাপারটা হবে না। তার জন্য আমি প্রস্তুত।

—ঠিক আছে। আপনি নিজে খুশি তো।

—হ্যাঁ।

পকেট থেকে ডলার বার করে বব ফেয়ারফিল্ড তার নতুন বুক করা ড্রইংরুমের ভাড়া মিটিয়ে দিলেন। কনডাকটর রসিদ দিল না।

ফেয়ারফিল্ড ভিতরে প্রবেশ করে দরজায় লক করে দিলেন। ঝড় বৃষ্টির রাত। ট্রেন ছুটে যাচ্ছে।

এতবড় একটা শিকার হাতছাড়া হল অথচ জুয়েল থীপের কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। একবারের জন্য সে তাকালো না বব ফেয়ারফিল্ডের দিকে। তার লক্ষ্য সামনে বসে থাকা মেয়েটার দিকে।

মেয়েটা সুন্দরী সেকথা আগেই বলেছি। যে কোন লোকের দৃষ্টি টানতে পারে। একাই যাচ্ছে। মনে হয় মেয়েটি যথেষ্ট স্বনির্ভর। তবু রাতের ট্রেন। ফাঁকা কামরা। মেয়েটির ভয় পাওয়াই স্বাভাবিক। তাছাড়া ওকে যে ভাবে দু'চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে সিমস লক্ষ্য করছে তাতে মেয়েটি যেন ক্রমশ বস্ত্রহীন হয়ে উঠছে।

দরজা লক করে বব ফেয়ারফিল্ড পোশাক বদলে নিলেন। তারপর শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলেন মেয়েটির কথা। আহা মেয়েটির কি না বিপদ। কি জানি একা পেয়ে ওকে এই রাতের ট্রেনে কি না বিপদে ফেলে সিমস। মেয়েটা বুদ্ধিমতী—ঠিক বুঝতে পেরেছে সিমসের মতলব ভাল নয়। লোকটা নোংরা। তাই ভয় পাচ্ছে। তবে কি জুয়েল থীপ সিমস তাকে ফলো করার জন্য ওঠেনি...উঠেছে ট্রেনে মেয়েটার জন্য? মেয়েটার কাছে কি আরো কিছু মূল্যবান রত্ন আছে? মেয়েটা যেভাবে নিজের ভ্যানিটি ব্যাগ আঁকড়ে ধরে আছে, তাতে মনে হয় ওই ব্যাগে মূল্যবান কোন সম্পদ আছে।

একবার মনে হল মেয়েটিকে সাবধান করে দিলে ভাল হত? কিন্তু কিভাবে করবে...সিমস তো ওকে দু'চোখের মধ্যে ধরে রেখেছে। অন্য সময় হলে বব মেয়েটিকে নিজের রুমে এনে আশ্রয় দিতেন। কিন্তু আজ আর নয়। আজ তার নিজের নিরাপত্তা সব থেকে বেশি দরকার। অতএব মন থেকে সমস্ত চিন্তা দূরে সরিয়ে রেখে নিজে টানটান হয়ে শুয়ে পড়লেন। হাতের কাছে রাখলেন রত্ন ভর্তি ব্যাগটা। মনে মনে বললেন, ওহে সুন্দরী মেয়ে আজ আমি নিরুপায়। তোমার কথা ভাবতে গেলে আমার রত্নগুলো শয়তানটা হাঁতড়ে নেবে। তুমি আজ তোমার ভাবনা নিজেই ভাব।

ঝড় বৃষ্টির দাপট ভেদ করে ট্রেন ছুটছিল। একসময় কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন তার ঠিক নেই। ঘুম ভেঙে ছিল সকালের দিকে। ততক্ষণে ট্রেন সান্তা বারবারা পার হয়ে গেছে। পার হয়ে গেছে দু-দুটো টানেল। বৃষ্টিও কমে গেছে। প্রথমেই তার মনে হল হীরেগুলোর কথা। একবার ব্যাগটা খুলে দেখে নিলেন।

না—সব ঠিকঠাক আছে। এবার জানলাটা খুললেন। বাইরের আলো এসে পড়ছে। গতকালের আবহাওয়া সম্পূর্ণ বদলে গেছে।

বিছানা ছেড়ে উঠে প্রথমে পোশাক বদলে নিলেন বব। তারপর দাড়ি কামালেন। বেল বাজিয়ে ব্রেকফাস্টের অর্ডার দিলেন। এবার নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে দরজার লক খুললেন। খানিকবাদে ওয়েটার ট্রেতে করে কফি আর ব্রেকফাস্ট নিয়ে এলো।

কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে একবার প্যাসেঞ্জারদের উপর চোখ বোলালেন বব ফেয়ারফিল্ড। মেয়েটাকে লক্ষ্য করলেন প্রথমে। মনে হয় মেয়েটা সারারাত ঘুমোয়নি। রাতজাগা চেহারা ওর মুখচোখে স্পষ্ট। আহারে এত সুন্দর মেয়েটা একটু শুতে পারেনি শয়তানটার জন্য। ভয়ে মেয়েটি আড়ষ্ট হয়ে বসে আছে।

আর জুয়েল থীপ সিমস—হতভাগাটা এখনও মেয়েটাকে একভাবে দেখে যাচ্ছে। ওর দুচোখে হিংস্র বাঘের মত আক্রোশ। মনে হচ্ছে সুযোগ পেলেই সে মেয়েটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। মেয়েটা ব্রেকফাস্ট পর্যন্ত করলো না।

নিজেকে স্বার্থপর বলে মনে হচ্ছিল বব ফেয়ারফিল্ডের।

ঘন্টা খানেক আরো সময় লাগবে।

এখনও দুটো সুড়ঙ্গ পার হতে হবে। ট্রেন তীব্র গতিতে ছুটে যাচ্ছে। একটা বই টেনে নিয়ে পড়ার চেষ্টা করলেন বব। একসময় শুনতে পেলেন আর্কেড স্টেশনে ঢোকার সংকেত। সবাই তৈরি হচ্ছে।

বব তৈরি হলেন।

মেয়েটিও যেন হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে এমন একটা ভাব।

কিছুক্ষণের মধ্যে গাড়িটা স্টেশনে থামলো। কোনরকম তাড়াহুড়ো না করে ধীরে ধীরে নামলেন বব। সবাই নেমে গেল। সকলের শেষে তিনি নামলেন। তারপর প্যাসেঞ্জার—টানেলের ভিতর দিয়ে এসে পৌঁছলেন ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডে। প্রথম ট্যাক্সিতে কোনদিন ওঠেন না বব। ফলে দ্বিতীয় ট্যাক্সিটাকে তিনি ডেকে নিলেন। তারপর সোজা হোটেল।

হোটেল তাঁর পরিচিত। প্রায়ই আসতে হয়। হোটেল মালিক প্রায় বন্ধুর মত হয়ে গেছেন। তার জন্য একটা আলাদা ঘর আছে। ঘরে আছে লোহার সিন্দুক। সিন্দুকের মধ্যে তাঁর মূল্যবান রত্নগুলো এনে রাখেন। এই সিন্দুক ভাঙতে অনেক সময় নেবে আর ভাঙাটাও সহজ নয়। বিশেষ অর্ডার দিয়ে এটা তৈরি।

বব ফেয়ারফিল্ড সিন্দুকের চাবি খুলে প্রথমে তার তালাটা খুললেন। তারপর ব্যাগ থেকে হীরেগুলো বার করে একবার পরীক্ষা করে আবার তা ব্যাগ শুদ্ধ ভিতরে রেখে সিন্দুকের তালা বন্ধ করে দিলেন।

এখন একটু হুইস্কির দরকার।

সব ব্যবস্থা তৈরি।

হুইস্কি শেষ করে এবার ঠিক করলেন নিচে নেমে ম্যানেজারের সঙ্গে একটু গল্প করবেন। তারপর সময় মত খদ্দের আসবে। ঠিক করতে হবে হীরেগুলোর দরদাম।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বেশ হাল্কা মনে দরজায় চাবি দিতে গিয়ে থমকে গেলেন বব। মনে হল কেউ যেন তাঁর পিছনে। দ্রুত ঘুরে দাঁড়ালেন। দেখতে পেলেন গতকাল ট্রেনে দেখা মেয়েটিকে। মেয়েটির একটা হাত নিজের বুকের উপর অন্য হাতে রাইফেল ধরা।

বব অবাক হলেন।

—কি ব্যাপার?

—কি ব্যাপার, সে তো তুমি জানো। কাল থেকে দেখছি তুমি আমাকে ফলো করছো। রাতে একটু ঘুমতে পারিনি। এখন আবার দেখছি তুমি আমাকে ফলো করে একই হোটেলে এসেছ। কি মতলব বলো তো তোমার?

এবার বব শান্ত হয়ে বললেন, তুমি আগে রাইফেলটা নামাও।

—না। আমি পুলিশকে খবর দিয়েছি। তুমি হচ্ছ পাকা একজন জুয়েল থীপ।

—আমি! এই দেখ সুন্দরী আমার কার্ড। দেখে নাও আমার পরিচয়। আমি হলাম বিখ্যাত ব্যবসায়ী ম্যাডিসন অ্যাণ্ড ফেয়ারফিল্ড কোম্পানির একজন অন্যতম পার্টনার। আমার নাম বব ফেয়ারফিল্ড। বিশ্বাস না হয় আমার পরিচয় ম্যানেজারের কাছ থেকে জেনে নাও।

—ও মাই গড। ছিঃ ছিঃ কিছু মনে করবেন না। আমি হচ্ছি সীটলের গ্রীন ডেল্যান। আমি তো অনেকবার তোমাদের কোম্পানির কাছ থেকে রত্ন কিনেছি। কিছু মনে করো না।

—না, না, কিন্তু তুমি এখানে কেন?

—আমার কাছে একটা মূল্যবান রত্নহার আছে। ওটা আমি বেচতে যাচ্ছি। এই দেখ—বলে মেয়েটি তার বুকের ভিতর থেকে একটা কালো চামড়ার কেশ বার করলো। এক ঝলক মাত্র। চোখ যেন ধাঁধিয়ে গেল। তারপর দ্রুত বাক্সটা আবার বুকের মধ্যে ঢুকিয়ে নিল মেয়েটি।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে বব ফেয়ারফিল্ড দেখতে পেল দুজন বণ্ডামার্কা লোক নিয়ে বেশ জোর পায়ে সিমস তাদের দিকে এগিয়ে আসছে।

ব্যাপারটা আন্দাজ করে ফেয়ারফিল্ড মেয়েটিকে নিয়ে এক ঝটকায় নিজের ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

—কি ব্যাপার।

—চুপ। লোকটা একটা নামী জুয়েল থীপ। গতকাল ট্রেন থেকে এই লোকটাই তোমাকে ফলো করে আসছে—তুমি কি লক্ষ্য করেছ?

—হ্যাঁ।

—আসলে তুমি খুব সজাগ ছিলে বলে ও তোমার কোন ক্ষতি করতে পারে নি। আমার ধারণা তোমার কোন নিজের লোক ওকে খবর দিয়েছে।

—এখন তাহলে উপায়?

—চিন্তার কোন কারণ নেই, আমি পুলিশে খবর দিচ্ছি।

—না প্লিজ, অমন কাজ করো না। ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেলে আমার পক্ষে আরও ক্ষতিকর হবে। হয়ত খদ্দের নিজেও আর কিনতে আগ্রহী হবে না।

—তাহলে কি করা যায় বলো তো?

—একটা কাজ করবে দয়া করে?

—কি বলো?

—তুমি তোমার হীরেগুলো কোথায় রেখেছ?

—আমার হীরের বাক্স আমার আয়রন সিন্দুকে আছে। ওটা ভাঙতে বাছাধনকে যথেষ্ট ঘাম ঝরাতে হবে।

—তাহলে আমারটাও ওই জায়গায় রেখে দাও, পরে নেব। বব ফেয়ারফিল্ড এবার চাবি ঘুরিয়ে সিন্দুকের তালা খুললেন। তারপর হীরের বাক্সটা বার করে মহিলার মুক্তোর মালাটা রাখতে রাখতে বললেন—আমাদের আলাপ আরও আগে হওয়া উচিত ছিল।

মহিলা হাসলেন।

তারপর হীরেগুলো দেখতে দেখতে বললেন—বাঃ কি চমৎকার হীরে।

আলোতে হীরের আলো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে।

বব কিছু বলতে যাচ্ছিল তার আগেই ফোনটা বাজলো।

রিসিভার তুলে একরকম প্রায় চিৎকার করে বব ফেয়ারফিল্ড বললেন—না, আমি কিছুতেই শয়তান সিমসের সঙ্গে দেখা করবো না। ওকে চলে যেতে বলুন।

তারপর ফোন নামিয়ে রেখে ঘুরে তাকালেন মহিলার দিকে।

—কি হল?

—কি সাহস ওই শয়তানটার, বলে কি না আমার সঙ্গে কথা আছে।

—সর্বনাশ। যাক আমি এখন চলি ফেয়ারফিল্ড লাঞ্চের পর এসে আমার মুক্তোর মালাটা নিয়ে যাব।

—ঠিক আছে। কিন্তু—

—কিসের কিন্তু! কোন রসিদ নেবে না।

—ছিঃ ও কথা বলে লজ্জা দিও না আমায়।

মহিলা চলে গেল।

এবার সিন্দুক বন্ধ করে ভালভাবে ঘর লক করে নিচে নেমে এলেন মিস্টার বব ফেয়ারফিল্ড।

লাঞ্চ শেষ করে ঘরে এলেন। সঙ্গে খদ্দের। এবার সিন্দুক থেকে হীরের বাক্সটা বার করে বব ফেয়ারফিল্ড বললেন—এগুলো দামী হীরে। অবশ্য মুক্তোর মালাটা আমার নয়। তিনি মালাটা প্যান্টের পকেটে রাখলেন।

ভদ্রলোক বললেন, শুনেছি এই হীরে খুব দামী।

কথা বলতে বলতে ভদ্রলোক জানলার আলোর কাছে হীরেগুলো ধরে বললেন—আপনি কি ঠাট্টা করছেন?

—ঠাট্টা? ঠাট্টা কিসের?

—এগুলো তো হীরে নয়। এগুলো হল হীরের মত দেখতে এক ধরনের পাথর—এদের বলে বরুণমণি বা জিরকন। আপনি কি আমাকে বোকা পেয়েছেন।

বব ফেয়ারফিল্ড একেবারে থ। কি বলবেন ভেবে পেলেন না। এবার তিনি নিজে হীরের বাক্সটা জানলার সামনে ধরলেন। সত্যি তো এগুলো আসল হীরে নয়।

বব ফেয়ারফিল্ডের কপালে ঘাম জমতে শুরু করলো। এবার তিনি পকেট থেকে মুক্তোর মালাটা বার করলেন।

আলোর সামনে ধরলেন এবং পরিষ্কার বুঝতে পারলেন যে এটা একটা নকল মুক্তোর মালা।

হতাশ ফেয়ারফিল্ড চেয়ারে বসে পড়লেন। মেয়েটা তাহলে ঠকিয়েছে।

দ্রুত হাতে টেলিফোন তুলে নিলেন।

পুলিশ স্টেশন।

ঘন্টা দুয়েক বাদে পুলিশ এলো। তারা রিপোর্ট নিল। পুলিশের রিপোর্ট থেকে জানা গেল, আসল যিনি মিস গ্রীন ডেল্যান—তাকে হাত পা বাঁধা অবস্থায় গাড়ির মধ্যে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। পুলিশের ধারণা ট্রেনেই মহিলাকে খতম করে তার আসল মাল্যটি হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে।

সেই সঙ্গে পুলিশ একথাও বলল, তারা জুয়েল থীপ স্নিক সিমসকে তার আস্তানা থেকে অ্যারেস্ট করেছে। ওকে নিয়ে গোয়েন্দার লোক এখুনি হোটেলে এসে পড়বে।

একটু বাদে সত্যি সত্যি গোয়েন্দা পুলিশ পরিবেষ্টিত হয়ে সিমস হোটেলে এলো। নির্ভিক পদক্ষেপ।

সিমস বেশ শান্ত গলায় ববকে বললেন—আপনি কিন্তু অযথা আমাকে হ্যারাস

করেছেন। আপনার জন্য আমার সম্মান হানি হয়েছে। আমি আপনার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা আনছি।

—কেন?

—কারণ আপনি কি প্রমাণ দিতে পারবেন আমি আপনার হীরেগুলো নিয়েছি?

বব ফেয়ারফিল্ড নীরব। ঘামে তার মুখ ভিজে গেছে।

গোয়েন্দাপ্রধান বললেন এবার—সত্যি তোমাকে তারিফ করতে হয়। কি চমৎকার তোমার পরিকল্পনা।

—একথা বলছেন কেন?

—বলছি এই কারণে যে তোমার মহিলা সাগরেদটি হল একজন পাকা অভিনেত্রী। তাকে তুমি পাঠিয়েছিলে বব ফেয়ারফিল্ডের কাছে। এরপর তুমি যখন টেলিফোন করেছিলে ফেয়ারফিল্ডকে, সেই সুযোগে তোমার ওই মহিলা সাগরেদটি জুয়েল কেস বদল করে নেয়।

আশ্চর্য! এত সাচ্চা প্রমাণ সত্ত্বেও জুয়েল থীপ সিমসের মধ্যে কিন্তু কোন রকম ভাবান্তর লক্ষ্য করা গেল না। সে চুপ করে থেকে বললে—আমার বক্তব্য কিন্তু অন্য।

—কি তোমার বক্তব্য?

—দেখুন গোয়েন্দা, আমি যখন দেখতে পাই এই ভদ্রলোক যাকে আপনারা বলছেন বব ফেয়ারফিল্ড তার সঙ্গে মহিলাটি কথা বলছে তখনই আমার মনে সন্দেহ জাগে। আমি ওই মহিলাকে খুব ভাল চিনি। ও হচ্ছে বিখ্যাত মহিলা জুয়েল থীপ মিস মিলি দ্যঁ মল। এই কারণে আমি ভদ্রলোককে সাবধান করে দেওয়ার জন্য হোটেলের এক কেরানিকে দিয়ে ওঁর ঘরে ফোন করি। কিন্তু উনি দেখা করলেন না। আমাকে ফোনে যাচ্ছেতাই অপমান করলেন—তাঁর অজ্ঞতার জন্য যদি কোন ক্ষতি হয়ে থাকে, তবে তার জন্য তো আমি দায়ী নই। দায়ী উনি নিজে। আর এটা তো মানবেন ওঁর সঙ্গে আমার একটি বাক্য বিনিময় পর্যন্ত হয়নি। আমি ওর ধারে কাছে ছিলাম না, কাজেই আমাকে ধরাটা আপনাদের উচিত হয় নি।

সবাই অবাক। কি বলবে এরপর। কেবল গোয়েন্দা ভদ্রলোক বললেন ফেয়ারফিল্ডকে— দেখুন স্যার আপনি যদি চান তো আমরা তদন্ত করতে পারি। কিন্তু কোন লাভ হবে না। আপনি যদি অ্যারেস্ট ওয়ারেন্টে সই করেন তাহলে পরে আপনাকে ও অনেক ডলারের মানহানির মামলায় জড়িয়ে দেবে। ওর বিরুদ্ধে আপনি কি চার্জ করবেন? ও আপনার সঙ্গে এক গাড়িতে এসেছে কেন? আপনাকে সাবধান করার জন্য টেলিফোন করেছিল কেন? দেখুন বব ফেয়ারফিল্ড এসব প্রশ্ন আদালতে টিকবে না। আমরা গোয়েন্দা দপ্তর জানি এই কাজ ওরা করে, তবু কিছু করতে পারি না যেহেতু ওদের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ নেই। ও কোন কাজে কোন

প্রমাণ রাখে না আর সবচেয়ে বড় কথা হল এক পদ্ধতিতে ও কখনও দু'বার এক কাজ করে না। প্রতিবছরই ও প্ল্যান বদল করে। তাই পুলিশ দপ্তর থেকে আমরা ওকে নাম দিয়েছি বাঁকা বিদ্যুৎ। জানেন তো বাঁকা বিদ্যুৎ যা কখনই একজায়গায় দুবার বজ্রপাত ঘটায় না।

—কিন্তু ওই মেয়েটি?

—ওর সঙ্গে মেয়েটির সম্পর্ক প্রমাণ করা মুশকিল।

কোন কথা না বলে দু'হাত মাথায় দিয়ে বসে পড়লেন ফেয়ারফিল্ড।

গোয়েন্দা অফিসার বললেন—আমার মনে হয় আপনার সেক্রেটারি আপনার গাড়ি রিজার্ভেশনের কথা জানতো। ওই ব্যাপারটাকে ফাঁস করে দিয়েছে। এরপর ওই লোককে আপনার আর কাজে রাখা ঠিক হবে না।

জুয়েল থীপ সিমস হেসে বললে—তার বোধ হয় আর দরকার হবে না। আপনারা তো সবাই জানেন অকারণে বাঁকা বিদ্যুৎ কখনও দুবার একজায়গায় বজ্রপাত ঘটায় না।

বব ফেয়ারফিল্ড চিৎকার করে বললেন—'আই-সে-গেট-আউট।'

কনটেনট্স ওয়ান বডি

সি. বি. গিলফোর্ড

সোমবার।

অপরাহ্ণের শেষ আলোয় এনিটা লো'র সঙ্গে মিসেস কারলোর শেষ দেখা হয়েছিল। এই শেষ আলাপ তাদের আদৌ সুখকর ছিল না। তারা যখন উত্তেজিত ভাবে কথা বলছিল, তখনও বোঝা যায় নি এটাই ওদের মধ্যে শেষ সাক্ষাৎকার হতে চলেছে। এনিটা লো'কে আর দেখা যাবে না।

বিরাট বড় এই অ্যাপার্টমেন্টের মালিক হলেন মিসেস কারলো। তার অনেক ঘর ভাড়াটে আছে। ভাড়াটেদের সঙ্গে তার সম্পর্ক আদৌ ভাল নয়। লোকে তাকে ঝগড়াটে বলেই জানে। মিস্টার কারলো ভাল মানুষ ছিলেন। তাঁর স্বভাব ছিল শান্ত সেই কারণে তিনি অশান্তি এড়াতে স্ত্রীর যাবতীয় দৌরাত্ম মুখ বুজে সহ্য করতেন এবং শেষমেষ স্ত্রীর বেগার খাটতে খাটতে ক্লান্ত হয়ে তিনি মারা যান। স্বামী মারা যাওয়ার পর মিসেস কারলো আরও বেশি দাপুটে হয়ে ওঠেন। প্রায়ই দেখা যায় তার বাড়িতে নতুন নতুন ভাড়াটে। তবু এত কিছু সত্ত্বেও এনিটা লো যে কেন মিসেস কারলোকে সহ্য করে, এত তোয়াজ করে কেউ তা ভেবে পায় না। আর মিসেস কারলো'ও তাকে বড় একটা কিছু বলেন না। আসলে এনিটার ওকে সহ্য করে নেওয়ার পিছনে একটা কারণ আছে। মিসেস কারলো তার ভাড়াটেরা যখন তখন বাইরে যাক, বা অনেক রাতে বাড়ি ফিরুক এটা বিশেষ পছন্দ করতেন না। অথচ তিনি এই ব্যাপারে এনিটাকে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন বেশি। তা বলে যে তিনি আবার এনিটা বা তার স্বামীকে বিশেষ পছন্দ করতেন এমন নয়। সুযোগ পেলেই অন্য ভাড়াটেদের কাছে তাদের নামে নিন্দাবাক্য বর্ষণ করতেন। ফলে সব মিলিয়ে ভাড়াটেদের কাছে ওদের সম্পর্কটা ছিল বিশেষ লক্ষ্যণীয় এবং কৌতূহলের খোরাকও বটে।

সেদিনের সেই শেষ বিকেলে, একরকম বলা যায় এনিটার জীবনের শেষ অপরাহ্ণে যারা সাক্ষী ছিল তাদের মধ্যে ছিল ১-বি ও ২-বি'র ভাড়াটেরা। গোটা দৃশ্যটা হুবহু দেখতে না পেলেও শেষদিকের বেশ কিছু কথা তাদের কানে এসে পৌঁছেছিল। অনেকেই দেখেছে এনিটা লো নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে মিসেস কারলোর দরজায় নক করে।

মিসেস কারলো তখন সামনের জানলার ধারে বসেছিলেন। ওটা তার খুব প্রিয় জায়গা। ওখানে বসলে সামনের রাস্তার অনেকদূর পর্যন্ত দেখা যায়। মিসেস কারলো লক্ষ্য করছিলেন একটা হাইস্কুলে পড়া মেয়ে একটা হিরো মার্কা ছোকরার হাত ধরে হেঁটে আসছে। ছোকরার পরণে নীল প্যান্ট, চামড়ার জ্যাকেট। মিসেস কারলোর চোখে দৃশ্যটা আদৌ ভাল লাগলো না। মুখচোখে যথেষ্ট বিরক্ত ভাব প্রকাশ পেল। তার এই ধরনের অশালীন মেলামেশা একদম পছন্দ নয়। পরমুহূর্তে দরজায় নক করার শব্দে তার চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটলো এবং উত্তর দেবার জন্য বেশ একটু রুক্ষ মেজাজে উঠে গেলেন।

যদিও সবে বিকেল চারটে, তবে তিনি জানেন না এই সময়ে এনিটা লো'কে নাইট গাউন পরে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন মিসেস কারলো। তার উপর আবার মেয়েটি খালি পায়ে।

রাগটা সামলে নিয়ে একটু হাসবার চেষ্টা করে মিসেস কারলো তাঁকে ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন।

বললেন—আরে বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বলো না, ঠাণ্ডা লেগে যাবে। তার উপর আবার খালি পায়ে এসেছ।

মিসেস কারলোর এ এক অদ্ভুত স্বভাব। সময় সময় ভীষণ অতিথি পরায়ণ হয়ে ওঠেন। সময় সময় তিনি তাঁর পরিচিতদের নিজের ঘরে আহ্বান করেন আবার কাউকে কোন কোন সময়ে ঘরে বসানো তো দূরের কথা, দরজাটা পুরো খোলেন না পর্যন্ত। উঁকি মেরে কথা বলেন।

এনিটা লো তার স্বভাব ভাল করেই জানে। তবু সে ঘরে ঢুকলো এবং শরীরটাকে সোফায় এলিয়ে দিল। সাধারণতঃ অন্য সময় হলে এনিটা লো'কে ভারি সুন্দর দেখায়। আজ কিন্তু তাকে ঠিক সেই রকম সুন্দর লাগছিল না। সে সোফায় বসে বসেই চিরুনী দিয়ে তার বেয়াড়া চুলগুলোকে শায়েস্তা করবার চেষ্টা করছিল। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল তার যেন ঘুমটা খুব প্রয়োজন এবং আধ ডজন এসপিরিন এখন থেকে তার পকেটে রাখলে খুব ভাল হয়। এনিটা লো'কে খুব খুঁটিয়ে দেখে নিয়ে মিসেস কারলো বললেন—তো এমন সময় তোমার আগমন কিসের জন্য আমার ছোট্ট সোনা বন্ধু? বলো তোমার জন্য কি করতে পারি?

—শুনুন মিসেস কারলো, কেবল এক কাপ কফি হলেই এখন চলবে। গতকাল ডিপার্টমেন্টাল স্টোর থেকে কফি আনতে একদম ভুলে গেছি।

—ছাই। মনে মনে ভাবলেন মিসেস কারলো, তুমি ভুলে গেছ না ছাই। তো ঘরে যদি কফি নেই তো অন্য ভাড়াটেদের কাছে গেলে না কেন? আরে বাপু আমি যেন বোকা—কিছুই বুঝি না। ধার নেওয়াটা তোমার অভ্যাস আর একবার যা তুমি

ধার নাও, তা আর ফেরৎ দেবার নাম করো না। কে দেবে তোমাকে ধার—সবাই জানে। এইভাবে ক্রমশঃ ধারের পরিমাণ বেড়েই যাচ্ছে।

মনে মনে এতকিছু ভাবা সত্ত্বেও মিসেস কারলো এনিটা লো'র জন্য কফি করতে গেলেন। বললেন, ঠিক আছে বসো, আমি এখুনি এখানে তোমাকে এককাপ কফি এনে দিচ্ছি।

এনিটা বাধা দেবার চেষ্টা করলেন। বললেন—আরে আপনাকে করতে হবে কেন। এককাপ কফি ধার পেলে আমি নিজেই করে নিতাম।

—আরে না, না, আমি করে দিচ্ছি।

মিসেস কারলো রান্নাঘরে গেলেন।

এনিটা এবার তার পকেট হাতড়ালো সিগারেটের জন্য। সিগারেট খাওয়াটা মিসেস কারলো একদম পছন্দ করেন না। তিনি বলেন ওটা একটা বিলাসিতা। তাই কেউ এলে তিনি তাঁকে সিগারেট অফারও করেন না। কিন্তু তার স্টকে বিভিন্ন স্বাদের সিগারেট যখন তখন পাওয়া যেতে পারে।

মিসেস কারলো খুব তাড়াতাড়ি দু'কাপ কফি তৈরি করে নিয়ে এলেন। টেবিলের উপর রাখলেন। তারপর দ্রুত পাশের ঘরে গেলেন।

এনিটা লো'কে অসম্ভব ক্লান্ত লাগছিল। মনে হয় সে বিশ্রাম নেওয়ার জন্য উন্মুখ। গরম জেনেও ধূমায়িত কফির কাপে বেপরোয়া ভাবে চুমুক দিল এনিটা।

—দারুণ হয়েছে কফিটা। এনিটা বলল। মিসেস কারলো ঘরে ঢুকলেন কিন্তু উত্তর দিলেন না। কেবল এনিটার সামনে বসে তাকে দেখতে দেখতে বললেন মিসেস কারলো—কাল অনেক রাত পর্যন্ত জেগে ছিলে মনে হয়?

কথাটা কানে যেতেই এনিটা লো'র মেজাজটা খিচড়ে যায়। অনেকরাত পর্যন্ত জাগা বলতে মিসেস কারলো কি বোঝাতে চাইছেন, সেটা বুঝতে তার কোন অসুবিধা হল না। তাই সে প্রতিবাদ করে বলল—না, না আপনি যা বলতে চাইছেন ঠিক তা নয়। আমি ঘুম থেকে এখন উঠিনি, উঠেছি বহু আগেই। তবে মাথাটা ভীষণ যন্ত্রণা করছিল তাই আবার শুয়ে পড়ি। তারপর ঘুম ভাঙতে দেখি মাথার যন্ত্রণাটা আরও বেড়ে গেছে।

মিসেস কারলো হাসলেন। তার ভঙ্গিমা দেখে মনে হল, তিনি এনিটার কথাটা যেন বুঝতে পেরেছেন। বললেন—হ্যাঁ, তোমার মুখ দেখে আমার তাই মনে হচ্ছে বটে।

এনিটা লো'-কে দেখলে একজন মানসিক রুগী বলে মনে হয়। মনে হয় মেয়েটি দীর্ঘদিনের মানসিক অসুখে ভুগছে। তার কোন গোপন অপরাধ ঢাকতে গিয়ে তাকে কি নিদারুণ অজ্ঞতার ভান করতে হচ্ছে।

এনিটা অস্বস্তি বোধ করে নিজের মধ্যে। ভাবে আচ্ছা বেয়াদপ মহিলাতো,

এককাপ কফি খাইয়ে এ যেন সব আমার নাড়িনক্ষত্র জানতে চায়। বেশ একটু উদ্ধত ভাবে সে বললে—কালরাতে এলকোহল জাতীয় বস্তুটা পেটে একটু বেশি পড়েছিল।

মিসেস কারলো বুঝতে পারলেন এনিটা লো-কে মোক্ষম জায়গায় ঘা মেরেছেন। মনে মনে হাসলেন। উপভোগ করলেন এনিটার রাগান্বিত মেজাজটাকে। তারপর প্রসঙ্গ টাকে চাপা দেবার জন্য বললেন—

—আর্থার মানে মিস্টার লো...এবারও কি লম্বা ট্রিপে বেরিয়েছেন? যা হোক তা এবার কতদিনের জন্য?

—ছয় সপ্তাহ।

—ও! তা বাব্বা এতো অনেক সময়। তো তোমার তো খুব নিঃসঙ্গ লাগছে তাই না?

এর আগে এনিটা একা একা থেকেছে, কোনবার তার মধ্যে কোন বহিঃপ্রকাশ ঘটেনি। এবার কি তার নিঃসঙ্গতার কোন বহিঃপ্রকাশ তার মধ্যে সত্যি ঘটেছে? তবে কেন জানি না আজ সে বলে ফেললো—নিশ্চয়, ওর অনুপস্থিতি ভীষণ নিঃসঙ্গ লাগছে আমার। তারপর একটু বেশ উত্তেজিত হয়েই বললে—আর্থারের জন্য মনটা বড় ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। আমি ওর জন্য পাগল হয়ে আছি।

এনিটার কথা শুনে মিসেস কারলো মাথা ঝাঁকুনি দিলেন। মনে মনে বললেন তুমি যে কত পাগল হয়েছ তা আমি জানি। ভারি সেয়ানা মেয়ে তুমি। তারপর তার হাসিটা চাপতে চাপতে বললেন—আচ্ছা আর্থার যদি এমন কাজ পেত, যাতে মোটেই তার বাইরে কোথাও যেতে হত না, সব সময়ের জন্য তাকে এখানে পেতে তাহলে কি এইরকম পাগল হতে?

মিসেস কারলোর কথাটার মধ্যে খোঁচা ছিল যা এনিটা লো-কে প্রচণ্ড উত্তেজিত করে তুললো। সে চিৎকার করে বললে—চুপ করো, ডাইনি বুড়ি।

কথাটা শুনে মিসেস কারলো তো থ। এইভাবে কেউ তাকে এমন কথা বলতে সাহস পায়নি কোনদিন। আর এই মেয়েটা কিনা তাকে ডাইনি বললো। বে-আক্কেলে মেয়েমানুষ, ও ভেবেছে আমি ওর বিষয়ে কিছুই জানি না।

মিসেস কারলো ধাতস্থ হয়ে কিছু বলার আগেই এনিটা লো এমন একটা কাণ্ড করে বসলো যার জন্য মিসেস কারলো একদম তৈরি ছিলেন না। সে সটাং সোফা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে হাতের মধ্যে ধরে থাকা কাপের অবশিষ্ট কফি ছুঁড়ে দিল মিসেস কারলোর গায়ের উপর। বাকি অংশটা চলকে ভিজিয়ে দিল তার ব্লাউজ। তারপর কিংকর্তব্যবিমূঢ় মিসেস কারলো কিছু বোঝার আগেই এনিটা কফির কাপটা মাটিতে ছুঁড়ে ফেললো। মিসেস কারলো ধাতস্থ হয়ে ছুটে গেলেন এনিটাকে ধরার জন্য কিন্তু ততোক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। এনিটা দরজা টপকে তরতরিয়ে

নেমে গেছে সিঁড়ির শেষ মাথায়। পিছুন পিছুন ছুটে গিয়েও তাকে ধরতে পারলেন না মিসেস কারলো।

ব্যস এরপরেই শুরু হল মিসেস কারলোর তর্জন গর্জন। চিৎকার করে বলতে লাগলেন, পাজি নির্লজ্জ মেয়ে, আজই বিদায় হয়ে যা আমার বাড়ি থেকে। তোর মত একটা নোংরা কুলাঙ্গার মেয়ে আমার বাড়িতে ভাড়া থাকার জন্য নয়। দিনরাত্রি ফষ্টিনষ্টি করে বেড়াচ্ছিস, মনে ভেবেছিস কেউ কিছু টের পাবে না। স্বামী ছেড়ে পরপুরুষের কাছে থাকগে যা—। একটানা কুৎসিত মন্তব্য করতে লাগলেন মিসেস কারলো।

এনিটার কিন্তু কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। সে গট গট করে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল। মিসেস কারলোর গলা তো নয় যেন মাইক্রোফোন। আশপাশের সকলে তার চিৎকার শুনে যে যার জানলায় উঁকিঝুঁকি দিল। ২-বি অ্যাপার্টমেণ্ট থেকে বেরিয়ে এলেন মিসেস পিয়ারসন। মিসেস স্টুয়ার্ড, যিনি কৌতূহল দমন করতে না পেরে জানলাটা একটু ফাঁক করে দেখার চেষ্টা করলেন মিসেস কারলোকে।

আর দেখলেন মিসেস কারলো বারান্দায় দাঁড়িয়ে তারস্বরে চিৎকার করছেন। তার সাদা ব্লাউজ আর পোশাকে সদ্য ফেলা কফির দাগ।

—তোমরা তো দেখছ এনিটা কি হাল আমার করেছে। পাজি মেয়েটা শুধু আমার জামা কাপড় নষ্ট করেনি ও আমার একটা সুন্দর কফি কাপ আছড়ে ভেঙ্গে ফেলেছে। এরপরও কি তোমরা আমাকে ওর বেয়াদপি সহ্য করতে বলবে।

মিসেস পিয়ারসন অবাক হয়ে বললেন—ওমা আপনি ওই ছোট্ট, ফুলের কুঁড়ির মত মেয়েটার সঙ্গে ঝগড়া করছেন?

—ফুলের কুড়ি না ছাই, ওটা একটা কালনাগিনী। আমার সঙ্গে যে দুর্ব্যবহার করেছে এর জন্য ওকে শাস্তি পেতেই হবে। ওকে আমি ছাড়বো না, এ তোমরা দেখে নিও।

মিসেস স্টুয়ার্ড ব্যাপার স্যাপার বেগতিক বুঝে জানলা বন্ধ করে দিলেন। মিসেস পিয়ারসন একটু একটু করে ঘরের কাছে পৌছে দরজা বন্ধ করলেন।

মিসেস কারলো আবার একা হয়ে গেলেন। তবু রাগের মাত্রা তার কমলো না। তিনি সেই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে অনর্গল বকে চললেন। নোংরা ভাষায় গালাগাল করতে লাগলেন এনিটা লো-কে। এরপর আস্তে আস্তে অন্ধকার নেমে এলো। মিসেস কারলোর দাপুটে কণ্ঠস্বর থেমে গেল। চারদিক ঘিরে নেমে এলো নিস্তব্ধতা।

বাকি সময়টা নিজের চিন্তায় ডুবে গেলেন মিসেস কারলো। মেয়েটাকে যে করেই হোক জব্দ করতে হবে। তার এতবড় সাহস হয় কিনা আমায় অপমান করা! মনে মনে গর্জাতে থাকেন। কি করে শায়েস্তা করা যায় তার জন্য মতলব ভাঁজতে থাকেন।

ও ছুঁড়িটা ভেবেছে কি—আমি কিছু জানি না। আমি সব জানি। ও সন্ধ্যে হলে সেজেগুজে বেরিয়ে যায় তারপর ফেরে অনেক রাতে। আজ আমি হাতে-নাতে ধরবো। চিৎকার করে সকলকে ডেকে চিনিয়ে দেব ওকে। এতে আমার পক্ষে ওকে ঘর খালি করতে বলাটা অনেক সহজ হয়ে যাবে। মিসেস কারলো ঘরের আলো নিভিয়ে সতর্ক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন জানলার দিকে। ঠিক যেন শিকারি বিড়াল। চোখ-কান আজ তার সতর্ক। দেখা যাক মেয়েটা আমাকে ফাঁকি দিয়ে আজ পালায় কি করে। ওকে বুঝিয়ে দেব মিসেস কারলোকে অপমান করলে কেমন শাস্তি পেতে হয়।

রাত ঠিক আটটা...হ্যাঁ একেবারে ঠিক ঠিক আটটা। জানলা দিয়ে মিসেস কারলো দেখতে পেলেন একটা গাড়ি এসে দাঁড়ালো। গাড়ির চালক আলোটা নিভিয়ে দিয়ে অপেক্ষা করছে। প্রথমটায় মনে হয়েছিল মিসেস কারলোর হয়ত বিকেলের দেখা নীল রঙের জিন পরা ছেলেটি হাইস্কুলে পড়া মেয়েটির জন্য অপেক্ষা করছে। কিন্তু একটু সতর্ক হতে বুঝলেন আদপে ব্যাপারটা তা নয়।

মিসেস কারলো শুনতে পেলেন ২-এ অ্যাপার্টমেন্টের মেঝেতে খট খট শব্দ হচ্ছে। তিনি সতর্ক হলেন। শুনতে পেলেন দরজা খোলার শব্দ, তারপর দরজা বন্ধ করার। হ্যাঁ দরজাটা বন্ধ করলো। এবার সে নেমে আসছে। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ।

মিসেস কারলো লাফিয়ে উঠলেন। ঠিক করলেন সিঁড়ির মুখে ওকে ধরে হৈ চৈ বাধাবেন। এগিয়ে গেলেন দরজার দিকে। কিন্তু পরক্ষণে মনে হল কাজটা করা হয়ত ঠিক হবে না। এতে হয়ত এনিটা লো-র মুখোশ তিনি খুলে দিতে পারবেন ঠিকই কিন্তু বাড়িওয়ালা হিসাবে মোটেই তার সুনাম কেউ করবে না। এরফলে অন্য ভাড়াটিয়ারা তার বিষয়ে খারাপ ধারণা করতে পারে। তাছাড়া এনিটা লো চলে গেলে ওই ঘর যারা ভাড়া নিতে আসবে, তারা যখন শুনবে তিনি এনিটাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন, তাহলে তার সম্বন্ধে তারা ভুল ধারণা করতে পারে।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে মিসেস কারলো ইতস্তত করতে থাকেন। ততোক্ষণে এনিটা তার ঘরের সামনের সিঁড়ি পার হয়ে নিচে নেমে গেছে। নিচের দরজাটা খোলার শব্দ হল। মিসেস কারলো এক ছুটে চলে এলেন সেই জানলার কাছে। মেয়েটা কোথায় যায় দেখতে হবে। তিনি দেখতে পেলেন সেই যে গাড়িটা আলো নিভিয়ে রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল এনিটা সেই দিকে এগিয়ে গেল। মিসেস কারলো বুঝতে পারলেন আসল ঘটনা কি। ওই গাড়িটা তাহলে এনিটা লো-র জন্য অপেক্ষা করছিল। তিনি স্পষ্ট দেখতে পেলেন এনিটাকে আগুন রঙের পোশাকে ঢেকে হাইহিল জুতো মাটিতে খট খট ঠুকে এগিয়ে যাচ্ছে গাড়িটার দিকে। সামনের গীর্জার আলোয় লাল পোশাকে মোড়া এনিটার দেহটা একেবারে হেঁট হয়ে গাড়ির ভিতরে গিয়ে ঢুকলো। স্টিয়ারিং এর সামনে বসে ছিল এক পুরুষ। গাড়ির মুখটা

ঘুরিয়ে নেওয়ার সময় হেড লাইটের জোরালো আলোয় চোখটা ধাঁধিয়ে গেল মিসেস কারলোর। তিনি গোটা ব্যাপারটা চোখের উপর দেখার পর অস্ফুট স্বরে বললেন—একটা নষ্ট মেয়েছেলে। ছিঃ ছিঃ আগে জানলে ওকে এই চৌহদ্দিতে জায়গা দিতাম না।

এরপর রাত বাড়তে থাকে। সমস্ত পরিবেশ ক্রমশ শান্ত হয়। অন্ধকারে ডুবে যায়। মিসেস কারলো মনে মনে ভাবেন, ভাড়াটে হিসাবে মিসেস পিয়ারসন, মিসেস স্টুয়ার্ড, মিসেস জোনস অনেক ভাল। এরা কেউ সন্ধ্যের পর বাড়ির বাইরে যায় না নিজের স্বামীদের ছেড়ে। মিসেস কারলো ভাবেন, তিনি নিজেও কোনদিন রাতের বেলায় বাইরে থাকেন নি—সব সময় স্বামীকে আগলে রেখেছিলেন। বরং এই দোষ একটু পুরুষ মানুষের থাকে, মেয়েমানুষ এমন হবে কেন? যারা এই স্বভাবের হয় তারা কেউ ঘর করে না। ওই লক্ষ্মীছাড়া মেয়েটা হল আসলে একটা বেশ্যা। মিসেস কারলোর খারাপ লাগে মিস্টার লো'র কথা ভেবে। আহা বেচারা কিছুই জানে না। চাকরির খাতিরে কোথায় সে পড়ে আছে এখন। এইসব ছাইপাশ কথা ভাবতে ভাবতে মিসেস কারলো কখন যে দু'চোখের পাতা এক করে ফেলেছিলেন তা ওর ঠিক মনে নেই।

চমক ভাঙলো অস্ফুট একটা শব্দে। মনে হল করিডর ধরে কেউ যেন হেঁটে যাচ্ছে। তিনি সতর্ক হলেন। তবে কি এনিটা ফিরে এলো? সতর্ক হলেন মিসেস কারলো। তার মনে হল দুজন মানুষের হাঁটাচলার শব্দ। কান খাড়া করে রাখলেন। পরক্ষণে নিজের ভুল বুঝতে পারলেন—না দুজনের নয়, একজনের হাঁটাচলার শব্দ। আর শব্দটা অন্য রকম...মনে হয় ভারি বুট জুতোর শব্দ। খুব সন্তর্পণে লোকটা করিডোর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। কান খাড়া করে থাকলেন। বোঝা গেল শব্দটা ২-এ অ্যাপার্টমেণ্টের সামনে গিয়ে থামলো। অন্ধকারে এই ভাবে হেঁটে গিয়ে কে দাঁড়ালো এনিটা লো'র দরজার সামনে? চোর নয়তো? ভাবতে গিয়ে দু'হাত শক্ত করে চেয়ারের হাতলটা ধরলেন। ভাবলেন চিৎকার করবেন কি না—চিৎকার করে ডাকবেন কিনা মিসেস পিয়ারসন অথবা মিসেস স্মিথকে। কিন্তু পরক্ষণে তার মনে হল, ভাবনাটা হয়ত তার ভুল হচ্ছে। চোর দরজা ভাঙবে। কিন্তু লোকটা দিব্যি ঘরের চাবি দিয়ে দরজা খুললো বলে মনে হয়। কোন শব্দ হল না। তাহলে যার কাছে চাবি থাকে সে নিশ্চয় চোর হতে পারে না। মনে হয় লোকটি অতি সন্তর্পণে ও গোপনে ঘরে ঢুকেছে। আলো জ্বালেনি। আলো জ্বাললে শব্দ হত। তবে কি লোকটা মিস্টার লো—মানে আর্থার লো।

মিসেস কারলো ভীষণ অবাক হলেন। তার কাছে অবাক হবার প্রথম কারণ হল এই অন্ধকারে চোরের মত নিজের ঘরে ঢুকলো কেন আর্থার? নিজের ঘরে কেউ এমন ভাবে আসে? অন্ধকারে সে যে ঘরের মধ্যে পায়চারি করছে তা স্পষ্ট বুঝতে

পারলেন মিসেস কারলো। মনে হয় তার স্ত্রীর খোঁজ করছে? আরে বাবা—স্ত্রীকে এখন পাবে কোথায়? সে তো এখন দেখগে যাও কার সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করছে। মনে হয় এনিটা লো-র এখনকার ব্যাপার যে করেই হোক আর্থারের কানে গেছে। নিজের চোখে দেখার জন্য মনে হয় সে কাজ ফেলে এত রাতে ছুটে এসেছে। ভাবতে গিয়ে মিসেস কারলো ভিতরে ভিতরে ভীষণ উত্তেজনা বোধ করেন। বুঝতে পারেন সারা ঘরে তন্ন তন্ন করে খুঁজে কোথাও এনিটাকে না পেয়ে এইমাত্র সে ক্লান্ত হয়ে সোফায় বসে পড়লো।

ওপরে যেমন অন্ধকারে সোফার উপর বসেছিল আর্থার, নিচে তেমনি চেয়ারে চুপ করে শিকারি বিড়ালের মত ওত পেতে বসেছিলেন মিসেস কারলো। আজ এনিটা মেয়েটার কপালে দুঃখ আছে। ঠিক হয়েছে—এসব মেয়ের কপাল এমন হওয়াই উচিত। কত খারাপ মেয়ে হলে, সে আমার মত মহিলার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতে সাহস পায়। আমি তখনই বলেছিলাম, এর জন্য ওকে শাস্তি পেতে হবে। নাও এবার ঠেলা সামলাও। স্বামী ঘরে এসে বসে আছে, আর তার কোন পাত্তা নেই।

ঘরের আলো এখনও জ্বালেনি আর্থার। মনে হয় সে যে ফিরে এসেছে এটা এনিটাকে সে জানতে দিতে চায় না।

আর্থার মনে হয় সোফার উপরেই ক্লান্ত শরীরটা এলিয়ে দিয়েছে। আহা বেচারা। ভাল মানুষ হলে তার কপালে এমন দুঃখ হয়। আর্থারের স্বভাব খুব শান্ত। নম্র স্বভাবের পুরুষ। বেশি কথা বলে না। মাথায় একটু লম্বা বলেই ওকে রোগা বলে মনে হয়। চোখে চশমা আছে। ভাবতে গিয়ে মিসেস কারলোর মনে হল চশমার লেন্সের আড়ালে থাকা আর্থারের নীল জোড়া চোখ অন্ধকারে জ্বলছে—প্রতিক্ষা করে আছে একটা মুহূর্তের জন্য।

মিসেস কারলো ভাবতে থাকেন নতুন করে—আর্থার লো ভদ্রলোক দারুণ পরিশ্রমী। অর্থ উপার্জনের জন্য কি পরিশ্রমটা না তাকে করতে হয়। বেশির ভাগ সময় তাকে কাটাতে হয় ঘরের বাইরে। এনিটা কাঁচা বয়সের মেয়ে—সে'ও তো স্বামী সঙ্গ পেতে চায়। কিন্তু কদিন সে তার স্ত্রীকে সঙ্গ দিয়েছে। কাজেই স্বামীর সঙ্গ না পেয়ে স্ত্রী যদি অন্য পুরুষের সঙ্গী হয় তাহলে তো সে দোষ তার নয়। মিসেস কারলোর যুক্তিপূর্ণ মনটা অজান্তে এনিটা লো-কে সমর্থন করে। তার ধারণা আর্থার লো সব কিছু জানতো। স্বামীর সমর্থন না থাকলে কোন স্ত্রী এত বেয়াদপ হতে পারে না। হয়ত নিজের জন্য মনে মনে এতদিন আর্থার তার স্ত্রীর সমস্ত আচরণকে সহ্য করে গেছে। আর এখন—মনে হয় এনিটার বাড়াবাড়িটা তার আর ভাল লাগছে না। আবার এমনও হতে পারে যে এনিটার স্বভাবচরিত্র সব তার আগে থেকেই জানা ছিল। এতদিন কোন অজ্ঞাত কারণে চুপ করে ছিল—

ফয়সালার জন্য অপেক্ষা করছিল। হয়ত আজ বুঝেছে তার কিছু একটা করা উচিত।

কিছু একটা করা উচিত? নিশ্চয় উচিত। কিন্তু কি ব্যবস্থা সে নিতে চায়। মনে মনে ভয়ঙ্কর একটা মুহূর্তের কথা ভেবে নিজের মনে শঙ্কিত হয়ে উঠলো মিসেস কারলো। তার মনে হয় এনিটা না ফেরা পর্যন্ত তো জেগে থাকাটা উচিত। কি হয় তাদের মধ্যে বোঝাপড়াটা সেটা তার জানা দরকার।

রাতটা যেন শেষ হতে চায় না। মিসেস কারলোর নজর পড়ে তার টেবিল ঘড়িটার দিকে। অন্ধকারে ঘড়িটা জ্বলছে। কাঁটাগুলো যেন ঠাণ্ডায় জমে গেছে—নড়তে চাইছে না। উপর তলায় এখন আর কোন সাড়া শব্দ নেই। এমনকি বোঝা যাচ্ছে না লোকটা বেঁচে আছে কিনা।

রাত এখন সাড়ে তিনটে। মিসেস কারলো ঘড়িটা দেখলেন। গাড়িটা নামিয়ে দিয়ে গেল এনিটা লো-কে। মিসেস কারলো বড় বড় চোখে তাকালেন। হ্যাঁ এনিটা—লাল পোশাক পরেই সে গিয়েছিল। কাছে আসতে চিনতে অসুবিধে হল না। না সঙ্গে কোন সঙ্গী পুরুষ নেই। একাই সে সিঁড়ি দিয়ে উঠছে। তার ধারণা হয়ত তার ল্যাণ্ডলেডি ঘুমিয়ে পড়েছেন। এতরাতে তো কারো জেগে থাকার কথা নয়। সিঁড়িতে স্পাইক হিলের শব্দ হল। ওপরে উঠে চাবি দিয়ে তালা খুললো। ঘরে ঢুকলো। এবারও ঘরে আলো জ্বালার কোন শব্দ হল না। মনে হয় এনিটার অন্ধকারে চলাফেরা করার অভ্যাস আছে। সে হয়ত অন্ধকারে হাঁটাচলা করতেই ভালবাসে।

তারপর সেই মুহূর্ত এলো।

পুরুষের কণ্ঠস্বর নিচু গলায়—নরম নরম। দু' একটা কি কথা হল। এনিটা বিস্মিত হয়ে জোরে চিৎকার করতে গিয়েও চুপ করে গেল। মনে হয় সে ভাবলো এই অসময়ে চিৎকার করলে তার প্রতিবেশীদের ঘুম ভেঙে যেতে পারে। কয়েক সেকেণ্ডের জন্য নীরবতা। তারপর আবার স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কথাবার্তা। দূর ছাই কিছুই বোঝা যাচ্ছে না ওদের কথাবার্তাগুলো। ভিতরে ভিতরে অস্থির হয়ে ওঠেন মিসেস কারলো।

আচ্ছা ওদের মধ্যে কি কথাবার্তা হতে পারে? আর্থারের অভিলাষ কি? আর এনিটা কি ভাবে তার অভিযোগগুলোকে খণ্ডন করছে? আর্থার নিশ্চয় এনিটার কোন কথাকেই আর বিশ্বাস করছে না। এমন অবস্থায় কোন পুরুষের পক্ষে তার স্ত্রীকে আর বিশ্বাস করা সম্ভব হয় না। মিসেস কারলো কান জোড়া সতর্ক করে রাখা সত্ত্বেও কিছু শুনতে পেলেন না। নিজের এই অক্ষমতার জন্য নিজেকে তার দোষী বলে মনে হল। এই কারণেই একসময় তার ইচ্ছে ছিল, প্রতিটি ভাড়াটের ঘরে একটা করে মাইক্রোফোন রেখে দেবেন, যাতে করে তিনি তাদের সমস্ত গোপন কথাবার্তা নিজের ঘরে বসে শুনতে পান।

বেশ কিছুক্ষণ এইভাবে চললো। তারপর একসময় সোফার আওয়াজ হল। মনে হয় আর্থার লো উঠে দাঁড়ালো। এবার ওদের কণ্ঠস্বর উঁচুতে উঠে ছিল। আর্থার কি বলছিল—এনিটাও উত্তর দিল জোরালো গলায়। এখন মিসেস কারলো এনিটার গলাই বেশি শুনতে পাচ্ছেন। কণ্ঠস্বরটা মোটেই স্বাভাবিক নয়—ভয় পেলে যেমন হয় ঠিক তেমনি। এনিটা কি ভয় পেয়েছে? শেষ পর্যন্ত এনিটা মনে হয় বুঝে গেছে, আর্থারের কাছে তার আর লুকোবার মত কিছু নেই।

আবার নীরবতা। সেটা এত দ্রুত ঘটলো যে মিসেস কারলো প্রথমে মনে করলেন বুঝি তিনি তার শ্রবণ শক্তি হারিয়ে ফেলেছেন। ওপরের বিতর্ক আলোচনা এমনভাবে শেষ হল, যেন টেলিভিসন চলতে চলতে হঠাৎ সেটার পিকচার টিউব অকেজো হয়ে পড়ার মতন।

· আচ্ছা এখন, কিছু করছে? নিশ্চয় ওরা পরস্পরের বাহুবন্ধনের মধ্যে নেই। তাহলে...মিসেস কারলো ভাবতে বসলেন। না—আবার শব্দ শোনা গেল। এই শব্দ পরিবর্তনের হঠাৎ হঠাৎ কারণগুলো ঠিক মত বুঝে উঠতে পাচ্ছিলেন না মিসেস কারলো। সোফার আওয়াজ হল। মনে হয় আর্থার সোফায় বসে নেই। মাথার উপর ঘরময় পায়চারির শব্দ হচ্ছে—পায়ের এই শব্দ বলে দিচ্ছে এটা আর্থারের পায়চারি করার শব্দ। এইভাবে অবিন্যস্ত পায়চারির কোন কারণ খুঁজে পাচ্ছিলেন না মিসেস কারলো। শেষ পর্যন্ত একটা আলো জ্বলে উঠলো। ওমা—আবার নিভে গেল দেখছি আলোটা। আবার সেই অন্ধকার। আবার পায়চারি করেই চলেছে। এনিটা মনে হয় সোফায় বসেছিল।

না—সোফাটা আবার কেঁপে উঠলো। তারপর মেঝের উপর একটা জিনিস গড়াগড়ি যাচ্ছিল, যা কারো পায়ে চলার আওয়াজ বলে মনে হল না। তবে কি কোন ভারি জিনিস টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল? বসার ঘর থেকে শোবার ঘর...এরপর শব্দটা থামলো। তার বদলে মৃদু চিৎকার। কার কণ্ঠস্বর ঠিক বোঝা গেল না। আবার দুমদাম শব্দ। আবার চিৎকার।

এবার মনে হল এক জোড়া পায়ের শব্দ সোফার সামনে ফিরে এলো। আর্থারের পায়ের শব্দ মনে হয়। সোফার উপর বসলো সে। স্তব্ধ মুহূর্ত। আবার উঠে দাঁড়ালো। ঘন ঘন পায়চারি করছে। এনিটার আর কোন সাড়াশব্দ নেই। এখন প্রায় পাঁচটা। ভোর হয়ে আসছে।

মিসেস কারলোর মাথার মধ্যে বেশ কিছু অশুভ চিন্তা দানা পাকাতে থাকে। ঠিক সেই মুহূর্তে ওপর তলার অ্যাপার্টমেন্টের প্রবেশ পথে একজোড়া পায়ের শব্দ থমকে দাঁড়িয়ে নীরব হল। মনে হয় আর্থার দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। একসময় দরজা খোলা ও বন্ধ করার শব্দ হল। সেই সঙ্গে অটোমেটিক লকের শব্দ। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ।

আর্থার নামছে।

মিসেস কারলো জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন এমনভাবে দাঁড়ালেন যাতে কেউ তাকে দেখতে না পায়। একটু পরে তিনি দেখতে পেলেন আর্থার লো বেরিয়ে যাচ্ছেন...খুব জোর পায়ে। হয়ত সে তার গাড়িটা দূরে কোথাও পার্ক করে রেখেছিল। মিসেস কারলো হাজার চেষ্টা করেও আর কিছু দেখতে পেলেন না।

আর্থার চলে গেল। মিসেস কারলো এবার ভাবতে লাগলেন। আশ্চর্য—আর্থার এলো আবার চলে গেল। তাহলে সে এসেছিল কি করতে? মিসেস কারলো ভেবেছিলেন আর্থার হয়ত দৈহিক বল প্রয়োগ করবে—এনিটা চিৎকার করবে—কাঁদবে—এসব কিছু ঘটলে না হয় তিনি ল্যাণ্ডলেডি হিসাবে উপরে উঠতে পারতেন। কিন্তু এসব কিছুই হল না।

ঝগড়া ওদের মধ্যে হয়ত হয়েছিল, কিন্তু এই ঝগড়া এমন কিছু সাংঘাতিক নয়। সাংঘাতিক ঘটলে আশপাশের সকলে জানতে পারতো।

মিসেস কারলোর চোখে আর ঘুম এলো না। বাকিটা সময় তিনি জেগেই কাটালেন। উপরের ঘর থেকে শোনা গেল না এনিটার কান্নার স্বর। তবে কি এনিটা এখনও সোফার উপর বসে আছে।

সকাল হল, তবু প্রশ্নটা অনুত্তর থেকে গেল। মিসেস কারলো ভিতরে ভিতরে উত্তেজনা বোধ করলেন।

মিসেস কারলোর কাছে দিনটা ছিল খুবই বেদনাদায়ক। সকাল গড়িয়ে দুপুর হয়ে গেল—ওপরতলায় কোন সাড়া শব্দ নেই। দুপুরে ভাড়াটেরা যে যার ঘরে। মিসেস কারলো পা টিপে টিপে উপরে উঠলেন। ২-এ অ্যাপার্টমেণ্টের দরজায় ঘা মারলেন। কোন সাড়া নেই। ঘণ্টা বাজালেন। দরজা যেমন বন্ধ তেমনি বন্ধ রইল। মনে হয় মেয়েটা ঘুমিয়ে পড়েছে। এবার টেলিফোনের ডায়াল ঘোরালেন এনিটার নম্বরে।

টেলিফোনে রিং হতে লাগলো—কেউ ধরলো না। এরপর বেশ কয়েকবার টেলিফোন করলেন মিসেস কারলো কিন্তু রিসিভার কেউ তুললো না।

এনিটা লো যে ঘর ছেড়ে যায় নি—সে যে ওই ঘরে আছে এই ব্যাপারে মিসেস কারলো নিশ্চিত ছিলেন। তাহলে সন্ধ্যে হয়ে গেল এখনও সে উঠলো না ঘুম থেকে।

আশ্চর্য গোটা দিনে ওপরের ঘরের কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। রাতে মিসেস কারলো ঘুমলেন বটে তবে কান খাড়া করে রাখলেন। পরের দিন তিনি সকালে যখন ঘুম থেকে উঠলেন তখন বেশ বোঝা গেল তিনি আদৌ রাতে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমতে পারেন নি।

সকাল তখন দশটা হবে—অনেকদূর থেকে একটা টেলিফোন এলো। মিসেস কারলো রিসিভার তুললেন। ওপাশ থেকে ভেসে এলো আর্থারের কণ্ঠস্বর। সে শুধু বললো, মিসেস কারলো, আমার স্ত্রী এখন আমার কাছে চলে এসেছে। আর সে ঠিক করেছে এখন আর ওখানে ফিরে যাবে না। তবে আপনার অ্যাপার্টমেন্টটা আপাতত ছাড়ছি না আমরা। ভাড়াটা আপনাকে পোস্টে পাঠিয়ে দেব। কিন্তু আমার স্ত্রী কয়েকটা জিনিস এখুনি এখানে পেতে চায়। সেই সব জিনিসগুলো আমাদের একটা ফ্যান্সি ট্রাঙ্কের মধ্যে আছে। ট্রাঙ্কের গায়ে ফুলের ছবি আঁকা। ওয়েল আপনি একটা কাজ করবেন মিসেস কারলো?

—কি কাজ?

—দয়া করে ওই ট্রাঙ্কটা কোন এক্সপ্রেস ম্যানকে ডেকে আমার এখানে পাঠিয়ে দেবেন। এরপর ভাবনা আমার।

—ঠিকানা?

আর্থার ঠিকানা বললে। মিসেস কারলো লিখে নিলেন। স্বভাবত—আর্থার লো এমন জোর করলো যে মিসেস কারলো তার অনুরোধ প্রত্যাখান করতে পারলেন না। তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন দ্রুত পাঠিয়ে দেবেন।

—দ্রুত মানে আজকালের মধ্যে।

—ঠিক আছে।

আর্থার টেলিফোন নামিয়ে রাখলো।

এর পরেই মিসেস কারলোর কৌতূহল বেড়ে গেল। তিনি তার নিজের কাছে থাকা চাবিটা নিয়ে চুপিচুপি সটাং উপরে উঠলেন। তারপর খুব সন্তর্পণে ভিতরে ঢুকে একবার চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিলেন। না—কোথাও কোন অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়লো না।

বাইরের ঘর থেকে বেডরুম সবকিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলেন তিনি। সত্যি খাটের নিচে একটা বড় সাইজের ট্রাঙ্ক তার নজরে পড়লো। তিন কি সাড়ে তিন ফুট লম্বা আর চওড়া দুই ফুট এবং উঁচুও হবে হয়ত দু'ফুটের মত। সবুজ রঙের উপর লাল গোলাপ ফুলের ছবি আঁকা। ট্রাঙ্কটা বেশ ভালভাবে লক করা ছিল, দেখেই বোঝা গেল।

ব্যাপারটা দেখে সব কিছু মনে মনে আন্দাজ করে নিলেন মিসেস কারলো। মনে মনে হাসলেন। ভাবলেন, নিজেকে বড় বেশি চালাক মনে করেছে আর্থার। ও ভেবেছে ওর অন্ধকারে চোরের মত আসাটা কেউ জানতে পারে নি—আরে বাবা আমার নাম মিসেস কারলো। কম ভাড়াটে তো দেখলাম না। দেখাই যাক কোথাকার জল কোথায় গড়ায়।

খুনটা হয়েছিল সোমবার রাত্রে। আরও স্পষ্ট করে বলা যায় মঙ্গলবার ভোর

হবার খানিক আগে। বুধবার সকালে অনেকদূর থেকে আর্থার লো-র ফোন পেয়েছিলেন।

এরপর পরের সোমবার এলো চিঠি।

চিঠিটা এলো বিশেষ ডাকে। চিঠিতে মিস্টার আর্থার অনুরোধ করে লিখেছেন, যদি ট্রাঙ্কটা না পাঠানো হয়ে থাকে তাহলে যেন তিনি এখুনি তা পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। তাগিদটা মিসেস কারলোকে দেওয়া হয়েছিল এই কারণেই যে তিনি আর্থারের ফোন পাওয়া সত্ত্বেও তা অস্বীকার করেছেন।

মনে মনে হাসলেন।

ধড়িবাজ ছেলে। বড্ড চালাক।

মিসেস কারলো মনে মনে ঠিক করে ফেলেছেন এনিটা লো-র জন্য তিনি কোন রকম শোক প্রকাশ করবেন না। তার বিশ্বাস এনিটার মত মেয়ের উপযুক্ত শাস্তি হয়েছে। তিনি এই শাস্তিতে খুশি। আর এটাও ঠিক তিনি আর্থারকে পুলিশে দেবার পক্ষপাতী নন। সে ইচ্ছেও তার নেই।

কিন্তু প্রশ্ন একটা সেটা হল বকেয়া ভাড়া। ভাড়াটা বেশ কয়েক মাসের পড়ে আছে। আচ্ছা এখন তো আর আর্থারকে এনিটার মত মেয়েকে পুষতে হবে না, তাহলে তো ভাড়াটা দিয়ে দিলেই পারে। ভাড়া না মিটিয়ে বাক্স নিয়ে চম্পট দেবে—এটা হবে না। ভাড়া কি করে আদায় করতে হয় তা মিসেস কারলো জানেন।

মিসেস কারলো এনিটা লো-দের ট্রাঙ্কটা হাতে পাওয়ার পর থেকে নিজের ক্ষমতার কথা ভেবে মনে মনে আনন্দ উপভোগ করতে থাকেন। আচ্ছা বেকায়দায় পড়েছে আর্থার বেচারা। ট্রাঙ্কটা তার কাছে জরুরী—আর ট্রাঙ্কটা এখন আমার অধিকারে। যে কোন সাইকোলজিস্ট যদি এখন মিসেস কারলোকে পরীক্ষা করতেন, তাহলে বুঝতে পারতেন এই ধরনের ক্ষমতা পাওয়ার জন্য অনেক কষ্ট করে তিনি এতবড় একটা বাড়ির অধিকারিণী হতে পেরেছেন। তিনি তার ক্ষমতার অধিকারেই প্রত্যেকের উপর খবরদারি করে থাকেন। এখন তিনি তার ব্ল্যাকমেল স্কীমের সাফল্যে আনন্দ উপভোগ করছেন। আর্থার লো-র কোন অনুরোধকে এখন আর পাত্তা দিতে ইচ্ছে করছে না মিসেস কারলোর।

আচ্ছা গোটা ব্যাপারটার জন্য কেউ যদি তার দারোয়ানের কাজের জন্য দায়ী করে—তাহলে কি করবেন? বিচার—চাইবেন। সবসময় তিনি যথার্থ বিচারের দাবী করেছেন।

আর্থার লো-র চিঠিটা ওয়েস্ট পেপার বক্সে ফেলে দিলেন। ছোঃ—এটার কি মূল্য আছে? দলা পাকিয়ে চিঠিটা আবর্জনার স্তূপে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নতুন করে কাগজকলম নিয়ে বসলেন। চিঠিটার একটা উত্তর ভদ্রলোককে দিতে হয়। চিঠিতে

বুঝিয়ে দিতে হবে ওই ট্রাঙ্কের মধ্যে কি বিশেষ মালপত্তর আছে তা আমি বুঝতে পেরেছি।

মিসেস কারলো লিখতে শুরু করলেন।

প্রিয় মিঃ লো,

তোমার স্ত্রীর ব্যাপারে তোমার চিঠির উত্তর দিতে গিয়ে আমার মনে হচ্ছে আমি বোধহয় তোমার মনটা অনেকটা হাল্কা করতে পারবো। একমুহূর্তের জন্যও তুমি মিসেস লো-র জন্য চিন্তা করো না। সে বেশ ভাল লোকের হাতেই আছে। তুমি আমার উপর পূর্ণ আস্থা রাখতে পারো। তোমার হয়ে আমি তার উপরে সব সময় কড়া নজর রেখে চলেছি। এই মুহূর্তে সে চিঠি লিখতে পাচ্ছে না বলে আমাকে লিখতে হচ্ছে। তবে আমার মনে হয় তুমি খুশি হবে খবরটা জানলে—তোমার স্ত্রী এখন আর একমুহূর্তের জন্যও বাড়ির বাইরে যায় না। মনে হয় সে এখন বাড়িতে থাকাটাই পছন্দ করছে বেশি। তুমি তার জন্য চিন্তা করো না।

তোমার অকৃত্রিম অন্তরঙ্গ

এম্মা কারলো

চিঠিটা ডাকে ফেলে মনে মনে হাসলেন। তিনি জানতেন এই চিঠি আর্থার লো-কে চঞ্চল করে তুলবে। বুঝতে পারবে কতবড় জাঁহাবাজ মেয়েছেলের পাল্লায় সে পড়েছে—চট করে এর হাত থেকে পালাবার কোন উপায় নেই তার।

চিঠিটা পাওয়ার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে লো শহরে ফিরে এলো, দিনের আলোয় সে এলো না। মিসেস কারলো জানতেন আর্থার আসবে এবং মধ্যরাত্রে আসবে। সেই কারণে তিনি সতর্ক ছিলেন।

সামনের দরজা দিয়ে প্রবেশ করার সময় তিনি তার পায়ের শব্দ পেলেন। আজকাল ঘুমটা ভীষণ পাতলা হয়ে গেছে। একটু শব্দ কানে গেলেই ঘুম ভেঙ্গে যায়। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হল, পরিচিত শব্দ। বুঝলেন আর্থার লো সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছে নিজের ঘরে যাওয়ার জন্য। ওর ধারণা তার ল্যাণ্ডলেডি ঘুমিয়ে পড়েছে। মনে মনে হাসলেন মিসেস কারলো।

আর্থার উপরে গিয়ে চাবি বার করে দরজাটা খোলার চেষ্টা করলো কিন্তু পারলো না। কি করে সে পারবে—ওখানে যে নতুন একটা চাবি লাগিয়ে দিয়েছেন মিসেস কারলো। কাজেই ব্যর্থ আর্থার বাধ্য হয়ে নিচে নেমে এলো। নক করলো মিসেস কারলোর দরজায়।

মিসেস কারলো দরজা খুললেন।

ভিতরে আসতে বললেন মিস্টার আর্থার লো-কে।

লো দ্রুত ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিল। মিসেস আর্থার দেখলেন এই

কদিনে লোকটা ক্লান্তিতে একেবারে শুকনো ব্যাঙের মত হয়ে গেছে। লেন্সের ভিতর থেকে ওর চোখ দুটো অস্বাভাবিক বড় লাগছে।

তবে লোকটার মেজাজটা বড় শান্ত। বাইরে থেকে কোনরকম উত্তেজনা বোঝা যায় না—ঠিক একটা পেশাদার খুনির মত তার হাবভাব। পেশাদার খুনি না হলে কেউ ওভাবে শান্ত মেজাজে নিজের স্ত্রীকে খুন করে, ট্রাঙ্কের মধ্যে ভরে রেখে আবার সহজে বেরিয়ে যেতে পারে। সে ভেবেছিল কেউ তাকে দেখতে পাই নি, তাই কোন সন্দেহ যাতে তাকে কেউ না করতে পারে, তার জন্য কত সহজভাবে টেলিফোন করে ছিল, চিঠিতে অনুরোধ করেছিল ট্রাঙ্কটা কোন ট্রাক ড্রাইভার মারফত তার ঠিকানায় পাঠিয়ে দিতে। কিন্তু তার ধারণা নেই যে তার ল্যাণ্ডলেডি কতটা সেয়ানা। আজ সে এসেছিল নিঃশব্দে মালটা সরিয়ে নিয়ে যেতে। কিন্তু তার আগেই আসল ব্যবস্থা করে রেখেছেন মিসেস কারলো নতুন একটা চাবি দিয়ে।

মিসেস কারলোকে দেখতে দেখতে মিস্টার আর্থার লো প্রশ্ন করলো—আপনি কি আমার অ্যাপার্টমেন্টের চাবি বদল করেছেন?

—হ্যাঁ।

—কেন?

—বারে তোমার ঘরে যে জিনিসগুলো আছে তার নিরাপত্তার কথা ভেবেই আমার এই ব্যবস্থা।

—আমাকে একবার জানানো উচিত ছিল।

—ঠিক সময় সেটা জানাতাম। এই তো এখন যেমন জানলে।

আর্থার লো তাকালো। তার বড় বড় চোখের দৃষ্টি দেখে মিসেস কারলো একদম ঘাবড়ালেন না। বরং তিনি সহজ হলেন।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আর্থার লো বললেন—আচ্ছা আমাদের মধ্যে ব্যবস্থা করলে হয় না।

মিসেস কারলো জিজ্ঞাসা করলেন—কি রকম ব্যবস্থা।

—যেমন ধরুন আপনি আমার কিছু সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছেন, সেটা ফেরৎ পেতে হলে আমাকে কত ডলার দিতে হবে?

মিসেস কারলো তার চেয়ারে বসে শরীরটা দোলাতে দোলাতে বললেন, আমি লোভি নই। তবে তোমার স্ত্রী আমার সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করেছে। তারজন্য যে শাস্তি পাওয়ার তা আমি তাকে দিতে চাই। জানো মিস্টার আর্থার সে তোমার সম্মান ডোবাতে বসেছিল। আমি তাকে বহুবার প্রতিবাদ করেছি, এভাবে তোমার সম্মান যাতে সে না ডোবায় তার জন্য। কিন্তু কে কার কথা শোনে—এরজন্য সে আমাকে বহুবার হেনস্থা করেছে। আমি আমার এই দুর্ভোগের জন্য কিছু পেতে চাই।

—কত ডলার?

—দেখ দর কষাকষি আমার ভাল লাগে না। দশ হাজার ডলার হলেই আমার কাজ চলে যাবে।

—দশ হাজার।

—হুঃ তার এক ডলারও কম নয়।

—চেষ্টা করবো।

—হ্যাঁ চেষ্টা করলে তুমি দিতে পারবে।

—কিন্তু কি ভাবে বা কতদিনে পারবো বলতে পাচ্ছি না।

—তার জন্য আমি তোমাকে সময় দেব। ইতিমধ্যে তোমার স্ত্রীর যত্ন আমি ভালভাবে নিয়েছি—সে কথাতো তোমায় চিঠিতে লিখেছি।

—হ্যাঁ, আপনি লিখেছেন বই কি।

—তবে একটা কথা বলি, রাত্রে এসে তালা ভাঙার কোন চেষ্টা করো না তোমারই তাতে বিপদ হবে। আমি পুলিশকে জানাতে বাধ্য হব।

—পুলিশ।

—হ্যাঁ। আর বেশি দেরি করো না। আর একটা কথা, কাল থেকে প্রতিদিনের জন্য একহাজার ডলার করে আলাদা দিতে হবে। বুঝেছ।

—আমি তো এখনও ঘরটা ছাড়িনি, আপনাকে আমি আমার ঘরে ঢুকতে দিতে নাও পারি।

—তাতে বরং ক্ষতি তোমার হবে। আইন, আইনের পথে চলবে আর তুমি পুলিশের কাছে ধরা পড়ে যাবে।

এই অবস্থায় আর আলোচনা বাড়ানোর প্রয়োজন নেই মনে করে চুপ করে গেল আর্থার। মিসেস কারলো বললেন—কি ভাবছ? তুমি আমার দাবী মেটাতে যে কোনদিন যে কোনসময়ে আসতে পারো, আমি এখানেই আছি আর এখানেই থাকবো।

আর্থার লো বেরিয়ে গেল।

মিসেস কারলো দরজা বন্ধ করে দিলেন। আর ভাবলেন কাজটা মনে হয় ঠিক হল না। ব্যাপারটা পুলিশকে জানিয়ে দেওয়াই ভাল। আবার সঙ্গে সঙ্গে একটা দুর্বলতাও দেখা দিল। একথা ঠিক তিনি একজন খুনির সঙ্গে মোকাবিলা করতে চলেছেন। লোকটা খুব বুদ্ধিমান। সে যেভাবে তার স্ত্রীকে খুন করেছে, সেই ভাবে ঘায়েল সে তাকে করতে পারবে না। বুদ্ধিতে তিনিও কম যান না, সেটা ওই খুনি লোকটা ভালই বুঝেছে। এত সাহস তার আর হবে না। একটা খুন করেই সে বুঝে গেছে খুন করাটা সোজা হলেও, তার ঝক্কিটা অনেকটা বেশি—এখনও সে একটা খুন থেকে নিষ্কৃতি পাই নি। প্রথম খুনের মৃতদেহটা এখন ওই ট্রাঙ্কের মধ্যে পচছে।

এর উপর আবার দ্বিতীয় খুন—দ্বিতীয় মৃতদেহটা সে কোথায় রাখবে? সেই জায়গা কোথায়?

ওই ফ্যান্সি ট্রাঙ্কে তো আর দ্বিতীয় মৃতদেহটা চালান দেওয়া যাবে না। এতটা জায়গা ওর মধ্যে নেই।

এবার এই চিন্তাটা তাকে অজগর সাপের মত চারপাশ থেকে পেঁচিয়ে ধরলো। তার মনে হল ওই লোকটা যদি তাকেও খুন করে ওই বাক্সের মধ্যে রাখে তাহলে তো বাক্সটা ভারি হয়ে যাবে—তার একার পক্ষে ওই বাক্স বহন করে এখান থেকে বার করে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব ব্যাপার। এত শক্তি ওর মধ্যে নেই। এনিটা পাতলা চেহারার ছোট্ট মেয়ে—তার ওজন হাল্কা। কিন্তু তার ওজন তো আর এনিটার মত হাল্কা নয়—এনিটার চাইতে অন্ততঃ বিশ গুণ ভারি। অতএব ওই বাক্সের মধ্যে দুটো মৃতদেহ ভরে রাখা একরকম প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।

তবু মিসেস কারলোর মধ্যে খটকা বাধলো। তার মনে হল বাক্সটা একবার ভালভাবে পরীক্ষা করা দরকার। দেখা দরকার দু'দুটো মৃতদেহ ওই বাক্সের মধ্যে ভরা যায় কি না।

মিসেস কারলোর স্বভাবের এক মস্ত দোষ কোনকথা একবার ভাবলে, সেটা যতক্ষণ না করছেন ততোক্ষণ স্বস্তি পান না। অতএব তার মনে হল যা দেখার তাকে এখুনি দেখতে হবে। এবার তিনি দরজা বন্ধ করে নিজের শয়নকক্ষে প্রবেশ করে টেবিলের দিকে গেলেন। টেবিলের উপর একটা সুন্দর হাতির দাঁতের ফুলদানি। তার মধ্যে নতুন চাবিটা তিনি লুকিয়ে রেখেছিলেন। চাবিটা বার করে হাতের মুঠোয় নিলেন। তারপর একসময় ফ্লাশ লাইটের আলো ঝলসে উঠে নিভে গেল। সিঁড়িতে আলো জ্বালিয়ে উঠতে চান নি। কারণ আর্থার লো হয়ত কাছে পিঠে কোথাও ওঁত পেতে থাকতে পারে—লোকটা যা ভয়ানক খুনি।

খুব ধীরে তিনি সিঁড়িতে পা রাখলেন। ধীরে ধীরে উপরে উঠলেন। দরজার সামনে দাঁড়ালেন। নতুন চাবি—সামান্য ঘোরাতেই শব্দ ছাড়া খুলে গেল। তবে দরজাটা খারাপ—অনেকদিনের তৈরি। তাই সামান্য ঠেলা দিতেই ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ হল।

মিসেস কারলো ভিতরে গেলেন, দরজাটা বন্ধ করলেন না ভিতর থেকে। কেবল আলতো ভাবে ভেজিয়ে রাখলেন। মুহূর্তের ব্যাপার—তিনি সরাসরি এসে দাঁড়ালেন ট্রাঙ্কের সামনে।

হাতের টর্চটা জ্বাললেন মিসেস কারলো। ট্রাঙ্কটা যেখানে ছিল ঠিক সেই জায়গায় আছে। এবার কাছে এগিয়ে গিয়ে ট্রাঙ্কের মাপটা দেখলেন। কত সাইজ হতে পারে? সাড়ে তিনফুট লম্বা—তাইতো মনে হয়। কিংবা বড় জোর চার ফুট। দেহটাকে মনে হয় দুমড়ে মুচড়ে রাখা হয়েছে। চওড়ায় দু'ফুটের বেশি নয়—যে

ভাবেই হোক দুটো মৃতদেহ এর মধ্যে রাখতে গেলে দেহ দুটো দুমড়ে মুচড়ে রাখতে হবে। যেমন এনিটার হাঁটুর কাছে তার মুখ, আবার তার মুখের দিকে এনিটার হাঁটু।

তাহলে নিশ্চয় ভারি কিছু দিয়ে হাড়গোড়গুলোকে তার ভাঙ্গতে হবে। ভাবতে গিয়ে একটা আতঙ্ক পেয়ে বসলো। চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু পরক্ষণে মনে হল চিৎকার করলে এই মুহূর্তে বিপদটা তার নিজেরই হবে। আচ্ছা হঠাৎ তার ট্রাঙ্কের দিকে তাকিয়ে ভয় করছে কেন? ট্রাঙ্কটার জন্য? নাকি অন্য কিছু। ট্রাঙ্কের মধ্যে একটা মৃতদেহ আছে। অন্ধকারে এনিটা লো-র মুখটা ভেসে উঠলো। মনে হল মেয়েটা যেন চিঁ চিঁ শব্দ করছে। তবে এনিটা এখনও মরে নি?

হঠাৎ তার মনে হয় দরজাটা খুলে গেল। কে এলো ঘরে—আর্থার। কি আশ্চর্য শয়তান লোকটা তাহলে কাছাকাছি কোথাও লুকিয়ে ছিল। তাকে কি লোকটা ফাঁদে ফেলতে চায়?

এবার মিসেস কারলো পায়ের শব্দ শুনতে পেলেন। পায়ের শব্দ দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে বসার ঘর থেকে এগিয়ে আসছে শোবার ঘরের দিকে। কি বোকা তিনি—কি ভুলই না করেছেন। তিনি তাকে কত সহজে না ঘরের মধ্যে ঢোকার সুবিধে করে দিয়েছেন। দরজাটা ভেজিয়ে না রেখে বন্ধ করে রাখলে কিছুতেই আর্থার ভিতরে প্রবেশ করতে পারতো না। মিসেস কারলো ট্রাঙ্কটার দিকে পিছন করে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ভয়ে তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছিল। তিনি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন যে তিনি খুন হতে চলেছেন। কেউ তাকে বাঁচাতে পারবে না। তিনি যদি এই মুহূর্তে খুন হন আর্থার লো-র হাতে তাহলে তার মৃত্যুর জন্য কোন সাক্ষী থাকবে না।

আচ্ছা যদি তিনি আর্থারের হাতে খুন হন, তাহলে কি লোকটা তাকে ওই ট্রাঙ্কের মধ্যে কবর দেবে? তিনি এবং এনিটা লো এক সাথে কবরে স্থান পাবেন? আচ্ছা তিনি কেন চিৎকার করতে পাচ্ছেন না। তার উচিত এই সময় কারো সাহায্য চাওয়া। মিসেস পিয়ারসন, মিসেস স্টুয়ার্ড, মিসেস স্মিথ এদের নাম ধরে চিৎকার করে ডাকা।

হঠাৎ তার মনে হল ঘরটা আর অন্ধকার নয়। একসঙ্গে অনেকগুলো পায়ের শব্দ তাকে যেন ঘিরে ধরেছে। বুঝলেন আর্থার লো এবার একা আসেন নি। তাকে খুন করার জন্য তার নিজস্ব লোকজনকে নিয়ে এসেছেন। অতএব মৃত্যু এখন নিশ্চিত।

ক্লিক করে একটা শব্দ হল। মনে হল কেউ একজন সুইচে হাত দিল। ঘর আলোকিত হয়ে উঠলো। মিসেস কারলো দেখতে পেলেন তাকে ঘিরে একদল গোয়েন্দার মত লোক দাঁড়িয়ে আছেন। আর্থার লো তাদের উদ্দেশে চিৎকার করে

বলছে, অফিসার লক্ষ্য করুন ওই ট্রাঙ্কটা। আমার মনে হয় এই ট্রাঙ্কটা এখুনি আপনাদের খোলা দরকার। আমার বিশ্বাস এই মহিলা আমার প্রিয়তমা স্ত্রীকে খুন করে ওই ট্রাঙ্কের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে।

ঘটনাচক্রে সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণ মিসেস কারলোর ধারণাকে বদলে দিল। তিনি যা অনুমান করেছিলেন তা সব ভুল। যদিও ডাক্তার মৃত এনিটা লো-র মৃতদেহ পরীক্ষা করে মৃত্যুর সঠিক দিন ও সময় জানিয়ে দিলেন। কিন্তু মিসেস কারলো কিছুতেই প্রমাণ করতে পারলেন না হত্যাটা মিস্টার আর্থার লো করেছেন। তিনি সমস্ত কিছু দেখেছেন। তার কথাকে কে বিশ্বাস করবে—কারণ আর্থার লো-কে অন্য কেউ আর এর আগে এখানে আসতে দেখেনি। সবাই জানেন মিস্টার আর্থার লো কাজের তাগিদে বাইরে ছিলেন। সে যে এই সময় শহরে ছিল এটা প্রমাণ করা মিসেস কারলোর পক্ষে কঠিন হয়ে পড়লো। কি দিয়ে তিনি প্রমাণ করবেন? টেলিফোন—মনে হয় আর্থার দূরবর্তী কোন পাবলিক বুথ থেকে সেদিন টেলিফোন করেছিল মিসেস কারলোকে, যার কোন রেকর্ডিং নেই। আর জন আর্থারের চিঠি? সেটাও তিনি মূল্যহীন মনে করে ছিঁড়ে দলা পাকিয়ে ওয়েস্ট পেপার বাক্সে ফেলে দিয়েছিলেন—যা এতক্ষণে শহরের কোন ময়লার গাদার নিচে তলিয়ে গেছে।

অন্যদিকে মিসেস পিয়ারসন, মিসেস স্টুয়ার্ড, মিসেস স্মিথ—সবাই উঁচিয়ে আছেন মিসেস কারলোর বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবার জন্য। ডাক্তারের হিসাব মত মৃত্যুর দিন অপরাহ্নে তারা দেখেছে মিসেস কারলোর সঙ্গে মিসেস এনিটা লো-র কথা কাটাকাটি হতে। ঝগড়া হতে...এনিটা নিজের ঘরে ফিরে যাওয়ার পরেও মিসেস কারলো ভয়ানক ভাবে চিৎকার করেছেন। মনে হয় এনিটার মৃত্যুর জন্য তিনি ছাড়া আর কেউ দায়ী হতে পারেন না। সবাই তো জানে মিসেস কারলো খুব রাগী বেপরোয়া মেয়েছেলে—রেগে গেলে তিনি মাথার ঠিক রাখতে পারেন না—যাকে যা না বলার বলে ফেলেন। আর সবচেয়ে বিপক্ষে গেল মিসেস কারলোর লেখা মিস্টার আর্থার লো-কে চিঠিটা। এই চিঠিতে মহিলা লিখেছিলেন আর্থারকে এখন থেকে স্ত্রী আর কখনও বাইরে যেতে পারবে না। সে পথ তার বন্ধ।'—এনিটা লো-কে খুন না করলে কেউ এমন কথা লিখতে পারে।'

—এই নিন ইন্সপেক্টর সেই চিঠি। এই বলে আর্থার লো চিঠিটা ইন্সপেক্টরের হাতে তুলে দিয়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। আর মিসেস কারলো পাথরের মূর্তির মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন আর্থার লো-র দিকে।

রিমেন্স-টু-বি-সিন

জ্যাক রিচি

আপনারা তো আচ্ছা মশাই—বাড়িটার কি অবস্থা করেছেন একবার দেখেছেন? হতে পারেন আপনারা পুলিশের লোক, তা বলে অন্যের সম্পত্তি এমন ভাবে নষ্ট করবেন। আমি একজন সুস্থ নাগরিক নিয়মিত সরকারকে কর দিই—কাজেই এই সম্পত্তি সম্পর্কে আমার নিশ্চয় সুস্থ ভাবনা চিন্তা আছে। ভাঙচুর আপনারা করছেন করুন—আমার তাতে কোন আপত্তি নেই—তবে আমার দাবী হল আবার সব কিছু আগের মত, অর্থাৎ যেমন ছিল সেই ভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে দেবার ব্যবস্থা করবেন।

আমার কথাটা কানে যেতেই গোয়েন্দা কর্তা সার্জেন্ট লিটলার বললেন, মিঃ ওয়ারেন এখন ও সব নিয়ে আর চিন্তা করবেন না। আমরা কিছু পাই বা না পাই সবকিছু ঠিক যেমন ছিল সেইভাবে আমরা সাজিয়ে গুছিয়ে দেব।

আমি বেশ বুঝলাম উনি কি বলতে চান। ওঁর কথা হল আমার বাড়ির সীমানার মধ্যেই আমি আমার স্ত্রীর মৃতদেহ নাকি লুকিয়ে রেখেছি। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে উনি তল্লাসি করছেন এবং মজার ব্যাপার হল এখনও কিছু পাননি।

আমি সার্জেন্ট লিটলারের দিকে এগিয়ে গিয়ে বললাম—আপনাদের মেরামতের অনেক কাজ করতে হবে। আপনার লোকেরা আমার বাগানটা কি ভাবে খুঁড়ে খুঁড়ে সর্বনাশ করেছে দেখেছেন! ছিঃ ছিঃ, এটা কি একটা কাজের ধরন হল। দেখে মনে হচ্ছে গোটা জমিটায় লাঙল চষা হয়েছে। কার্যত আপনারা গোটা বাড়িটা ভেঙে ফেলার চেষ্টা করছেন। আজ আবার দেখছি নিচের তলায় মেঝে খোঁড়ার জন্য জ্যাক হ্যামার চালাচ্ছে।

আমরা রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলাম। সার্জেন্ট লিটলারের হাতে ছিল কফির কাপ। উনি প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস নিয়ে ওনার একজন সহকর্মীকে প্রশ্ন করলেন—আচ্ছা বলতে পারো আমেরিকার আয়তন কত হবে?

—কত আর ৩,০২৬,৭৮৯ বর্গ মাইল?

—আচ্ছা আলাস্কা ও হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ কি এই ম্যাপটার অন্তর্গত?

—আমার মনে হয় ও দুটোকে বাদ দিতে পারি।

—যদি তাই হয়, তাহলে এই আয়তনের মধ্যে পড়ছে পাহাড় পর্বত, সমতলভূমি, শহর, চাষের জমি, মালভূমি এবং জল অর্থাৎ সমুদ্র ইত্যাদি। তবু

আমার বিশ্বাস এত জায়গা থাকতে মানুষ তার স্ত্রীকে খুন করে অবশ্যই সে তাকে নিজের জমিতে কবর দিয়ে থাকে।

কথাটা কানে যেতে আমি মনে মনে বললাম, তাতো দেবেই। কারণ সেটাই হল নিরাপদ জায়গা। বনে জঙ্গলে কবর দিলে হয়—স্কাউটরা খোঁড়াখুঁড়ি করতে গিয়ে মৃতদেহটা আবিষ্কার করে ফেলতে পারে—এতো বিপদে পড়ার সম্ভাবনা থাকে অনেক বেশি।

আমাকে গুম হয়ে থাকতে দেখে সার্জেন্ট বললেন—আপনার জমির আয়তন কত মিঃ ওয়ারেন?

—ন' হাজার বর্গ ফুট। বিশ্বাস করবেন এই বাগানটা তৈরি করতে গিয়ে আমার কত বছর আর কত ডলার খরচ হয়েছে। আর আপনারা মশাই সেই বাগানটা রাতারাতি একবারে মাটি খুঁড়ে বেহাল করে দিয়েছেন।

—আপনার শৌখিনতাকে প্রশংসা না করে উপায় নেই, তবু আমাদের এ কাজ করতে হচ্ছে। তবে মিঃ ওয়ারেন এই তো সবে শুরু, আমার ভয় হচ্ছে আপনার উদ্বেগ হয়ত আরো বাড়তে পারে কারণ আরো কতদূর পর্যন্ত খুঁড়তে হবে কে জানে।

রান্নাঘরের জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছিল, বাগানে দশ-বারোজন শ্রমিক খোঁড়াখুঁড়ির কাজ করছে। কয়েকজন পুলিশ আছে ওদের কাছাকাছি। দূরে দাঁড়িয়ে সার্জেন্ট লিটলার ওদের কাজ লক্ষ্য করছিলেন। ভদ্রলোক আমার দিকে ফিরে বললেন—মিঃ ওয়ারেন আপনি একদম ভাববেন না, আমাদের কাজ হবে অতি নিখুঁত। আমরা রান্নাঘরের ঝুল পর্যন্ত পরীক্ষা করবো। এমনকি ফার্নেসের ছাই—কিছুই বাদ যাবে না।

নিচে জ্যাক হ্যামার দিয়ে মেঝে ভাঙছিল শ্রমিকরা। প্রচণ্ড শব্দ হচ্ছিল। এত শব্দ হচ্ছিল যে সার্জেন্ট দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

আমি বললাম—আচ্ছা বলুন তো, আমি ছাড়া এমিলিকে শেষবারের মত কারা দেখেছিল?

—মিস্টার ও মিসেস ট্রিম্বার।

উইলমা ট্রিম্বার ও এমিলির চেহারার মধ্যে একটা সাদৃশ্য আছে। পরবর্তীকালে ওরা দুজনেই বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল এলাকায়। স্বভাবে ও মনোভাবে ওরা দুজনেই প্রায় একরকম। ফ্রেড ট্রিম্বার একটু বেঁটেখাটো, শান্ত স্বভাবের লোক। তবে সে খুব ভাল দাবা খেলতে পারে। তার নিজস্ব ব্যক্তিত্ব না থাকার জন্য সে আমার দৃঢ় ব্যক্তিত্বের খুব প্রশংসা করতো।

সার্জেন্ট লিটলার বললেন—সেদিন মাঝরাতে ফ্রেড ট্রিম্বার এই বাড়ি থেকে একটা ভুতুড়ে আর্তনাদের শব্দ শুনেছিলেন।

—ভুতুড়ে?

—হ্যাঁ ওনার তাই ধারণা।

ফ্রেড ট্রিম্বারটা একেবারে মিথ্যুক। সরাসরি প্রতিবাদ করে বললাম—আমার বিশ্বাস তার স্ত্রীও এই শব্দ শুনে থাকবে।

—না, তিনি শোনেননি। আসলে ওই সময়ে তিনি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিলেন।

—তাহলে শব্দটা ফ্রেড একাই শুনেছিল?

—হ্যাঁ।

—বুঝেছি, আচ্ছা এই ভুতুড়ে আর্তনাদে মরিসেকসদের ঘুম ভাঙেনি?

—না। তারাও ঘুমিয়ে ছিল। তাছাড়া তাদের বাড়িটা আপনার বাড়ি থেকে বেশ খানিকটা দূরে। ট্রিম্বারদের মত পনেরো ফুটের মধ্যে নয়।

সার্জেন্ট লিটলার পাইপে তামাক পুরতে পুরতে বললেন—ফ্রেড ট্রিম্বার একবার ভেবেছিল সে তার স্ত্রীকে ঘুম থেকে জাগাবে। কিন্তু পরে সে মত পরিবর্তন করে। ভাবে যদি তার স্ত্রী রাগ করে।

আমি হাসলাম। মনে মনে বললাম—বেটা ছাগল, স্ত্রীকে এত ভয়। তাহলেই বুঝুন, ওর স্ত্রী কত মেজাজি।

এরপর সে আর কিছু শুনতে পায়নি। এরপর রাত দুটোর সময় সে আপনার বাড়ি থেকে আর একটা শব্দ শুনতে পায়। তখন সে জানলার সামনে এসে দাঁড়ায়। চাঁদের আলোয় পরিষ্কার দেখতে পায় আপনাকে বাগানের মাটি খুঁড়তে। এরপর সে তার স্ত্রীকে ডাকে। তারপর তারা দুজনে আপনাকে লক্ষ্য করতে থাকে।

—কি জঘন্য গুপ্তচর। তাহলে এভাবেই আপনারা জেনেছেন?

—হ্যাঁ, এবার বলুন তো মশাই কোন বাক্সে কবর দিয়েছেন। বাক্সটা কত বড়?

—তখন হাতের কাছে যা পেয়েছি সেটাই ধরে নিন ব্যবহার করেছিলাম কিন্তু সেটা দিয়ে তো আর কফিনের কাজ হয় না।

তারপর একটু থেমে আমি বললাম—বাক্সটা তো উদ্ধার করার জন্য আপনারা চেষ্টা করছেন, সেটাই করুন।

সার্জেন্ট তাকালেন।

আসলে ভদ্রলোকের সন্দেহটা প্রথমে হয়নি। পরের দিন শনিবার ফ্রেড টিম্বার সারাটা দিন ভেবেছেন। পরে আপনি তাকে যখন বললেন আপনার স্ত্রী হঠাৎ বাইরে গেছেন, এবং কিছুদিনের মধ্যে সে ফিরবে না—এই কথা শোনার পর তার মধ্যে সন্দেহ হয়। বিশেষ করে সন্দেহ হয় মিসেস ট্রিম্বারের। শেষ পর্যন্ত তাঁরা ধরে নিয়েছেন আপনি আপনার স্ত্রীকে....মানে আপনার স্ত্রীর মৃতদেহ সেই বাক্সে পুরে কবর দিয়েছেন।

আমি আরো কিছুটা কফি গলধঃকরণ করে বললাম—তা বেশ বেশ, সুন্দর ভাবনা চিন্তা। তো এখন বলুন তো আপনি এখানে এসে কি দেখেছেন?

—এখনো এই ব্যাপারে আমরা অন্ধকারেই সবাই পড়ে আছি। কেবল একটা মরা বিড়াল বাচ্চা মাটি খুঁড়ে পাওয়া গেছে।

—তাহলে ওই মরা বিড়ালটাকে কবর দেবার জন্য আমি দায়ী বলুন?

কথাটা বলে আমি হাসলাম।

সার্জেন্ট বললেন—মিঃ ওয়ারেন আপনি খুব চালাক লোক।

প্রথমে অস্বীকার করে বলেছিলেন আপনি কোন কিছুই কবর দেননি।

—ঠিকই। আমি মনে করেছিলাম বিড়ালের ব্যাপারটা তদন্তের মধ্যে পড়ে না।

—আর বিড়ালটাকে যখন আমরা আবিস্কার করলাম তখন বলছেন তার মৃত্যু স্বাভাবিক হয়েছে।

—আমার তো তাই মনে হয়েছে।

—বিড়ালটা ছিল আপনার স্ত্রীর আর একটা স্পষ্ট প্রমাণ যে কেউ একজন তার চোয়াল ভেঙে দিয়েছিল।

—মৃত বিড়াল পরীক্ষা করার অভ্যাস আমার নেই।

পাইপ থেকে ধোঁয়া উড়িয়ে লিটলার বললো—আমার অনুমান, আপনি আপনার স্ত্রীকে হত্যা করার পর, বিড়ালটিকে হত্যা করেছেন। কারণ তার উপস্থিতি আপনার প্রিয়তমা স্ত্রীর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল। আর এও হতে পারে বিড়ালটি জীবিত থাকলে সে হয়ত আপনার স্ত্রীর মৃতদেহ গোপন করবার দৃশ্য দেখতে পেত, সেই দৃশ্য তার মনের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করতো এবং তাতে আমাদের কাজের সুবিধা হত। আমার ধারণা এই সব কথা ভেবেই—

—ওসব কথা থাক আপনি এখনকার কথা বলুন।

লিটলার আবার তার অনুমানের পুনরাবৃত্তি করে বললেন—জন্তু জানোয়াররা তাদের প্রভু ও প্রভুপত্নীর কবরের জায়গা ভালভাবে খুঁজতে পারে। সাধারণতঃ কুকুরেরা এই ব্যাপারে পটু হয়, তবে বিড়ালও কম যায় না।

আমি হাসলাম। মনে মনে বললাম—আমিও মনে মনে ঠিক সেটাই ভেবেছিলাম। বিড়াল পারবে না কেন?

মুহূর্তের জন্য জ্যাক হ্যামারের শব্দ কান পেতে শুনলেন সার্জেন্ট লিটলার। তারপর মুখ থেকে পাইপের ধোঁয়া উড়িয়ে বুঝলেন—শুনুন মিস্টার ওয়ারেন। নিরুদ্দেশ হওয়ার কোন খবর পেলে আমাদের রুটিন মাফিক কাজ হল কিছুদিন অপেক্ষা করা। দেখা যায় সাধারণত সপ্তাহ কাল পরে পকেটের রেস্ত ফুরিয়ে গেলে অনেকে ফিরে আসে।

—এক্ষেত্রেই বা সে কথা ভাবছেন না কেন? আমার বিশ্বাস এমিলি কিছুদিনের

মধ্যে ফিরে আসবে। আমি যতদূর জানি, সঙ্গে ওর মাত্র একশো ডলার মত আছে। আর এও জানি, একলা একলা পথ চলতে নানা দিক থেকে সে ভয় পায়।

মিস্টার ওয়ারেনের কথায় সার্জেন্টের চোয়াল জোড়া শব্দ হল। বললেন, না, না, আমাদের পক্ষে আর অপেক্ষা করা সম্ভব নয়। এই কেসের পিছনে যে একটা অপরাধ বোধ কাজ করছে সেটা ভাবনার যথেষ্ট কারণ আছে।

—কি রকম?

—যেমন ধরুন আপনার স্ত্রী নিখোঁজ। দ্বিতীয়ত মাঝরাতে তার আর্তনাদ শুনতে পায় আপনার প্রতিবেশী একজন। তৃতীয়ত, সেদিন গভীর রাতে আপনার প্রতিবেশী এক দম্পতি আপনাকে বাগানে কবর দেবার জন্য মাটি খুঁড়তে দেখেছিল। অতএব বুঝতে পারছেন, সবকটি সূত্র আপনার বিপক্ষে যাচ্ছে—এবং অপরাধী হিসাবে আপনাকেই আমাদের মনে হচ্ছে।

আমিও তা অস্বীকার করি না। মনে মনে ভাবলাম। যাই হোক এমিলির মৃতদেহ তো আর চিরদিন লুকিয়ে রাখতে পারবো না। আর সেই কারণে আমি এমিলির বিড়ালটাকে হত্যা করেছিলাম এবং লোক দেখাবার জন্য তাকে একটা বাক্সেই কবর দিয়েছিলাম। কিন্তু এসব কথা তো আর সার্জেন্টকে খোলাখুলি বলা যায় না। আমি চেপে গিয়ে বললাম—আর সেইজন্য বুঝি আমার সম্পত্তি এইভাবে তছনছ করছেন? আপনাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি, ভাঙচুর জিনিসগুলো ঠিকমত যদি মেরামত করা না হয়, তাহলে আমি এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবো—এটা যেন মনে থাকে।

সার্জেন্ট লিটলারের মধ্যে কোন রকম ভাবান্তর লক্ষ্য করলাম না। শুনেই আমায় বললেন।—আপনি কি জানেন আপনার ঘরের বিছানার বেড কভারে রক্তের দাগ পাওয়া গেছে।

—ও! ও সে তো আমার রক্ত। কাঁচের গ্লাসে আমার হাত কেটে গিয়েছিল। এই বলে আমি আমার হাতের ক্ষতচিহ্নটা সার্জেন্টকে দেখালাম।

সার্জেন্ট বিশ্বাস করলো না। সে বললো—চাদরের গায়ে লাগা রক্ত পরীক্ষা করলেই বোঝা যাবে সে রক্ত কার।

তার যুক্তি অবশ্য ঠিক। কিন্তু আমি চেয়েছিলাম নিজের হাত কেটে চাদরের গায়ে রক্ত লাগিয়ে পুলিশকে অন্য পথে চালানোর জন্য। কেন না আমি জানতাম, এ পর্যন্ত যে সব জিনিসগুলো আমি তার সামনে পেশ করেছিলাম হয়ত সেগুলো যথেষ্ট নয়। তবে চাদরের গায়ে রক্তটা যে আমারই সেটা পুলিশকে বোঝাতে পারলে তারা আর অনুসন্ধান চালাবে না। কিন্তু তা হল না।

হঠাৎ লক্ষ্য করলাম ফ্রেড ট্রিম্বার তার বাড়ির সীমানা সংলগ্ন বারান্দায় ঝুঁকে পড়ে লিটলারের লোকদের কাজকর্ম নিরীক্ষণ করছে। তাকে দেখা মাত্র আমার

মেজাজটা খিঁচড়ে গেল। চিৎকার করে বললাম—এই জানোয়ার, কি দেখছ অমন করে। পরের সর্বনাশ করতে খুব ভাল লাগে তাই না। এবার দৌড়ে গেলাম তার কাছে। লিটলার আমার পিছনে। বললাম—আচ্ছা এটা কি তোমার সৎ প্রতিবেশীর পরিচয় দেওয়া হল।

ফ্রেড যুক্তি দিয়ে বললো—দেখ অ্যালবার্ট আমি তোমার কোন ক্ষতি করেছি বলে মনে হয় না। আমি মনে করি না তুমি এ কাজ করেছ। কিন্তু তুমি তো জানো উলমা আর ওর অনুমানের কথা। আমি ওর দিকে তাকিয়ে বললাম—ভবিষ্যতে আর আমাদের মধ্যে দাবা খেলা হবে না। এই কথাটা মনে রেখ। তারপর লিটলারের দিকে ফিরে বললাম—আমি যে আমার স্ত্রীকে খুন করেছি এই বিষয়ে আপনি এত নিশ্চিত হলেন কি করে?

লিটলার মুখ থেকে পাইপটা সরিয়ে নিয়ে বললেন—আপনার গাড়িটা এর জন্য দায়ী। শুক্রবার বিকেল সাড়ে পাঁচটার সময় থুর স্ট্রীটে ওরেল ফিলিং স্টেশনে আপনি গাড়িটা নিয়ে যান—এটা সত্যি।

—নিশ্চয়।

—সেখানে আপনি আপনার গাড়ির তেল বদল ও অন্যান্য টুকিটাকি মেরামতের কাজ করেন। সেই সঙ্গে আপনার গাড়ির স্পিডমিটার তখনকার মত মাইলেজ রেকর্ড করা থাকে। এখন আপনার গাড়ির মাইলেজ পরীক্ষা করে দেখা যায় যে গাড়িটা এক মাইলের কম রান করেছে, সে দূরত্ব ছিল ওই মোটর স্টেশন থেকে আপনার বাড়ির দূরত্বের মধ্যে। মৃদু হেসে তিনি আরও বললেন আপনার কথা মতই তাহলে বলতে হয় সেদিন গাড়িটা গ্যারেজে ভাল অবস্থায় রেখেছিলেন। পরের দিন শনিবার আপনি কাজে বার হননি। আর আজ হল রবিবার। অতএব এর থেকে অনায়াসে ধরা যায় শুক্রবারের পর আপনার গাড়ি আর রাস্তায় বার হয়নি।

আমি চাইছিলাম এই ব্যাপারটার উপর পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো। তারা এই প্রসঙ্গ না তুললে আমি নিজেই তুলতাম। তাই সামান্য রেগে বললাম—তাহলে এরপর আপনি কি ভাবছেন? কাছাকাছি কোন খালি জায়গায় আমি আমার স্ত্রীর মৃতদেহ বহন করে নিয়ে গিয়ে সেখানে কবর দিয়ে এসেছি—নাকি?

লিটলারের চোখে মুখে অবিশ্বাসের ছোঁয়া। বললে—না, না, তা কি করে সম্ভব? এখান থেকে চারটে ব্লক দূরে খালি জায়গা দেখেছি। রাতের অন্ধকার হলেও পায়ে হেঁটে কারো মৃতদেহ ওভাবে বহন করে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব ব্যাপার। তা করতে গেলে আপনি কারো না কারো নজরে পড়ে যেতেন। ট্রিম্বার আমার বাগানের ডালিয়া ফুলের চারাগাছগুলোর দিকে তাকিয়ে বললে—অ্যালবার্ট আমাকে কিছু ডালিয়ার চারা দিতে পারো?

ওর ব্যবহারে আমি খুব ক্ষিপ্ত। তাই কোন জবাব দিলাম না।

বাইরে তখন পড়ন্ত বিকেলের রোদ ফিকে হয়ে আসছিল। লিটলারের মুখও একটু একটু করে কালো হয়ে উঠছিল। ধীরে ধীরে তার লোকেরা যা রিপোর্ট দিতে থাকলো তাতে তাকে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন ও নিরাশ হতে দেখলাম। সাড়ে ছটার সময় শেষ আলোটুকু মিলিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জ্যাক হ্যামারের শব্দ থেমে গেল।

সার্জেন্ট লিটলার এই সময় রান্নাঘরে প্রবেশ করলেন। তাকে ক্লান্ত আর ক্ষুধার্থ দেখাচ্ছিল। তার পরণে মলিন জিনসের প্যাণ্ট।

বললেন—নিচে কিছুই কিছুই পাওয়া গেল না। একেবারে সব ফাঁকা।

লিটলার ঠোটে পাইপ চেপে বললেন—আপনি কি একেবারে নিশ্চিত? সব জায়গাগুলো ভালভাবে খুঁজে দেখেছেন তো?

এবার আমার বলার পালা। বললাম—এর পরেও যদি বলেন মৃতদেহ এখানে আছে, তাহলে তার খোঁজ করতে আপনাদের সারা জীবন লেগে যাবে। কিন্তু আবার বলছি লিটলার আপনার অনুমান সঠিক নয়—আপনি হাজার চেষ্টা করলেও এখানে কিছু খুঁজে পাবেন না।

—তবুও আমাকে চেষ্টা চালাতে হবে।

সার্জেন্ট লিটলারকে যদিও বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল তবু তিনি মনের দিক দিয়ে যে ব্যর্থতার জন্য ভেঙে পড়েননি, সেটা বুঝতে আমার কোন অসুবিধে হল না।

এতক্ষণে সব কাজকর্ম থেমে গেছে। সারাদিনের কর্মযজ্ঞের অবসান। এমন সময় লিটলারের এক সহকর্মী এলেন। তিনি ঘরে প্রবেশ করে ম্লান গলায় বললেন—কিছুই তো পাওয়া গেল না স্যার।

আমি কথাটা কানে যেতেই হাসলাম। পা দিয়ে তাল ঠোকার মত করে পা ঠুকতে লাগলাম। আমার ভঙ্গি দেখে মনে মনে লিটলার যে খুব চটে ছিল তা বুঝতে আমার কোন অসুবিধা হল না। দাঁত দিয়ে সে পাইপটা চিবিয়ে ধরে বললে—সব কিছু ভালভাবে খুঁজেছেন?

—হ্যাঁ।

—কোন জায়গা বাদ দেননি?

—না স্যার।

—আপনি একেবারে নিশ্চিত কোথাও কিছু নেই।

আমি এবার বললাম—মিস্টার লিটলার অকারণ সন্দেহের বশে আপনি বৃথা পরিশ্রম করছেন।

—অকারণ নয় মিস্টার ওয়ারেন। আমি নিশ্চিত জানি আপনি আপনার স্ত্রীকে খুন করেছেন।

—আপনি এই ব্যাপারে নিশ্চিত?

—হ্যাঁ ষোল আনা নিশ্চিত।

আমি হাসলাম। বললাম—আত্মভিমানী লোকেরা মাঝে মাঝে এমন কিছু ঝোঁকের মাথায় কাজ করেন যার কোন অর্থ হয় না। আসলে তারা আত্মসম্মান হারাবার ভয়ে যা খুশি তাই করতে চায়, করতে পারে।

আমার কথায় খোঁচা খেয়ে মিস্টার লিটলার কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই একজন প্যাট্রলম্যান এসে স্যালুট করে দাঁড়ালো। বললে—সার্জেন্টের দিকে তাকিয়ে খবর আছে স্যার?

—খবর আছে।

আমি চমকে উঠলাম। লিটলার উৎসাহিত হয়ে বললো—কি খবর?

—স্যার মিস্টার ওয়ারেনের একটা গ্রীষ্মকালীন আবাস আছে।

—খবরটা কার কাছে থেকে পেলে?

—আজ্ঞে ওই ট্রিম্বার ভদ্রলোক খবরটা দিয়েছেন।

আমি অস্ফুট স্বরে দাঁতে দাঁত চেপে ধিক্কার দিলাম।

বললাম শয়তান ট্রিম্বার। সে বলেছে কথাটা। ব্যস সঙ্গে সঙ্গে লিটলারের মুখটা বদলে গেল। মুখ থেকে কালো মেঘ সরিয়ে লিটলার বললেন—তাই বুঝি। তাহলে তো আত্মীয়স্বজনের মৃতদেহ সেখানেই কবর দেওয়া হয়।

আমার মুখটা হয়ত ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছিল। রাগে চিৎকার করে বললাম—ওখানকার এক এক ইঞ্চি ভিত জমি আমি খুঁড়তে দেব না। আমি আমার সম্পত্তির জন্য দু' হাজার ডলার খরচ করেছি! এই ভাবে আপনাদের জন্য আমার সব সম্পত্তি নষ্ট হতে দেওয়া যায় না।

লিটলার হাসলেন। বললেন সহকর্মীদের—শোন তোমরা ফ্লাড লাইটগুলো জ্বালিয়ে দাও। আর আমাদের লোকগুলোকে বলো এখানকার জিনিসগুলো ঠিকঠাক ভাবে সাজিয়ে দিতে। এখানকার কাজ আমাদের শেষ। এখন আমাদের নতুন জায়গায় কাজে হাত দিতে হবে। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, মিস্টার ওয়েলার আপনার সেই বাসস্থানটি কোথায়?

—আমি আপনাকে বলতে বাধ্য নই। আপনি জানেন আমার সেখানে যাওয়া সম্ভব না কারণ আমার গাড়ির স্পিডমিটারের কথা কি ভুলে গেছেন। আপনি বেশ ভালভাবেই জানেন শুক্রবারের পর থেকে গাড়ি আমার গ্যারেজেই ছিল।

মিস্টার লিটলার বললেন—হয়ত স্পিডমিটারের কাঁটা ফিরে এসে আবার নতুন করে ঘুরিয়ে দিয়ে থাকবেন। যাই হোক সেটা অনুসন্ধান সাপেক্ষ, এখন বলুন তো আপনার সেই গ্রীষ্মকালীন আবাসটা কোথায়?

—আমি বলবো না।

—দেখুন আপনি অযথা সময় নষ্ট করছেন। বলতে আপনাকে হবেই। আপনি কি মনে করেছেন আজ রাত্রে সেখানে গিয়ে আপনি আপনার স্ত্রীর মৃতদেহ কবর থেকে তুলে অন্য কোথাও সরিয়ে দেবেন?

—না সেরকম কোন ইচ্ছে আমার নেই। কিন্তু আইনত আমি কিছুই বলতে নারাজ। তারপর মিস্টার লিটলার ডায়াল ঘোরালেন। আইনজীবি অফিসে। সেখান থেকে আলোচনা সেরে তিনি বায়রন কাউন্টির অফিসারের সঙ্গে কথা বললেন। এইভাবে দু-চারজনের সঙ্গে কথা বলে অতিসহজে তিনি আমার গ্রীষ্মকালীন বাসস্থানের খবর জেনে নিলেন।

আমি বললাম—আপনারা ওখানে যাচ্ছেন যান কিন্তু এখানকার মত মাটি খোঁড়াখুঁড়ি করতে পারবেন না। আমি এখুনি মোরকে ফোন করছি।

সার্জেন্ট লিটলার রসিক লোক। সে তার এক সহকর্মীকে বললে, দেখ চিলটন, কাল সকালে এই বাড়ির আসবাবপত্র সব কিছু যেন আগের মত ঠিকঠাক করে দেওয়া হয়। আর বাগানটায় নতুন করে মাটি ঢেলে ভরাট করে দিও। ছিঃ ছিঃ এখানে এভাবে খোঁড়াখুঁড়ি করা আমাদের উচিত হয়নি। বাগানের প্রতিটি গাছ, গাছের পাতা যেমন ছিল তেমনি করে দেবে।

আমি উত্তেজিত হয়ে বললাম—রসিকতা করবেন না! ও বাড়িতে হাত দিলে আমি উকিলের পরামর্শ নিতে বাধ্য হব।

সার্জেন্ট বললেন—সেটা আপনার ব্যাপার, আমাদের এখুনি ও বাড়িতে পৌছতে হবে। আর এই বাড়িটা এখন সম্পূর্ণ মুক্ত কাল আমার লোকেরা সব ঠিকঠাক করে দেবে।

আমি বিষণ্ণ কণ্ঠে বললাম—আপনারা তাহলে ওই বাড়িতে যাবেনই?

—হ্যাঁ। এখন আপনি এই বাড়িতে নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন। রাগে আমার শরীর জ্বলছিল।

ওরা চলে গেল এখানকার সব কাজকর্ম শেষ করে। আমার ডিনার খেতে একদম ভাল লাগছিল না। রাত প্রায় এগারোটার সময় আমার বাড়ির দরজায় করাঘাত হল। দরজা খুলে দেখি ফ্রেড ট্রিস্বার।

বললাম—তুমি?

—আমি দুঃখিত ভাই। আমায় ক্ষমা করো।

—বায়রন কাউন্টিতে আমার একটা বাড়ি আছে একথাটা তোমার বলার কি দরকার ছিল?

—মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেছে।

রাগ দমন করতে আমার কষ্ট হচ্ছিল। উত্তেজিত হয়ে বললাম—ওরা আমার ওখানকার সাজানো বাগান ভেঙে তছনছ করে দেবে। আমি তখন রাগে আরো ফেটে পড়লাম। তবু সামলে নিলাম নিজেকে। বললাম—তোমার স্ত্রী কি ঘুমচ্ছে?

—হ্যাঁ। সকালের আগে ওর ঘুম ভাঙবে না। রাতে কখনও ওর ঘুম ভাঙে না।

ফ্রেডকে সঙ্গে নিয়ে পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে বাড়ির একেবারে পিছনে হাজির হলাম। জায়গাটা অনাবিষ্কৃত। ঝোপঝাড়ে ঢাকা। তা ছাড়া এটা ঠিক এই জায়গাটা আমার এলাকার মধ্যে পড়ে না। ওখানেই আমি আমার স্ত্রী এমিলির মৃতদেহটা লুকিয়ে রাখার আদর্শ জায়গা বলে মনে করেছিলাম। ঠাণ্ডায় মৃতদেহটার কোন ক্ষতি হয় নি। আমি আর ফ্রেড এমিলির মৃতদেহ ধরাধরি করে আমার বাড়ির সামনের বাগানে নিয়ে এলাম। আমার সাজানো বাগান এখন সুন্দর ক্ষেতে পরিণত হয়েছে। চারিদিকে মাটি কাটা। কাজেই খুব একটা বেশি খোঁড়াখুঁড়ি করতে হল না। যতটা সম্ভব পারলাম নিচ থেকে মাটি তুলে নিয়ে অনেক নিচে এমিলির দেহটা শুইয়ে দিয়ে আবার মাটি চাপা দিলাম। ফ্রেডকে একটু নিশ্চিন্ত লাগলো।

আমি বললাম—কিছু ভাবছ?

সে বললে—পুলিশের লোকেরা আবার এখানে তল্লাশি চালাতে পারে।

—নিশ্চয় নয়। কোন জায়গায় পুলিশ একবার অনুসন্ধান চালিয়ে গেলে সেই জায়গাই হয় গোপন কিছু লুকিয়ে রাখার উপযুক্ত জায়গা। কাল সকালে পুলিশের লোকেরা এসে সিমেন্ট দিয়ে আবার সব কিছু আগের মত বাঁধিয়ে দিয়ে যাবে বলে কথা আছে।

এবার আমরা দোতলার রান্নাঘরে এলাম। ফ্রেড ক্লান্ত হয়ে প্রশ্ন করলো—তাহলে তুমি এখন নিশ্চিন্ত।

আমি হেসে বললাম—ফ্রেড, এখন তুমিও বছর খানেক বাদে তোমার ওই স্ত্রীকে খুন করতে পারো। সেদিন আমি আমার বাগানে তার ডেডবডি এই ভাবে লুকিয়ে রাখবো যতক্ষণ না পর্যন্ত পুলিশ তোমার বাগান খোঁড়াখুঁড়ি করে নিশ্চিন্ত হয়ে চলে না যায়।

ফ্রেডকে ভীষণ সংকুচিত মনে হল। ফ্রেড বললে—তোমার মত আমার এতটা দৃঢ় ব্যক্তিত্ব নেই ভাই, ওই উইলসারের সঙ্গে আমাকে এখনও বেশ কিছু বছর কাটাতে হবে। তুমি ভাগ্যবান, তাই তুমি তোমার স্ত্রীর রাহুমুক্ত হতে পারলে। তারপর পরিষ্কার বললে—আচ্ছা ওয়ারেন তুমি নিশ্চয় তখন মন থেকে কথাটা বলো নি' যে তুমি আমার সঙ্গে আর দাবা খেলবে না?

আমি বললাম, তখন আমার মনের অবস্থা কি রকম ছিল সে তো তুমি জানো।

পুলিশ তখন আমার বাগান খুঁড়ছিল, বাড়ি ভাঙছিল। আমি তখন রাগে ফেটে পড়েছিলাম। তখনকার মনের অবস্থায় আমি তোমাকে কথাটা বলেছিলাম।

ফ্রেড বললে—আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল তোমার কথা শুনে।

আমি হেসে বললাম—এখন তো আর মনের সেই অবস্থা নেই। আমার কথা শোনামাত্র ফ্রেডের মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বললে—আমার অভিনয়টাও খারাপ হয়নি কি বলো ওয়ারেন?

—না ফ্রেড। এখন তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমতে পারো। আর আমারও আজ রাতে ঘুমটা কয়েকদিন পর ভালই হবে বলে আশা করছি।

ফিলোমেল কটেজ

আগাথা ক্রিস্টি

স্বামীকে বিদায় জানাতে গেট পর্যন্ত এসেছিলেন। ভদ্রলোক গেট পার হয়ে রাস্তায় নামলেন। এ্যালিক্স মার্টিন স্বামীকে লক্ষ্য করছিলেন। ভদ্রলোক হাঁটছেন। পিছন ফিরে একবারও তাকালেন না। তাকালে দেখতে পেতেন তার গুণমুগ্ধা স্ত্রী মার্টিন তার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। হয়ত তিনি একবার পিছন ফিরে তাকাবেন এমন একটা প্রত্যাশায় কাঁপছিল তার দু'চোখের পাতা। সামনে গ্রামের সরু রাস্তা। আর একটু এগিয়ে গেলে রাস্তাটা বাঁক নেবে। বাঁক নেওয়ার পর আর ভদ্রলোককে দেখা যাবে না। জং ধরা গেটের ওপর দুই হাতের কনুইয়ের ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিল এ্যালিক্স মার্টিন। ঠিক এইভাবেই সে আগাগোড়া দাঁড়িয়ে আছে।

একসময় ভদ্রলোক রাস্তার বাঁকে ঘুরে গেলেন। তাকে আর দেখা গেল না। দেখা আর না গেলেও এ্যালিক্স মার্টিন কিন্তু যেমনটি দাঁড়িয়ে ছিলেন, তেমনটি দাঁড়িয়ে থাকলেন, তাকে একটু অন্যমনস্ক লাগছিল। কপালের উপর এসে পড়েছিল একগুচ্ছ চুল। আঙুল দিয়ে সেগুলোকে সরাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু সেগুলো নড়লো না, সরলো না। অথচ সেদিকে খেয়াল না করে মহিলা চুপচাপ একভাবে দাঁড়িয়ে থাকলেন। দু'চোখে তার নীল আকাশের কোলে স্বপ্ন ভাসা মেঘ খেলা করছে। কি ভাবছেন এত? কিসের ভাবনায় ডুবে আছেন এ্যালিক্স?

মহিলার চেহারাটা এমন কিছু নয়। কোন ভাবেই তাকে রূপসী বলা যায় না। আবার বলাও যায় না একেবারে সাদামাটা। আসলে দেহে ওর যৌবন থাকলেও সেই যৌবনে চঞ্চলতা এক্‌রকম প্রায় নেই বললেই চলে অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি কি রকম যেন একটু টানটান যৌবন। অর্থাৎ যৌবনের সমস্ত মাদকতা যেন তার মধ্যে আত্মস্থ। আর সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল ওর এই আত্মস্থ যৌবনই হল আসল সৌন্দর্য। অথচ একসময় ঠিক সে এই রকম ছিল না। একটু চঞ্চলতা থাকলেও কিছু ছিল, যার ফলে আগে যে অফিসে কাজ করতো তারা যদি এখন তাকে দেখে তাহলে কিন্তু তাকে ঠিক চিনতে পারবে না।

কুমারী যখন ছিলেন তখন তাকে সকলে চিনতো মিস এ্যালেক্স কিং বলে। তিনি তখন ছিলেন অনেকটা বিন্যস্ত, তবে রুক্ষতা তখন চাপা ছিল না।

মহিলা ছিল অফিস অন্তপ্রাণ। প্রতিদিন ঝড় জল যাই হোক না কেন অফিস তার আসা চাই। তাছাড়া ভীষণ বাস্তববাদী। কুমারী মেয়ে এত বাস্তববাদী হলে ভাল লাগে না। তাকে বড় নিরস বলে মনে হয়। চেহারা নিয়ে তার গর্ব করার মত কিছু ছিল না, যা সাধারণত কুমারী মেয়েদের থাকে। তবে হ্যাঁ, ভগবান তাকে দিয়েছিলেন একঝাঁক বাদামি চুল। অসাধারণ চুলগুলো আর ওটাই ছিল ওর গর্বের একমাত্র

বস্ত্র। পোশাক কখনও দামী পরতেন না, তবে সবসময় মানান সই পোশাক পড়তেন। অনেক মেয়ে আছে না যারা শরীরের সঙ্গে মানান সই পোশাক না পরে নিজেকে বেয়াড়া করে তোলে দশজনের সামনে, এ্যালিক্স কিন্তু ঠিক সেই দলের ছিলেন না। তিনি জানতেন কোন ধরনের পোশাকে তাকে কতটা ভাল দেখায়, ঠিক সেই রকমটা পড়তেন। ফলে সাদামাটা পোশাক হলেও, সেগুলো তাকে যথেষ্ট আকর্ষণীয় করে তুলতো। তবে ওই যে বললাম, তার যৌবন ছিল, সেই যৌবন এত মার্জিত আর সংযত ছিল, যা তাকে কখনই লাস্যময়ী করে তুলতো না।

এ্যালিক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। আঠারো বছর বয়সে চাকরিতে ঢুকেছিলেন। তারপর কোথা দিয়ে গড়িয়ে গেছে নিঃশব্দে পনেরোটা বছর। অফিসের স্টেনো-টাইপিস্টের বয়স এখন তেত্রিশ হবে। এতটা বয়স নিঃশব্দে পার করলেন কি করে এ্যালিক্স। আসলে এই মাঝখানের বয়সগুলো ছিল তার কাছে সংগ্রামের বয়স। বেঁচে থাকার জন্য তখন তাকে দস্তুর মত লড়াই করতে হয়েছিল। প্রতিকূলতার মধ্যে লড়াই করাটা যে কত শক্ত কাজ, এটা যারা করেছেন তারা বুঝতে পারবেন। প্রতিকূল বছরগুলোই আসলে তার দেহের যৌবনকে নিঃশব্দে শুষে নিয়েছে। ছিনিয়ে নিয়েছে তার শরীর থেকে কোমলতা, নম্রতা, লাবণ্য। পরিবর্তে তাকে দিয়েছে একটা কাট্ কাট্ চেহারা, যা কোন যুবতী মেয়ের কাছে প্রত্যাশিত নয়।

এই রকম একজন নারীর জীবনে কখনও প্রেম আসতে পারে? পারে মশাই, পারে। যৌবনে প্রেম নিকুঞ্জে ভ্রমরের গুঞ্জন শোনা যাবে না তাকি হয় নাকি। শোনা গিয়েছিল। প্রেম এসেছিল। মন-প্রাণ চঞ্চল হয়েছিল। যৌবন উদ্ভোসিত হয়েছিল তবু কঠিন সংযমে নিজেকে রুদ্ধ করে রেখেছিলেন এ্যালিক্স।

আসলে প্রেমটা হয়েছিল তার অফিসের এক সহকর্মী ডিক উইগুফোর্ডের সঙ্গে। প্রথমে চোখে চোখে তারপর কথা বলার পালা এবং শেষে বন্ধুত্ব। আজ্ঞে হ্যাঁ স্রেফ বন্ধুত্ব! ওরা পরস্পরের বন্ধু ছিল।

আসলে পরস্পর যে পরস্পরকে ভালবেসেছিল এটা কিন্তু তারা দুজনেই ভালমত জানতো। কিন্তু মুখে কোনদিন সেই ভালবাসার কথা কেউ কাউকে বলেনি। কি করে বলবে? আর কে বলবে? ডিক মনে মনে এ্যালিক্সকে স্ত্রী হিসাবে পাওয়ার স্বপ্ন দেখলেও, ভরসা পেত না কিছু বলতে। তার ওপর সংসারের বিস্তর দায়িত্ব। মাইনে যৎসামান্য। ছোট ভাইয়ের দায়িত্ব—একি কম কথা। ভাইটার এখনও পড়াশুনো বাকি অতএব তাকে ওর জন্য আরও কিছু ব্যয় করতে হবে। কাজেই এই অবস্থায় ডিকের পক্ষে বিয়ের স্বপ্ন দেখা বাতুলতা মাত্র। তবে হ্যাঁ, একথা ঠিক প্রতিদিন কিন্তু ডিক বাড়িতে ফিরে একা হয়ে গেলে এ্যালিক্সের কথা ভাবতো। আর এ্যালিক্স—তার অবস্থাও ছিল ডিকের মত। কাজেই সেও ভাবতে সাহস পেত না, ও কোনদিন ডিকের স্ত্রী হতে পারে। অথচ ওরা পরস্পরকে না

দেখে থাকতে পারতো না। এই কারণে এ্যালিক্সকে প্রতিদিন অফিসে ছুটতে হত। চোখের ভাষায় পরস্পর পরস্পরের চাহিদা অনুভব করতো কিন্তু ঠোঁটের ডগায় কিন্তু এসব কোন কথা আসতো না। বারবার ভাবতো সামনে তো অঢেল সময়, এত তাড়া কিসের? এই ভাবনা ভাবতে গিয়েই কখন পনেরোটা বছর চলে গেছে। বন্ধুত্ব গাঢ় হয়েছে, তবু সেটা বন্ধুত্বের মধ্যেই রয়ে গেছে।

এই ভাবেই হয়ত চলতো। চলতো আরও কিছু বছর, যদি না এ্যালিক্সের ভাগ্য হঠাৎ খুলে যেত। সত্যি এমন হয়—হঠাৎ এমন ভাবে কারো ভাগ্য ফেরে। কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ কোন এক দূর সম্পর্কের মামা, মৃত্যুকালে তার যাবতীয় সম্পত্তি এ্যালিক্সকে দিয়ে গেলেন। সম্পত্তি মানে সামান্য নয়—বেশ বড় মাপের পাউণ্ড, দু'হাজার পাউণ্ড। এত পাউণ্ড হাতে পেলে স্বামী-স্ত্রীতে বেশ হেসে খেলে কাটিয়ে দেওয়া যায়।

কিন্তু.....স্বামী তো তার কেউ নেই। হয়নি। ডিক—দূর সে তো বন্ধু! ওকে মুখ ফুটে বিয়ের কথা বলবে কি ভাবে। কি ভাববে ডিক। হয়ত ভাববে মেয়েটা কি অসম্ভব হ্যাংলা। আর তাছাড়া হাতে যখন এতগুলো পাউণ্ড এসেছে তখন আরও ভাল কিছু পুরুষ সঙ্গী পেতে তার কোন অভাব হবে না। তখন অনায়াসে বিয়ের কথা ভাবা যেতে পারে। নিজেকে এ্যালিক্স-এর তখন একটা মুক্ত পাখী বলে মনে হল। কি অপার স্বাধীনতা, বেঁচে থাকার একটা স্বাদ মনে মনে অনুভব করলো এ্যালিক্স।

আর ডিক। তার কাছে গোটা পৃথিবীটা বিবর্ণ হয়ে গেল। তার চিন্তার নদী অন্য খাদে বইতে লাগলো। সে ভাবতে লাগলো, এ্যালিক্স এত পাউণ্ডের মালিক হয়েছে, এখন তার সঙ্গে না মেশাই ভাল। হয়ত সে তাকে আগের মত পাত্তা দেবে না। বিয়ে করার যে স্বপ্নটা এতদিন ধরে বুকের মধ্যে ডিক লালন করেছিল হঠাৎ যেন সেটাকে তার মৃত বলে মনে হল। সে এ্যালিক্সকে এড়িয়ে যেতে লাগলো। তার অযাচিত সংকোচ আর সংশয় বুদ্ধিমতী এ্যালিক্সের নজর এড়ালো না। আসলে সে তো চিরকালই বাস্তববাদী। কাজেই তার চোখে ব্যাপারটা এড়ালো না। ঠিক সে ডিকের আচরণ ধরে ফেললো। মনে মনে বরং হাসলো ডিকের অহেতুক আত্মঅহংকার আর পৌরুষের ভাব দেখে। আসলে সংসারে কোন পুরুষ হয়ত চায় না, কোন মেয়ে তার চাইতে এগিয়ে থাকুক। এ্যালিক্সের এখন অনেক পাউণ্ড, তাকে বিয়ে করা মানে হচ্ছে তার গোলামি করা। অতএব বন্ধু বন্ধুই থাক। তার বেশি অর্থাৎ স্ত্রী রূপে এতদিন যা সে কল্পনা করে এসেছে, তা মিথ্যে হোক।

ডিকের এই আচরণ অন্য সময় হলে খারাপ লাগতো, ঠিক এখন এই মুহূর্তে এ্যালিক্সের এত খারাপ লাগলো না। বরং ভালই লাগলো। পুরুষ মানুষের মধ্যে এই অহংকারটা থাকা ভাল। তাই মনে মনে ভাবছিল ডিককে সে নিজেই প্রস্তাব দেবে

কিনা। মনের মধ্যে যখন এইরকম অবস্থা ঠিক তখনই এ্যালিস্সের সঙ্গে একরকম প্রায় হঠাৎ করেই দেখা হয়ে গেল জেরল্ড মার্টিনের। এক বন্ধুর বাড়িতে তাদের আলাপ হয়েছিল। প্রথম দর্শনেই প্রেম। মনের মধ্যে যেন ঝড় বয়ে গেল এ্যালিস্সের। এতদিন সে ডিকের সঙ্গে মিশেছে, কিন্তু মনের মধ্যে এত ভাবান্তর কখনও তার হয়নি। উফ্ কি উথাল পাতাল অবস্থা। নিজেকে সামলানো দায়। হয়ত একেই বলে সত্যিকার প্রেমের প্রবাহ, প্রেম ঝড়—যার তোড়ে উড়ে গেল এ্যালিস্স। জীবনে সে ভেবেছিল কোনদিন প্রেমে পড়বে না। নিজেকে এত শক্ত করে বেঁধে রেখেছিল, সেই মেয়ের মনের মধ্যে একি অবস্থা। প্রথম দর্শনেই এ্যালিস্সের মন জয় করে নিল জেরল্ড। যাকে বলে আসামাত্র জয় করা, দেখামাত্র জিতে নেওয়া। এ্যালিস্স হাজার চেষ্টা করে পায়ের নিচে কোন জমি খুঁজে পেল না। তলিয়ে গেল সাতদিনে।

ভাবা যায়, যে মেয়ে পনেরো বছরের বন্ধুত্বেও ভালবাসার কথা বলতে পারেনি, সে কিনা সাতদিনের দেখায় বিয়ের প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হল। অবশ্য এরজন্য যতটা এ্যালিস্সের কৃতিত্ব তার চেয়ে বেশি কৃতিত্ব হল জেরল্ড মার্টিনের। কি স্পষ্ট ভাবে ভালবাসার কথা বললো, এতটুকু জড়তা নেই। আহা এমন পুরুষকে কখনও অস্বীকার করা যায়।

খবরটা শুনলো ডিক। খবর শুনে ভীষণ চটে গেল। এই হল মেয়েমানুষের মন। এতদিন ধরে মেলামেশা করে বিয়ে করার আগে একবার তার কথা ভাবলো না। শুধু চটে গেল না রাগে ফুঁসতে লাগলো। দেখা করে দু'চার কথা শোনালো এ্যালিস্সকে।

বললে—লোকটাকে তুমি কতদিন চেনো? একজনকে বিয়ে করার আগে তার সব কিছু ভালভাবে জেনে নিতে হয়। তুমি তার কতটুকু খবর জানো? মাত্র তো সাতদিনের আলাপ।

এ্যালিস্স বললে—সাতদিন যথেষ্ট।

—যথেষ্ট হলেও বিয়ের পক্ষে যথেষ্ট নয়। আমি তোমাকে ভাল জানি, চিনি, তুমিও আমাকে ভাল চেনো কারণ আমাদের পরিচয় পনেরো বছরের।

এ্যালিস্স বললে—ভালবাসা হলে আর কিছুর প্রয়োজন হয় না আমি ওকে ভালবেসেছি।

—ভালবাসা। সাতদিনের মধ্যে এত প্রেম যে বিয়েতে পৌঁছতে হবে।

এবার এ্যালিস্স ভীষণ চটে গেল। বললে কিছুটা জোরালো গলায়—সব পুরুষ কি আর তোমার মত যে ভালবাসাকে স্বীকৃতি দিতে এতবছর সময় নেবে।

কাটা ঘায়ে যেন নুনের ছিটে পড়লো। বুকের ভিতরটা ডিকের জ্বলে গেল। মনে মনে ভাবলো কি ভুলই না সে করেছে। সত্যি এতটা দেরি করা উচিত হয়নি।

তবু বিড়বিড় করে বললে, আমি তো মনে মনে তোমাকে চেয়েছিলাম, এবং আমার ধারণা তুমিও আমাকে চেয়েছিলে—।

—ঠিক তাই, আমি তখন তোমাকে চাইতাম, তোমার কথা ভাবতাম। তবে তখন প্রেম কাকে বলে ঠিক বুঝতাম না।

—এখন বুঝি বুঝেছ।

—ঠিক তাই। ওর প্রেম আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে।

ডিক অনেক বোঝালো প্রথমে কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। শেষে ভয় দেখালো, এমনকি সে বললো, তার প্রেমিককে সে খুন করবে। এ্যালিক্স তবুও অটল। বরং তখন যেন ডিককে রাগাতে ভাল লাগছিল। তার হ্যাংলামো দেখে আনন্দ হচ্ছিল।

মনের মধ্যে মাঝে মাঝে সেই পুরনো ভয়টা উঠে আসে এ্যালিক্সের। মানুষ প্রেমে ব্যর্থ হলে সব করতে পারে। হিংসা থেকে প্রতিহিংসা, প্রতিহিংসা থেকে হত্যা....ভাবতে গিয়ে চমকে উঠলো এ্যালিক্স।

স্বামীর চলার পথের দিকে তাকিয়ে জং ধরা গেটে হেলান দিয়ে মনের মধ্যে পুরনো দিনের ছবিগুলোকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল। ওদের বিয়ে হয়েছে মাত্র একমাস। এই একমাসের জীবন যেন স্বর্গীয়....মানুষ যে এত সুখী হয় আগে জানা ছিল না। তবু এই সুখের মধ্যে একটা গোপন কাঁটা বিঁধে আছে। চলতে ফিরতে খচ্ খচ্ করছে—সেই কাটা হল ডিক উইণ্ডফোর্ড।

বিয়ের পর থেকে এই একমাসের মধ্যে তিনদিন স্বপ্ন দেখেছে এ্যালিক্স। একই স্বপ্ন। পরিবেশ যা শুধু আলাদা কিন্তু মূল বিষয় এক। আর এই তিনটি স্বপ্নের মধ্যেই আছে ডিক। কি ভয়ংকর ওর সেই মূর্তি। আগুনের মত জ্বলছে চোখ জোড়া। হাত মুষ্ঠিবদ্ধ। ওর এক ঘুষিতে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে জেরল্ড। নির্ঘাৎ সে মারা গেছে ডিকের ঘুষিতে। মাঝরাতে স্বপ্ন ভেঙে ধড়মড়িয়ে উঠে বসেছে। না, জেরল্ড বেঁচে আছে। কি সব অবান্তর ভাবনা। তারপর আবার নতুন করে ডিককে মনে পড়েছে। স্বপ্নটা একবার নয়....বারবার তিনবার দেখেছে। খুব আতঙ্কজনক, ভয়াবহ, মারাত্মক। সবচেয়ে মারাত্মক হল শেষের দৃশ্য। সে যেন খুনীর উপর খুশি হয়েছে। জেরল্ডকে খুন করার জন্য ধন্যবাদ দিচ্ছে ডিককে। তারপর ডিকের হাত ধরে সে ছুটছে সামনের একটা প্রান্তর ধরে। প্রতিবার...প্রতিবার এক ছবি ঘুরে ফিরে স্বপ্নে এসেছে। তার অবচেতন মন বলছে এই ঘটনাটা ঘটবে!

স্বপ্নটার কথা তার স্বামীকে বলা হয় নি। সব কথা কি বলা যায়। সম্ভব নয়। উচিত নয়। বললে ফ্যাসাদ বাড়বে বই কমবে না। অনেক কথার মুখোমুখি তাকে দাঁড়াতে হবে। অথচ কথাটা তার বলা উচিত বলে মন বলছে। আসলে অন্য কিছুর জন্য নয়, সাবধান করার জন্য। আগের থেকে বলে রাখলে মনের দিক দিয়ে শান্তি পেত। মানসিক শান্তি সেটাও তো প্রয়োজন।

আচ্ছা এই যে স্বপ্নটা সে দেখছে এটা কি কোন ভবিষ্যতের সতর্কবাণী। ডিক তাকে বলেছিল সে সুযোগ পেলে জেরল্ডকে খুন করবে—এটা সেই কথার ভীতি থেকে মনে আসছে নাকি ডিকের মধ্যে এমন কিছু ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা আছে যা তাকে এখনও সম্মোহন করে রেখেছে।

হঠাৎ সমস্ত চিন্তাটা ভেঙ্গে গেল। বাড়ির ভিতরে টেলিফোনটা বাজছে। কি আপোদ, কে আবার টেলিফোন করলো এই সময়? দৌড়ে এসে ঘরে ঢুকে রিসিভারটা হাতে তুলে নিল। কণ্ঠস্বরে প্রথমেই ঝাঁকি খেল।

—হ্যালো, কে কথা বলছেন আপনি?

—আরে আমি? তুমি এইভাবে কথা বলছো কেন? কি হয়েছে তোমার? কণ্ঠস্বরটা কিরকম যেন কাঁপছে? আরে আমি ডিক। চিনতে পারছো না।

—ও ডিক। তুমি...তো হঠাৎ ফোন করলে এতদিন বাদে। নম্বর পেলে কোথায়? তুমিই বা এখন কোথায় আছো? কোথা থেকে কথা বলছো?

একসঙ্গে এত কথা অনর্গল বলে গেল। ওপাশ থেকে হাসতে হাসতে ডিক বললে, আমি এখন আপাতত তোমাদের গ্রামে এক পান্থশালায় আছি, তুমি নিশ্চয় চেনো সেটা।

"ট্রাভেলার্স আর্মস"—কি চিনতে পারছো?

—হ্যাঁ। তা এখানে কেন এসেছ?

—ছুটি কাটাতে। বেশ কয়েকদিন থাকতে। এখানে মাছ ধরার ভাল ব্যবস্থা আছে। আমি ভাবছি আজ সন্ধ্যের পর তোমাদের বাড়িতে একবার যাব।

—কেন?

—বারে তোমাদের দুজনকে দেখতে। বিয়ের পর তো আর দেখা হয়নি। তো আমি যাব কি? মানে তোমার অনুমতি না পেলে তো যেতে পারি না।

—না। তুমি এসো না। আসবে না।

অন্যপ্রান্ত স্তব্ধ। অল্প নিরবতা। তারপর কণ্ঠস্বর ভেসে এলো অনেক পরিবর্তন হয়ে—আমি দুঃখিত এ্যালিক্স, আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। তুমি ঠিক বলেছ আমার যাওয়াটা উচিত নয়, এখন আমি তোমাদের দুজনের মধ্যে যথেষ্ট বেমানান।

এ্যালিক্স মুহূর্তে নিজের ভুলটা বুঝতে পারলো। বুঝলো তার এই ভাবে কথা বলা উচিত হয় নি। ডিক তাকে ভুল বুঝতে পারে। তার ব্যবহারে যে অস্বাভাবিকতা প্রকাশ পেয়েছে সেটা একেবারে নিশ্চিত। এটা তো ঠিক, ওর নিজের ওই বাজে স্বপ্নটা দেখার জন্য ডিক দায়ী নয়। লোকে শুনলে হাসবে। তাই দ্রুত নিজেকে সংশোধন করে নিয়ে এ্যালিক্স বললে—তুমি কিন্তু আমায় ভুল বুঝলে। আসলে আজ সন্ধ্যায় আমরা একটু ব্যস্ত থাকবো, তাই তোমাকে বোঝাতে চেয়েছি অন্য কোন কারণ নয়। নিজেকে স্বাভাবিক করার জন্য বললে কাল এসো না। আসতে পারবে?

অ্যালিক্স মনে মনে জানে ডিকের চরিত্র। একবার কোন আপত্তি শুনলে দ্বিতীয়বার সে কাজ করে না। আর তাছাড়া ওর তো বোঝা উচিত বাতাসে আর সেই আগের সুর বাজে না। বাজবে না কোনদিন। মনে হয় বুঝেছিল। চালাক ছেলে তো। তাই বললে, আমি নাও থাকতে পারি। সব নির্ভর করছে আমার এক বন্ধুর উপর। সে এলেই বেরিয়ে পড়বো, আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি ভাল থেকো। বিদায় এ্যালিক্স। টেলিফোনটা ছেড়ে দিয়ে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। উফ্ বাবা! বুক থেকে যেন একটা পাথর নেমে গেল। না না ওর বাপু এখানে এসে দরকার নেই। কোন প্রয়োজন নেই আসার। কখনই ওর এখানে আসা উচিত হবে না। এমন একটা পরিস্থিতি আমি কিছুতেই তৈরি হতে দিতে রাজি নই। আমি চিন্তাই করতে পাচ্ছি না ডিক আসবে আমার বাড়িতে, ওর সামনে জেরল্ড। ও যদি কিছু ভেবে থাকে তো ভাবুক। ভগবান যা করেন তা মঙ্গলের জন্য। ভাগ্যিস ফোন করে আসার কথা বলেছিল। এই যদি না বলে আসতো তাহলে কি বিশ্রি ব্যাপার না হতো। যাক এত ভাবনার এখন আর কোন কারণ নেই—কারণ সে আসছে না।

মনের ভরাক্রান্ত ভাটাকে হাল্কা করার জন্য বাগানে বেরিয়ে পড়লো। বাগানে অনেক ধরনের ফুলের গাছ। বেড়াতে বেড়াতে বেড়ার ধারে একটা ফলকের উপর চোখ পড়লো—"ফিলোমেল কটেজ"।

ভারি সুন্দর মিষ্টি নাম। নামের মধ্যে অদ্ভুত একটা সুর আছে। ছন্দ আছে। বিয়ের আগে জেরল্ড ওকে আদর করে বলেছিল—আমার বুলবুলি। তুমি বুলবুলির গান শুনেছ? নিশ্চয় শোননি। আমি তোমাকে সেই গান শোনাবো। গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় আমাদের বাড়ির বারান্দায় বসে একসঙ্গে দুজনে ওই গান শুনবো। বুলবুলির গান শুনলেই চুমু দেবে আমায়।

কথাটা মিথ্যে নয়। সত্যি এই বাগানে বসে তারা বুলবুলির গান শুনেছে। ও জেরল্ডকে চুমু খেয়েছে। এখনও মনে পড়লে শরীরের মধ্যে যেন এক অনাবিল আনন্দের ঢেউ তরঙ্গের মত চারদিকে ছড়িয়ে যায়।

এই "ফিলোমেল কটেজ" কে খুঁজে বার করার কৃতিত্ব সবই জেরল্ডের! খুঁজে পেয়ে খবরটা দেওয়ার সময় আনন্দে সে দিশেহারা হয়ে ওকে কোলে তুলে নিয়েছিল। জায়গাটা সত্যি মধুযামিনীর পক্ষে উপযোগী। বিয়ের পর বিবাহিত জীবনের মধুর স্বপ্ন এখানে না এলে চরিতার্থ হত না। এ কথা এ্যালিক্স অস্বীকার করতে পারে না, যখন সে জায়গাটা প্রথম দেখেছিল সেও অবিভূত হয়েছিল। যদিও জায়গাটা ভারি নির্জন, কাছাকাছি গ্রাম থেকে মাইল চারেক দূরে, তবু এমন নির্জনতার মধ্যে অদ্ভুত একটা সৌন্দর্য অনুভব করেছিল। জায়গাটা শুধু নির্জন নয়, এর গঠন শৈলির মধ্যে অদ্ভুত একটা পুরনো আভিজাত্য আছে। অথচ বাড়িটার ভিতরে যা কিছু আছে সবই আধুনিক উপকরণ—পাথর বসানো বাথরুম,

ইলেকট্রিক, ফোন.....বেশ বিহ্বল হয়ে গিয়েছিল এ্যালিক্স। তবু চাইলে পরে সব কিছু পাওয়া যায় না। বাড়ির মালিক প্রচণ্ড ধনী এবং শৌখিন। বাড়িটা নিজের রুচি অনুযায়ী তৈরি করেছেন। ভাড়া দিতে তিনি রাজি হলেন না। লোকটা ভীষণ একরোখা, এমন শৌখিন লোক এত একরোখা হয় কি করে। তার সাফ কথা, বাড়ি ভাড়া দিতে পারবো না। কিছুতেই নয়। পারলে বাড়িটা বিক্রি করে দেব।

জেরল্ড মার্টিনের আয় খুব খারাপ নয়। তবু ভদ্রলোক যে দাম চেয়েছিলেন সেটা দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তার হিসাব মত সে বড় জোর হাজার পাউণ্ড দিতে পারে কিন্তু বাড়িটার দাম তার ধারে কাছে পৌছবে না। বাড়িওয়ালা পাক্কা তিন হাজার পাউণ্ড চান। এতটুকু কম বেশি নয়। জেরল্ড এখানেই থমকে গিয়েছিল।

তখনই এ্যালিক্স এগিয়ে এসেছিল। তারও বাড়িটা পছন্দ হয়েছিল। ভালবেসে ফেলেছিল। বলেছিল, পাউণ্ডের জন্য ভাবতে হবে না, আমি তো আছি। আসলে ওর তো হাতে তখন অনেক পাউণ্ড, না হয় খরচ হল সুন্দর বাড়িটার জন্য। পাউণ্ডের জন্য দুঃখ নেই, ফিলোমেল কটেজ তো তাদের নিজেদের হল। গ্রাম থেকে দূর বলে কাজের লোক পাওয়া মুসকিল। তবু এ্যালিক্সের কোন অসুবিধে হয়নি, সে নিজেই রান্না করে, ঘরদোর পরিষ্কার করে, সাজায়, বাড়ির কাজ করে। বেশ লাগে এসব করতে, এগুলোই তো মেয়ে মানুষের কাজ।

শুধু বাড়ির বাগানটাকে যত্ন করার জন্য একজন লোক আসে গ্রাম থেকে সপ্তাহে দুদিন। লোকটি বৃদ্ধ, নিখুঁত ভাবে কাজ করে। হাতে কাজ না থাকলে জেরল্ড নিজে বাগানের কাজে হাত লাগায়। ও বাগান করতে ভালবাসে।

বাগানে বেড়াতে বেড়াতে এ্যালিক্স খুব অবাক হল বৃদ্ধ মালিকে কাজ করতে দেখে। আরে লোকটা আজ কেন এসেছে, ওর তো আজ আসার কথা নয়। ওর আসার কথা সোমবার আর শুক্রবার। কিন্তু আজ তো বৃহস্পতিবার।

—কি ব্যাপার জর্জ, তুমি আজ কাজে এসেছ?

লোকটা মাথার টুপিটা ঠিক করতে করতে উঠে দাঁড়ালো। বললে—জানতাম ম্যাডাম আপনি আশ্চর্য হবেন। কাল আমাদের গ্রামে উৎসব আছে, তাই আজ কাজ করে দিয়ে গেলাম। কাল তো আসতে পারবো না। আমি জানি একদিন আগে কাজ করলে আপনারা কিছু মনে করবেন না।

—না মনে করার কোন প্রশ্ন উঠছে না। ভালই করেছ। তারপর হাসতে হাসতে বললে—আগামী কালের উৎসব তোমাদের ভাল কাটুক।

এরপর এ্যালিক্স যা শুনলো তাতে যথেষ্ট অবাক হল।

বৃদ্ধ মালি বললে—শুনলাম আপনারা নাকি কিছুদিনের জন্য চলে যাচ্ছেন, তাই ভাবছি আপনারা চলে গেলে বাগানটার কি হবে? কোন নির্দেশ যদি থাকে তো দিতে পারেন!

—কই আমি তো কোথাও যাচ্ছি না।

জর্জ বললে—আগামীকাল আপনারা লণ্ডন যাচ্ছেন না?

—না কে বললে তোমাকে?

জর্জ কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললে—কি জানি, গতকাল আপনার কর্তার সঙ্গে গ্রামে দেখা হল। তিনি জানালেন, শুক্রবার আপনারা লণ্ডন যাচ্ছেন, কবে ফিরবেন ঠিক নেই?

—দূর। এ্যালিক্স হেসে বললে—না, না, মনে হয় ভুল শুনেছ।

বুড়ো মালি জর্জ একটু অবাক হয়ে বললেন কি জানি, ভদ্রলোক এত জোর দিয়ে বলা সত্ত্বেও আমি শুনলাম। হতে পারে—ঈশ্বর জানেন, কোনটা ভুল কোনটা সঠিক।

এ্যালিক্সের খুব ভাল লাগছিল না। তাই সে কিছুটা ক্রুদ্ধ হয়ে কর্কশ ভাষায় বলে উঠলো—আমি লণ্ডনকে ঘৃণা করি।

—ও, তাই। হতে পারে ভুলটা আমার হয়েছে শুনতে। সাধারণত আমার শুনতে এত ভুল হয় না। তারপর বললে—শুনে খুশি হলাম আপনারা যাচ্ছেন না। লণ্ডন জায়গাটা আমারও একদম ভাল লাগে না। বড্ড বেশি মোটর গাড়ির ভিড়। এ' এক ভীষণ সমস্যা, রাস্তায় হাঁটা যায় না। এই দেখুন না ম্যাডাম, এই বাড়ির আগেকার যিনি মালিক ছিলেন, তিনি বেশ ভালই ছিলেন। হঠাৎ একটা গাড়ি কিনে বসলেন এবং তারপর একমাসের মধ্যে বাড়ি বিক্রি করলেন। আমি ওকে তখনই বলেছিলাম, এত খরচ করে বাড়ি করেছেন দাম উঠবে না। তা উনি জোর দিয়ে বলেছিলেন, দুহাজার পাউণ্ড পাওয়া যাবে—এক পাউণ্ডও কম হবে না। তবে হ্যাঁ সে কথা তিনি রেখেছেন।

এ্যালিক্স বললে, ভদ্রলোক তিনহাজার পাউণ্ড পেয়েছেন।

—দুহাজার। এই রকম কথা হয়েছিল। জর্জ জোর দিয়ে বললে। তারপর বললে, একথাও উঠেছিল দাম বড় বেশি হয়ে যাচ্ছে।

এ্যালিক্স বললে—না, তিনহাজার পাউণ্ড।

এবার বুড়ো জর্জ একটু অবাক হল। বললে—মেয়েদের কাছে পাউণ্ডের হিসেব একটু গোলমালের। আশা করি আগের বাড়িওয়ালা আপনার সামনে দাঁড়িয়ে বলতে পারবেন না তিনি এই বাড়িটার জন্য তিনহাজার পাউণ্ড নিয়েছেন।

—না আমার সঙ্গে কথা হয়নি। সেসব কথা আমার স্বামীর সঙ্গে হয়েছে।

জর্জ হাসলো। তারপর ঘাড় গুঁজে নিজের কাজে মন দিয়ে খুব আস্তে আস্তে বললে—দামটা আসলে দুহাজার।

এ্যালিক্স আর তর্ক করলো না। সে এবার আগের মত ফুলের গাছগুলো দেখতে দেখতে হাঁটছিল। কয়েকটা ফুল বেছে বেছে তুললো। ফুলের গন্ধ তার বেশ ভাল লাগছিল।

হাতে একগোছা ফুল নিয়ে বাড়ির দিকে হাঁটতে গিয়ে হঠাৎ কি দেখে যেন থমকে গেল। দেখলো ফুলের একটা কেয়ারির মধ্যে গাঢ় সবুজ রঙের কি যেন বস্তু উঁকি দিচ্ছে। কৌতূহলে এ্যালিক্স এগিয়ে গেল। তারপর বস্তুটা তুলে নিল। ও হরি—হাতে নিয়ে দেখলো এটা একটা পকেট ডায়েরি। এটা যে ওর স্বামীর সেটা সনাক্ত করতে কোন অসুবিধে হল না। মনে হয় বাগানে কাজ করার সময় পকেট থেকে অসতর্ক ভাবে পড়ে গেছে।

এবার আর দশটা মেয়ে যা করে থাকে এ্যালিক্স তাই করলো। উল্টে পাল্টে ডায়েরির পাতাগুলো ওল্টাতে লাগলো। আসলে মেয়েদের কৌতূহল একটু বেশি। দেখলে ডায়েরিতে বিয়ের সময় থেকে উল্লেখ করা আছে। আশ্চর্য প্রতিটি দিনের ঘটনা লেখা আছে। মনে মনে সে জেরল্ডের পরিচ্ছন্নতা ও নিয়ামানুবর্তিতার পরিচয় পেয়ে খুশি হল। দেখা যাচ্ছে দিন আরম্ভ হওয়ার আগেই এ্যালিক্স তার দিনের কর্মসূচী আগে থেকে ছকে ফেলেছে। বিশেষ করে খাওয়ার সময় তো বটে। যেমন লেখা আছে আজ সে প্রাতঃরাশের পর গ্রামে যাবে। সময় দশটা পনেরো। আশ্চর্য জেরল্ড যখন বাড়ি থেকে বেরিয়েছে তখন ঘড়িতে ঠিক দশটা বেজে পনেরো মিনিট হয়েছিল।

আরও আছে।

ডায়েরির পাতা উল্টে দেখা গেল ওদের বিয়ের দিন স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। লেখা আছে—১৪ই মে, এ্যালিক্সের সঙ্গে বিয়ে। সেন্ট পিটার্স গির্জায়—সময় দুপুর দুটো বেজে তেত্রিশ মিনিট। এ্যালিক্স হাসলো। বড্ড বাড়াবাড়ি। পাতার পর পাতা গিয়ে থামলো—১৮ই জুন, বৃহস্পতিবার.....।

আজই তো সেই তারিখ.....হ্যাঁ আজই তো ১৮ই জুন।

তারিখের তলায় পরিচ্ছন্ন ও সংক্ষিপ্ত ভাবে জেরল্ড লিখেছে—রাত্রি নটায়.....। ব্যস আর কিছু নয়। অতিরিক্ত একটা শব্দ'ও যোগ করেনি। এই রাত নটায় কি করবে জেরল্ড। কি হবে তখন? ও তো সব কিছু আগে থেকে ঠিক করে রাখে? তাহলে লিখলো না কেন?

এ্যালিক্স ভাবতে লাগলো। ভেবে কোন কূলকিনারা পেল না। বরং হাসি পেল এই ভেবে যে ব্যাপারটা অনেকটা গোয়েন্দা কাহিনীর মত রহস্যময়। তাকে বেশ মজার খোরাক যোগালো ডায়েরিটা।

অনেক তারিখ, সাক্ষাৎকার সবই লেখা। উল্টে পাল্টে দেখেও কোন মহিলার নাম পেল না। একমাত্র সর্বত্র নিজের নাম দেখলো। এতে মনে মনে খুশি হল।

একসময় ডায়েরিটা দেখা হয়ে গেলে পকেটে রাখলো। তারপর ফুলের গন্ধ শুকতে শুকতে হাঁটা দিল বাড়ির দিকে। মনটাকে আগের মত স্বচ্ছ লাগছিল না। কোথায় যেন

একটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো। হঠাৎ কোথাও কিছু নয় নতুন করে ডিক উইগুফোর্ডের সতর্কবাণী মনে পড়লো। জেরল্ডকে বিয়ে করার প্রসঙ্গে ডিক বলেছিল—মনে রেখো লোকটা তোমার অপরিচিত। মাত্র সাতদিনের আলাপ। তুমি তার বিষয়ে কিছু জানো না। এত অল্প জেনে কাউকে বিয়ে করা উচিত নয়।

এখন মনে হচ্ছে কথাটা মিথ্যে নয়। জেরল্ডের বিষয়ে সে কিছুই ভালমত জানে না। একমাত্র জানে তার বয়স চল্লিশ। আচ্ছা, এতটা বয়স পর্যন্ত একজন পুরুষ অবিবাহিত রইলো, অথচ তার জীবনে কোন মহিলার আগমন ঘটলো না। সে কি কোন মহিলার সাহচর্য কোনদিন উপভোগ করেনি। নিশ্চয় করেছে...

পরক্ষণে ভাবলো, দূর পাগল—কি সব আজে বাজে কুচিন্তা করছে। এইসব কুচিন্তাকে মনে প্রশ্রয় না দেওয়াই ভাল। এসব নিয়ে মাথা ঘামালে, মাথাটাই খারাপ হয়ে যাবে। তাছাড়া এই ব্যাপারে তারও তো কিছু বলার আছে। সেকি বলেছে তার স্বামীকে, তার কুমারী জীবনের প্রেম কাহিনী। ডিক উইগুফোর্ডের সঙ্গে তার দীর্ঘ বন্ধুত্ব, এবং আজ সে তাকে টেলিফোন করেছিল সেই কথা? অসম্ভব এসব কথা কখনও স্বামীকে বলা যায় না বলাটা উচিত। একমাত্র যদি সে নিজে না জানতে পারে। কি জানি গ্রামে গেছে, যদি তার সঙ্গে ডিকের দেখা হয়ে যায়—ভাবতে গিয়ে বুকের ভিতরটা ছ্যাঁক করে উঠলো। একসময় মনে হল, দেখা ওদের হবে না। অতএব স্বামীকে কিছু না বলাই ভাল। স্রেফ চেপে যাওয়া। তবে এটা ঠিক জেরল্ডের হাবভাব দেখে মাঝেমধ্যে মনে হয় ও বুঝি এ্যালিক্সের সঙ্গে একটু দয়া দাক্ষিণ্যের ভাব বেশি করে। আহা বেচারি গোছের ভাব আর কি। আসলে এমন ভাব করে যেন এ্যালিক্সকে সে সবসময় সুখী করতে চায়। এখন যদি এ্যালিক্স তাকে ডিকের কথা বলে, তাহলে জেবল্ড নির্ঘাৎ তাকে কটেজে নিমন্ত্রণ করার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠবে। তখন আবার এ্যালিক্সকে বলতে হবে, ডিক নিজেই আসতে চেয়েছিল কিন্তু সে তাকে আসতে বারণ করেছে। এরপরেই স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠবে, কেন তাকে সে আসতে বারণ করেছে। শুধুমাত্র বন্ধুত্ব হলে তো বারণ করা উচিত হয়নি। তাহলে বারণ করলো কেন? তখন কি জবাব দেবে এ্যালিক্স? তখন কি সে তার স্বপ্নের কথা বলবে? স্বপ্নকে কেউ বিশ্বাস করে না, জেরল্ড তো করেই না, তখন তাকে বিশ্বাস করাবার চেষ্টা করতে হবে। যত সে বিশ্বাস করার জন্য চেষ্টা করবে, ততো হাসবে জেরল্ড। মনে মনে হয়ত অনেক কিছু ভাববে। মানুষের ভাবনার উপর তো কারো কোন হাত নেই। অতএব কি দরকার এতশত ঘোর প্যাঁচের মধ্যে যাওয়ার। তার চেয়ে এ্যালিক্স সিদ্ধান্ত নিল সে নিজে থেকে জেরল্ডকে কিছু জানাবে না। ব্যাপারটা যদিও স্বামীর কাছে গোপন করা হল—তবু এই গোপনতা তার ভাল লাগছিল না। তবুও।

দুপুরে খাওয়ার আগে জেরল্ডকে ফিরে আসতে দেখে রান্না ঘরে গিয়ে কাজের

ভান করলো। আসলে মনটা তো বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। ওই বিক্ষিপ্ত মনটাকে তার শান্ত করার প্রয়োজন।

গ্রাম থেকে ফিরে জেরল্ড কিছু না বলায় এ্যালিক্স নিশ্চিন্ত হল ডিকের সঙ্গে তার দেখা হয়নি। ফলে গোটা ব্যাপারটা যে রকম চেপে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, সেই রকম নিল। কিন্তু মনটা তার বিক্ষিপ্ত ছিল। এরই মধ্যে লক্ষ্য করলো জেরল্ডের একটু আনমনা ভাব। মনে হচ্ছে সে যেন নিজের মনে কিছু ভাবছে লক্ষ্য করছে না কিছু। আসলে মনে হয় সে তার নিজের চিন্তাতেই বিভোর হয়ে আছে। মাঝে মাঝেই এ্যালিক্সকে একই কথা দুবার বলতে হচ্ছে। জেরল্ড ঠিক মত কোন কথার উত্তরও দিচ্ছিল না।

এরপর অনেকটা সময় এক ঘেঁয়ে কাটলো। সন্ধ্যেবেলা খাওয়া দাওয়ার পর ওরা বসেছিল সোফায়। ঘরের সব জানলাগুলো খুলে দেওয়া হয়েছিল যাতে বাইরের ঠাণ্ডা বাতাস ঘরটাকে শীতল ও সুরোভিত করে। এ্যালিক্সের তখন মনে পড়লো ডায়েরিটার কথা। ওমা! ওটাতো ফেরৎ দেওয়া হয়নি। এবার সে নিজের জামার পকেট থেকে ডায়েরিটা বার করে জেরল্ডের দিকে বাড়িয়ে দিল। অহেতুক সন্দেহ ও বিভ্রান্তি থেকে সে মুক্তি পেতে চাইলো।

—এই নাও, এইটা তোমার হারিয়েছিল।

জেরল্ড বললে—নিশ্চয় বাগানে।

—হ্যাঁ। এখন আর তোমার যাবতীয় গোপন কথা আর গোপন নেই।

—সেটাতো ভাল কথা।

—কিছু একটা সংকেত শুধু বুঝলাম না। রাত নটার সময় তোমার কী এমন মহৎ কাজ সমাধা হবে।

জেরল্ড হাসলো বটে তবে উত্তর দিতে একটু সময় নিল। বললে গোল গোল চোখে এ্যালিক্সের দিকে তাকিয়ে—ওইসময় এক সুন্দরী যুবতীর সাহচর্য গ্রহণ করবো। যুবতীর মাথায় অতি সুন্দর চুলের রাশি, দু' চোখে সাগরের মত নীলাভ দৃষ্টি, আসলে সে ঠিক তোমার মত দেখতে। নাম এ্যালিক্স।

এ্যালিক্স একটু অভিমানের সুরেই বললে—ঠিক বুঝলাম না, হেয়ালি না করে স্পষ্ট ভাবে বলো। আমি যা প্রশ্ন করেছি তার উত্তর দাও।

জেরল্ড হেসে বললে—আরে বাবা বললাম তো। আসলে আমার কিছু ফটো ওয়াস্ করতে হবে তার জন্য তোমার সাহায্য দরকার।

জেরল্ড ভাল ছবি তোলে। ওটা ওর নেশা। যদিও ওর ক্যামেরা খুব একটা আধুনিক নয় তবু ওর হাতটা ভাল। সে এই বাড়ির একটা ছোট ঘর বেছে নিয়ে ডার্করুম করেছে। এই ফটো তোলার নেশার জন্য সে এ্যালিক্সের ছবি তোলে নানান ভঙ্গিমায়।

এ্যালিক্স বললে—এই কাজটা আজ রাত নটার সময় হওয়া চাই।

এ্যালিক্সের কথায় জেরল্ড বিরক্ত হলেও মুখে কোনরকম বিরক্তি প্রকাশ করলো না। শুধু বললে—যে কোন কাজ করতে গেলে আগে থেকে তার জন্য নির্দিষ্ট সময় বেছে নেওয়াই বাঞ্ছনীয়। এতে কাজের সুবিধা হয়।

এ্যালিক্স কয়েক মিনিট স্বামীর দিকে তাকিয়ে বসে রইলো। মুখ দিয়ে কথা বেরুলো না। সে তার স্বামীকে লক্ষ্য করছিল। জেরল্ড চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছে। নিখুঁত ভাবে দাড়ি কামানো। তাকে দেখতে দেখতে এ্যালিক্সের মধ্যে পা থেকে মাথা পর্যন্ত যেন একটা বিদ্যুৎ প্রবাহ খেলে গেল। সমস্ত শরীর শিহরিত হল, কেন যে তার এমন হল তা সে নিজেই জানে না। কিছুক্ষণ নিজেকে স্থির রাখার পর কিছুটা জোরে চিৎকার করে বলে উঠলো উফ্ সত্যি, আমি তোমার বিষয়ে কত কম জানি।

জেরল্ড বললে, এমন কথা বলছো কেন, আমার বিষয়ে সব কথা তো আমি তোমাকে জানিয়েছি। গোপনতো কিছু করিনি। নর্থদামবারল্যাণ্ডে আমার কৈশোর, যৌবন কেটেছে দক্ষিণ আফ্রিকায়, গত দশ বছর ধরে কানাডায়, সেখানকার ব্যবসার সফলতা ব্যর্থতা সবই তো তোমাকে বলেছি, কি বলিনি?

—হ্যাঁ ব্যবসার কথা বলেছ।

এবার জেরল্ড হেসে ফেললে—তাহলে কি কথা বলিনি—প্রেমের কথা। ভালবাসার কথা। ভগবান তোমাদের প্রত্যেকটা মেয়েকে একই ছাঁচে তৈরি করেছেন। মানুষের ব্যক্তিগত খুঁটিনাটি সবই জানতে হবে—কি কৌতূহল।

এ্যালিক্সের গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছিল। ঢোক গিলতে পর্যন্ত অসুবিধে হচ্ছিল। সে বিড়বিড় করে নিজের মনে বললে—না মনে থাকতেও তো পারে কেউ, তেমন কিছু ঘনিষ্ট ব্যাপার। প্রেম মানে......কারো সঙ্গে পরিচয়.....আমি যদি জানতে পারতাম।

এবার জেরল্ড অসম্ভব গম্ভীর হয়ে গেল। এতক্ষণের সরস হাসি হাসি মুখটা হঠাৎ শুকিয়ে নিরস হয়ে গেল। তারপর গম্ভীর গলায় বললে—আমি জানি না এ্যালিক্স ওসব 'ব্লুবিয়ার্ড চেম্বার বিজনেস' এ কি লাভ হবে। তবে কথা যখন তুললে তখন লুকিয়ে লাভ নেই, কারণ তুমি আমার কথা বিশ্বাস করবে না। তবে হ্যাঁ আমার জীবন একবারে নারী বর্জিত নয়। তারা এসেছে। যৌবনের দিনগুলিতে তারা গুঞ্জন তুলেছে—ব্যস এই পর্যন্ত। এর বেশি আর কেউ কোন রেখাপাত করেনি। আমার কাছে তাদের কোন মূল্য নেই, অর্থ নেই। এদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার কোন আলাদা সত্ত্বা আমার মধ্যে আছে, অন্তত এই একটা ব্যাপারে তুমি আমায় বিশ্বাস করতে পারো।

কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তা ছিল। এ্যালিক্সের দিকে তাকিয়ে বললে কি হল আমার বক্তব্যে খুশি হয়েছ?

এ্যালিক্স সাড়া দিল না। মনে হয় সে তখন অন্যকিছু ভাবছে। কিছুটা বিরক্তির ভাব নিয়ে জেরল্ড বললে—আজ রাত্রে, মানে আজ রাত্রেই তোমার মাথার মধ্যেই এইসব অবান্তর ভাবনাচিন্তাগুলো কেন ঢুকলো বলতে পারো?

এ্যালিক্স নিজের চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললে—কেন তা আমি বলতে পারবো না। আমি জানি না কেন এসব কথা মাথায় এলো। আজ সারাটা দিন আমার ভীষণ অস্বস্তিতে কেটেছে।

—খুবই খারাপ। ভীষণ খারাপ ব্যাপার। জেরল্ড আলতো গলায় ফিস্‌ফিস্ করে বললে।

—খারাপ। কিসের খারাপ। কেন খারাপ? একটু চড়া গলায় এ্যালিক্স বললে।

জেরল্ড বললে—আরে আমাকে এত ধমক দিচ্ছ কেন, আমি শুধু বলতে চাইছি এটা অত্যন্ত খারাপ লক্ষণ। তুমি এত হাসিখুশি এত সুন্দর তোমার মধ্যে এমন ভাবনা আসাটা খারাপ।

এ্যালিক্স বললে—আজ আমার একদম কিছু ভাল লাগছে না। মনে হচ্ছে একটা চক্রান্ত আমার বিরুদ্ধে চলেছে। সব কিছু আমার বিরুদ্ধে যাচ্ছে। এমনকি জর্জ, সে'ও কোথা থেকে একটা অদ্ভুত ধারণা নিয়ে এসেছে।

—কি বলেছে বুড়োটা।

—বলেছে আমরা নাকি কাল ভোরে লণ্ডন চলে যাচ্ছি। আর কথাটা নাকি তুমি তাকে বলেছ।

—তার সঙ্গে তোমার কোথায় দেখা হল?

—শুক্রবারের বদলে আজ সে কাজ করতে এসেছিল।

জেরল্ড ভীষণ রেগে গেল। বললে—হারামজাদা বুড়ো শয়তান।

এ্যালিক্স তার স্বামীর হঠাৎ রেগে যাওয়া দেখে একটু অবাক হল। এত সামান্য কারণে এইভাবে সে রেগে যায় না। আজ রেগে গেল। ব্যাপার কি? এর মধ্যে রাগের এত কি হল? এ্যালিক্সের মুখচোখের ভাব লক্ষ্য করে জেরল্ড দ্রুত নিজেকে সামলে নিল। বললে—বুড়ো-আসলে এক নম্বরের গাধা।

—কেন গাধার কী হল। তাকে তুমি গাধা ভাবছো কেন? তাকে তুমি এমন কি বলেছ যাতে জর্জ ওরকম ভেবেছে?

—আমি। আমি তাকে সেরকম কিছু কথা বলিনি। ও হ্যাঁ মনে পড়েছে। তাকে একবার কথায় কথায় বলেছিলাম হয়ত আমি আজ একবার লণ্ডনে যেতে পারি। ও আমার সেই কথাকে ধরে নিয়েছে। অথবা এমন হতে পারে আমি যা বলেছি, সে তা শুনতে পায়নি। যাক তুমি তাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়েছ তো?

—হ্যাঁ বুঝিয়েছি, তবে কতটুকু বুঝেছে বলতে পারবো না। বুড়োদের মাথায় একবার কিছু ঢুকলে তাড়ানো খুব কঠিন। এই বাড়ির দাম নিয়ে কথা বললো জর্জ, ওকে আমি কিছুতেই বোঝাতে পারলাম না বাড়ির দাম দুহাজার নয় তিন হাজার পাউণ্ড নিয়েছে বাড়িওয়ালা। ও সেই এককথা বলতে লাগলো দুহাজার পাউণ্ডের বেশি ভদ্রলোক নিতেই পারে না।

জেরল্ড শুনলো কথাগুলো অনেকক্ষণ ধরে। তার মাথায় তখন ভাবনার জট। তারপর বললে, বাড়িওয়ালা দুহাজার পাউণ্ড ক্যাশ নিয়েছেন আর বাকি হাজার পাউণ্ড মর্টগেজে'এ আমার ধারণা ওই বুড়ো বেটা নগদের হিসাবটা জানে মর্টগেজের ব্যাপারটা জানে না।

—হতে পারে। এটাই স্বাভাবিক। এ্যালিক্স স্বামীর সঙ্গে একমত হয়।

হঠাৎ কথা বলতে বলতে ঘড়ির দিকে তাকালো। নটা বেজে পাঁচ মিনিট। এ্যালিক্স বললে—কি হল নটা তো বেজে গেল, আমাদের নির্দিষ্ট কাজে যেতে হবে না।

—না থাক, আজ ও কাজ করবো না। আমি মত পাল্টেছি। আজ আর কোন ছবি টবি নয়।

আশ্চর্য নারী চরিত্র। কোন কিছু বোঝার উপায় নেই। ক্ষণে ক্ষণে এদের রূপ বদল হয়। খানিক আগে যে মনের মধ্যে অসম্ভব এত ভীতি বোধ করছিল, তা সম্পূর্ণ উবে গিয়ে পরম শান্তিতে এবং নির্বিঘ্নে বৃহস্পতিবার রাতে শুতে গেল এবং পরম শান্তিতে ঘুমলো। কোন রকম বাধার সৃষ্টি হল না।

অথচ পরের দিন দিনের আলো কমে আসার সঙ্গে সঙ্গে অবচেতন মনে কিসের একটা ভয় তাকে তাড়া করতে শুরু করলো। তার মনে হতে লাগলো কিছু একটা তার অলক্ষ্যে ঘটছে—অথচ সে বুঝতে পারছে না।

ডিক আর ফোন করেনি। কিন্তু তার প্রভাব মনে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। মনে পড়ছে বারবার বিয়ের আগে ডিক তাকে বলেছিল, তুমি কাকে বিয়ে করতে যাচ্ছ? সে একজন বিদেশি। তুমি তার সম্পর্কে কিছু জানো না। কিছু না জেনে কাউকে বিয়ে করাটা ঠিক নয়। ভাবতে গিয়ে স্বামীর মুখটা মনে পড়লো। সে বলেছিল—ও সব 'ব্লুবিয়ার্ড চেম্বারে গল্প'। ওই সব এঁদো গল্পের স্মৃতি টেনে এনে লাভ কি হবে? জেরল্ডের এই সব কথার অর্থ এ্যালিক্স কিছুই বোঝেনি।

শুক্রবারটা পার হলেও শনিবার সকালের মধ্যে এ্যালিক্স বুঝতে পারলো জেরল্ড'এর জীবনে আরও অনেক নারী এসেছিল। জেরল্ড তাদের সম্পর্কে লুকিয়ে রেখেছে তার কাছে। ফলে তার মধ্যে অদ্ভুত একটা হিংসা জন্মালো। হিংসা নারী অঙ্গের ভূষণ। তার মনে হল সেদিন রাত নটায় নিশ্চয় তার কারো সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল। ফটো প্রিন্টের গল্পটা তাৎক্ষনিক তৈরি। পরিস্থিতির ফসল।

তারপর সে ভাবতে শুরু করলো পুরনো ঘটনা গুলো। ডায়েরি পাওয়ার ঘটনা থেকে শুরু করে এখনও পর্যন্ত যা কিছু ঘটেছে সবই তার বিরুদ্ধে গেছে। মানসিক যন্ত্রণার উদবেগ করেছে।

তিনদিন আগেও সে বলতে পারতো স্বামীকে চেনে। কিন্তু এখন আর সে কথা বলতে পাচ্ছে না। তার ধারণা তার স্বামী একজন বিদেশি, সমস্ত দিক দিয়ে তার অজানা এক চরিত্র। মনে পড়লো বুড়ো জর্জের উপর অকারণ রাগ, যার কোন অর্থ হয় না। ছোট ঘটনা অথচ কি তীব্র প্রতিক্রিয়া। এমনটা ভাবেনি। কাজেই বলা যায় স্বামীকে সে চেনে না।

শনিবার সাপ্তাহিক বাজার তোলা হয়। এ্যালিক্স ঠিক করলো সে নিজে বাজারে যাবে। জেরল্ড যেমন বাগানের কাজ করছে করুক। কিন্তু প্রস্তাবটা দিতেই জেরল্ড প্রতিবাদ করলো বললে, না, না তা হয় না তুমি বাড়ি থাকবে। সে নিজে বাজারে গেল। এ্যালিক্সের মনে সন্দেহ দোলা দিল। সে বুঝতে পারলো কেন তাকে স্বামী বাজারে যেতে দিল না। এর ফলে মনের মধ্যে আবার একটা বিপদের সুর বাজলো।

তার মনে হল জেরল্ড কি জানে ডিক গ্রামে এসেছে। মনে হয় সে চায় না ডিকের সঙ্গে তার স্ত্রীর আবার দেখা হোক। পুরুষের হিংসা। তাকেও কিন্তু স্বামীর বিরুদ্ধে তথ্য প্রমাণ জোগাড় করতে হবে।

জেরল্ড বাজারে যাওয়ার পর থেকে এ্যালিক্সের মানসিক যুদ্ধ শুরু হল। সে স্বামীর ঘর গোছানোর ভান করে তন্ন তন্ন করে ঘরের চারদিক খোঁজ করলো কিছু পাওয়া যায় কিনা।

শেষে বাকি ছিল টেবিলের দুটো ড্রয়ার। সে দুটো বন্ধ। এ্যালিক্সের ধারণা হল এই ড্রয়ার দুটো খুলতে পারলেই সে অনেক কিছু পেয়ে যাবে। দৌড়ে নিচের তলায় চলে গেল। চাবির গোছাটা নিয়ে এলো। একে একে অনেক চাবি দিয়ে চেষ্টা করার পর একটা ড্রয়ার খুলে গেল। দেখতে পেল লাল ফিতে দিয়ে বাধা একগোছা চিঠি। এ্যালিক্সের মনটা নেচে উঠলো। চিঠির গোছাটা বার করলো। সুতোর ফাঁস খুললো। তারপর নিজেই লজ্জা পেল—এইগুলো বিয়ের আগে তার নিজের লেখা।

এবার দ্বিতীয় ড্রয়ার। একটা চাবিও তালাতে লাগলো না। আবার নিচে গেল। অতিরিক্ত চাবির গোছাটা নিয়ে এলো। এবার পরিশ্রম সার্থক। ড্রয়ার খুলে গেল। দেখতে পেল ওর মধ্যে বিবর্ণ হয়ে যাওয়া কিছু খবরের কাগজের কাটিং আছে, তা ছাড়া আর কিছুই নেই।

কাগজের কাটিং যখন যত্ন করে রেখেছে তখন এর মধ্যে কিছু রসদ নিশ্চয় আছে। এবার সে কাটিংগুলোর উপর চোখ বোলালো। দেখলো কাটিংগুলো আমেরিকান কাগজের। প্রায় বছর সাতেক আগেকার। চার্লস লামাটরে নামে একজন প্রতারক নারীঘটিত অপরাধের বিচারের কার্যাবলীর বিবরণ। এ্যালিক্স পড়ে

গেল। একটা বাড়ির মেঝে খুঁড়ে নারী কঙ্কাল পাওয়া গেছে। আগে সেখানে সে ভাড়া থাকত। আরও দেখা যাচ্ছে আগে সে অনেকবার বিয়ে করেছে—কিন্তু সেই সব স্ত্রীদের আর দেখা যায়নি। যদিও সে কোর্টে নিজেকে নিরাপরাধ সাজাবার চেষ্টা করেছিল বাঘা বাঘা উকিল দিয়ে, কিন্তু এতে তার ফাঁসি হইনি তবে কয়েক বছরের জন্য জেল হয়েছিল।

এ্যালিক্সের মনে পড়লো এই বিচারের কথা। চারদিকে দারুণ নাড়া পড়েছিল। এরপর পাঠকেরা আরও উত্তেজিত হয়েছিলেন যখন জানা যায় সে জেল ভেঙ্গে পালিয়েছে৭ পত্রিকাগুলোর কাটিং পড়ে যাচ্ছিল। তারা বেশ গুছিয়ে ঘটনাগুলো লিখেছে। একটা ছবিও ছাপা হয়েছে। ছবিটা দেখে এ্যালিক্স চমকে উঠলো। খুব চেনা চেনা—কার সঙ্গে যেন অদ্ভুত মিল। কিন্তু কার সঙ্গে বুঝতে পাচ্ছিল না।

অবাক হচ্ছিল এই কাটিংগুলো জেরল্ডের ড্রয়ারে কেন? তার যে এই অপরাধে আগ্রহ আছে তাতো সে জানতো না। মুখটা কার মত? কে হতে পারে? তাতে গিয়ে মনে হল অনেকটা জেরল্ডের মত। চোখ, ভ্রু সব মিলে যাচ্ছে। এরপর আবার সে পত্রিকার কাটিং পড়লো। লেখা—"অভিযুক্তের ডায়েরিতে কয়েকটা তারিখ পাওয়া গেছে, সকলের ধারণা এই তারিখগুলিতেই সে তার মহিলাদের সঙ্গে ভবলীলা সাঙ্গ করেছিল। এক মহিলা ওকে সনাক্ত করেছেন। অভিযুক্তের বাঁ হাতের থাবার ঠিক পিছনে একটা জরুল আছে।"

এরপর আর কিছু পড়ার নেই। এ্যালিক্স দাঁড়িয়ে যেন দুলতে লাগলো। কাগজের কাটিংগুলো মাটিতে ছড়িয়ে পড়লো। বারবার মনে হল বা হাতের কব্জিতে জরুলটার কথা। চোখের সামনে তার সব কিছু ঘুরছে।

এবার সে ধীরে ধীরে বুঝলো, বাড়ি যে কেনা হয়েছে সেটা তার অর্থে। তার উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া সমস্ত সম্পত্তির কাগজ এখন তার হাতে।

সে তো বিশ্বাস করেই দিয়েছিল স্বামীকে। এরপর মনে হল তার স্বপ্ন বাস্তবে রূপ দিতে চলেছে। সে বুঝলো অবচেতন মনে সে জেরল্ডকে ভয় করে এসেছে। এই ভয় থেকে স্বপ্ন দেখা, সে স্বপ্ন এখন সত্যি হতে চলেছে।

এ্যালিক্সের মনে হল সে যেন ফুরিয়ে যাচ্ছে। শীতল মৃত্যু তার শিহরে। জেরল্ড মার্টিন, মানে তার স্বামীই হচ্ছে সেই ভয়ঙ্কর শয়তান চার্লস লামেটার। এই মুহূর্তে তারও তো বাঁচার প্রয়োজন। তবে কি তাকে বাঁচাবার জন্য ডিক উইণ্ডফোর্ড সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। যে স্বপ্নকে সে এতদিন ভয় পাচ্ছিল স্বামীর কল্যাণে, সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্য আজ সে প্রথম উদগ্রিব হল। মনে হল, সে হচ্ছে লামেটারের আর একটা শিকার। খুব শীঘ্রি সেই তালিকায় তার নামটাও যোগ হবে।

কথাটা মনে হতেই এ্যালিক্স যেন ডুকরে উঠলো। মনে পড়লো বৃহস্পতিবার,

রাত্ত নটায়। ছবির পরিস্ফুটনের জন্য অন্ধকার ঘর। আগেও সে এমনি করে তার মত কিছু মেয়েকে পুঁতে রেখেছিল। এবার সে বৃহস্পতিবার ছক কষেছিল। আচ্ছা লোকটা কি পাগল.....পাগল না হলে কেউ আগে ভাগে ডায়েরিতে বার, সময় সমস্ত হিসাব লিখে রাখে। আসলে আগাম দিনের কার্যাবলী লিখে রাখাটা ওর অভ্যাস। খুন করাটা ওর কাছে আর দশটা কাজের মতই সহজ, আর দশটা ব্যবসার মত। ভুলচুক করতে চায় না বলে আগে থেকে দিন, তারিখ, সময়, সবকিছু লিখে রাখে।

তবু এ্যালিক্স বেঁচে আছে। বৃহস্পতিবার থেকে শনিবার গড়িয়েছে। কেমন ভাবে বেঁচে আছে, কিসের কারণে তাকে জেরল্ড এখনো বাঁচিয়ে রেখেছে তার কারণ খুঁজতে গিয়ে সহজ একটা উত্তর পেল। আসলে বুড়ো জর্জ মালি, ওই ওকে বাঁচিয়ে রেখেছে। কেন যে জেরল্ড বুড়ো মানুষটার উপর এত চটেছিল এখন বুঝতে পাচ্ছে। বুড়ো হয়ত সকলকে বলেছে তারা লণ্ডন চলে যাচ্ছে শুক্রবার। এই অবস্থায় বৃহস্পতিবার রাতে খুন করাটা বোকামো হয়ে যেত। আবার বুড়ো বৃহস্পতিবার শুনেছে আমার কাছ থেকে, লণ্ডনে যাওয়ার কথাটা মিথ্যে। বুড়োর মনে সন্দেহ নিশ্চয় হত...সেইজন্য জেরল্ড বৃহস্পতিবার, শুক্রবার এই কাজ করেনি। যদি ও বুড়ো জর্জের কথা জেরল্ডকে না বলতো—তাহলে? এ্যালিক্সের পা যেন টলে গেল। কাঁপতে থাকলো সমস্ত শরীর।

না—না—আর একমুহূর্তও এখানে নয়। এখুনি জেরল্ড বাজার থেকে ফেরার আগে তাকে এই বাড়ি থেকে পালাতে হবে। আর একটা রাতও ওর সঙ্গে এক ছাদের নিচে থাকা চলে না। তাড়াতাড়ি কাগজপত্রগুলো ড্রয়ারে ঢুকিয়ে চাবি বন্ধ করলো।

কিন্তু তার যে হাঁটার মত ক্ষমতা নেই। সে তো চলতে পারছে না। গেট খোলার শব্দ শোনা গেল। স্বামী ফিরে এসেছে। মুহূর্তের মধ্যে জমে যেন বরফ হয়ে গেল। তারপর ছুটে গিয়ে পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো।

হ্যাঁ জেরল্ড! হাসতে হাসতে সে আসছে। শিষ দিয়ে গানের সুর ভাঁজছে। ওর হাতের দিকে তাকিয়ে এ্যালিক্সের দমবন্ধ হয়ে গেল। ওটা কি ওর হাতে— কোদাল? বাজার থেকে ঝকঝকে একটা নতুন কোদাল কিনে এনেছে।

তবে কি আজই সেই কাল রাত্রি! এখনও পালাবার সুযোগ আছে। জেরল্ড কোদাল নিয়ে বাড়ির পিছন দিকে গেল। তবে কি ও কোদালটাকে ওই ছোট্ট ঘরে রাখতে গেছে। জীবনের শেষ ঘন্টার ধ্বনি শুনতে পেল এ্যালিক্স। এতটুকু সময় আর তার নষ্ট করা উচিত হবে না। যেই সে ছুটে দরজার কাছে পৌছেছে ওমনি শুনতে পেল জেরল্ডের কণ্ঠস্বর।

—আরে কি ব্যাপার দৌড়ে চললে কোথায়?

এ্যালিক্স কিছু বলতে পারলো না। সমস্ত শরীরটা তার কাঁপছে। সুযোগ হাত ছাড়া হল। বাঁচার সুযোগ। মৃত্যু অবধারিত। তবু সে কোনরকমে বললে—আমি একটু রাস্তায় পায়চারি করবো। বন্ধ ঘরে বড় একা লাগছে।

জেরল্ড বললে—তা একা থাকলে অনেকসময় এই রকম মনে হয়। তো চলো আমিও তোমার সঙ্গে যাচ্ছি। মনে হচ্ছে তোমার শরীরটা ভাল নেই।

এ্যালিক্স একটু ক্ষীণ প্রতিবাদ করলো। বললে—না, না তোমার আসার দরকার নেই। আমি একলা পায়চারি করতে চাই।

জেরল্ড হেসে বললে—তাতো হয় না, তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি খুব ক্লান্ত। তুমি তো কাঁপছো? কি হয়েছে বলতো তোমার।

—কিছু না।

—উঁহু।

—ওরে বাবা, আমার মাথা ধরেছে। মাথা ধরলে আমার কিছু ভাল লাগে না। তাই ভাবছিলাম একটু পায়চারি করবো। আর আমি চাই না তুমি আমার সঙ্গে থাকো।

জেরল্ড রাগ করলো না। কেবল নির্লিপ্তভাবে হাসতে হাসতে বললে—তাহলে তো আমাকে তোমার সঙ্গে যেতেই হয়। তুমি চাও আর নাই চাও, আমার তাতে কিছু এসে যাবে না।

এরপর আর কিছু বলার নেই। বলতে সাহসে কুলোলো না। সবচেয়ে ভয় হচ্ছিল বেফাঁস কিছু না বলে ফেলি। মুখ থেকে কিছু বেরুনো মানে জেরল্ড জেনে যাবে আমি সব জেনে গেছি। আমি সেটা হতে দিতে চাই না। চাই না সবকিছু ভেস্তে দিতে।

অতএব একটু বাইরে পায়চারি করে জেরল্ডের কথা মত ঘরে ফিরে এলো। জেরল্ড তাকে বিছানায় শুতে বাধ্য করলো। তারপর বাধ্য স্বামীর মত কপালে ওডিকলোন লাগিয়ে দিল। শুয়ে শুয়ে এ্যালিক্স বুঝতে পাচ্ছিল সে একটা গোপন ফাঁসে জড়িয়ে পড়েছে। শরীরের মধ্যে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোকে সে নড়াতে পারছিল না।

এরপর সারাক্ষণ জেরল্ড ওকে ছায়ার মত অনুসরণ করেছে। রান্নাঘরে গেছে, খাবার সময় ডিসগুলো এনে গুছিয়ে দিয়েছে। দেখেশুনে মনে হয়েছে একজন কর্তব্যপরায়ণ স্বামী। খাবার কিছুতেই গলা দিয়ে নামছিল না। সমস্ত খাদ্যনালি মনে হয় শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। অনেক কষ্ট করে খাবারগুলো খাচ্ছিলো না গিলছিল। এই মুহূর্তে তার মনে হচ্ছিল এটাকে বেঁচে থাকা বলে না। সে যে বেঁচে আছে এখনও, এবং আর কতক্ষণ থাকবে তা বলা কঠিন। এমন ফাঁকা জায়গায় সে

চিৎকার করলেও কেউ কিছু শুনতে পাবে না। একটুখানি একলা পেলে সে টেলিফোনে কারো কাছে সাহায্যে চেয়ে পাঠাতে পারে। অথবা দৌড়ে পালাতে পারে...কিন্তু জেরল্ড তো তাকে একলা হওয়ার সুযোগ দিচ্ছে না।

একবার মনে হল, সে জেরল্ডকে বলবে কিনা ডিকের কথা। বলবে কি আজ সন্ধ্যায় ডিক তাদের এখানে আসবে। তাহলে কি সে তার ছক বদল করবে? না—তা হয় না। হয়ত তাহলে মৃত্যু আরও তরান্বিত হবে। হয়ত সে ঠাণ্ডা মাথায় এ্যালিক্সকে খুন করে, ডিককে টেলিফোন করে বলবে, আজ এ্যালিক্সের শরীর ভাল নেই, অথবা বিশেষ কাজে এ্যালিক্স বাইরে গেছে। একমাত্র ডিক যদি নিজে আসতো....আজ সন্ধ্যেবেলাটা।

ডিকের কথা মনে করতে করতে হঠাৎ তার মনে হল একটা কাজ করলে হয় না...একবার আড়চোখে স্বামীকে দেখে নিল। পরিকল্পনাটা মাথায় আসতে মনের মধ্যে কিছুটা জোর পেল। নিজেকে স্বাভাবিক বলে মনে হল। নিজেকে নিজেই মনের জোর ফিরে পাওয়ার জন্য বাহবা দিল। এবং তারপর যতটা পারলো স্বাভাবিক হল। একসময় তার মনে হল জেরল্ড তাকে নিয়ে আর ব্যস্ত নয়, অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েছে। চেয়ারে বসে বসে লোকটা হয়ত তাকে কি ভাবে কুপিয়ে খুন করবে তার ছক কষছে।

এ্যালিক্স কফি বানালো। তারপর বাইরের বারান্দায় দিয়ে গেল যেখানে বসে একসময় তারা মধুর সন্ধ্যাতারাগুলোর উজ্জ্বলতায় স্নান করতো।

জেরল্ড বললে—ভাল কথা, পরে আমরা ওই ছবিগুলোর গতি করবো।

এ্যালিক্সের পা কেঁপে উঠলো। ঠাণ্ডা একটা হিমস্রোত বয়ে গেল শিরদাঁড়া বেয়ে। অনেক কষ্টে বললে, তুমি একা করতে পারবে না? আসলে আমার ভাল লাগছে না।

জেরল্ড বললে—বেশি সময় নেব না। আমি বলতে পারি তুমি এই কাজে একদম পরিশ্রান্ত হবে না।

জেরল্ড কথাগুলো বেশ নরম করে, মজা করে ভিজিয়ে ভিজিয়ে বলছিল। আসলে শয়তানের কণ্ঠস্বর শয়তানির আগে এমন নরম হয়। এ্যালিক্সের মনে হল প্ল্যানমাফিক কাজ করার এটাই হল প্রকৃষ্ট সময়। তাই সে উঠে দাঁড়ালো। বললে—দাঁড়াও আমি মাংসওয়ালাকে একটা ফোন করে আসি।

—এই রাতে?

—হ্যাঁ। ওর দোকান বন্ধ হয়ে গেলেও অসুবিধে নেই। ওর বাড়ির ফোন নম্বর আমার জানা আছে। কাল তার বাছুর কাটার কথা আছে। যদি কাটে তাহলে যেন আমার জন্য খানিকটা পাঠিয়ে দেয়। জানোই তো আগে থেকে বলে না রাখলে পাওয়া যাবে না কেউ হয়ত ছোঁ মেরে তুলে নেবে।

কথাটা বলে এ্যালিক্স ঘরে এলো। দরজা বন্ধ করলো। বন্ধ করলো মানে ভেজালো। জেরল্ড বললে, আরে দরজা বন্ধ করছো কেন? দরজা বন্ধ করো না।

—মাছি ঢুকবে। তুমি তো জানো মাছি একদম আমি পছন্দ করি না। আর তাছাড়া আমি তো মাংসওয়ালার সঙ্গে প্রেম করছি না।

দ্রুত ফোনটা তুলে নিয়ে, অপারেটরকে জানালো—প্লিজ, প্লিজ আমাকে ট্রাভেলার্স আর্মস, হোটেলের নম্বর দিন।

লাইনটা সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে গেল। ও পাশ থেকে কণ্ঠস্বর—

—কাকে চাই?

—একবার মিস্টার ডিক উইণ্ডফোর্ডকে দিন, খুব জরুরী উনি হোটেলে আছেন।

—হ্যাঁ ধরুন।

ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরে ঢুকলো জেরল্ড।

—কি ব্যাপার?

—তুমি বাইরে যাও জেরল্ড। টেলিফোনে কথা বলার সময় কাছাকাছি কেউ থাকলে আমার খুব বিরক্ত লাগে। আড়িপাতা ব্যাপারটা আমার খুব ঘেন্না করে।

জেরল্ড হাসতে হাসতে— তুমি সত্যি সত্যি মাংসওয়ালাকে ফোন করছো তো?

উফ্ অসহ্য। এই পরিকল্পনাটাও কি আমার বিফল হবে। এখন জেরল্ড, কি ভাবে সে ফোনে ডিককে বলবে সে ভীষণ বিপদে আছে। এখুনি আসতে। আবার ডিক বুঝবে তো তার কথা। ভাববে নাতো রসিকতা করছি।

কিভাবে ফোনে কথাটা বলা যায়। নতুন কোন উপায় উদ্ভাবন করার জন্য ভাবছিল এ্যালিক্স। তার হাতের আঙুলগুলো তখন ফোনের চাবিগুলোর উপর। ফলে চাবি টেপার জন্য আওয়াজ আসছে আবার বন্ধ হচ্ছে। আর এই পদ্ধতিতেই সে কথা বলবে ঠিক করলো। যদিও কাজটা কঠিন, মাথা ঠাণ্ডা রেখে করতে হবে এবং তাড়াতাড়ি করতে হবে।

ওপাশ থেকে ডিক উইল্ডফোর্ডের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। এ্যালিক্স যেন হাফ ছেড়ে বাঁচলো। ফোনের চাবি টিপে ধরে সাধারণ ভাবেই বললে—ফিলোমেল কটেজ থেকে বলছি। আমি মিসেস মার্টিন। দয়া করে—শীঘ্রি আসুন (চাবি ছেড়ে দিয়ে) কাল সকালে কিছুটা বাছুরের মাংস হবে কি? (চাবি টিপে) খুব জরুরী (চাবি ছেড়ে) অনেক ধন্যবাদ মিস্টার হেক্স ওয়ার্থি। এত রাতে আপনাকে বিরক্ত করার জন্য কিছু মনে করলে (চাবি টিপে) আমার জীবন মৃত্যুর ব্যাপার (চাবি ছেড়ে) খুব ভাল, কাল ভোরে (চাবি টিপে) যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আসতে হবে। (চাবি ছাড়া)।

কোনরকমে কথা শেষ করে টেলিফোন নামিয়ে রাখলো। উফ্ ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছাড়লো। ডিক আবার বুঝতে পারলে হয়।

এবার সে স্বামীর সামনে এলো।

—তুমি কি মাংসওয়ালার সঙ্গে এইভাবে কথা বলো নাকি।

এ্যালিক্স বললে—মেয়েরা এইভাবে কথা বলে। যাক জেরল্ড সন্দেহ করেনি। ডিক কিছু বুঝেছে কি না সে জানে। তবু মন বলছে সে আসবে। ঠিক আসবে। এবার বসার ঘরে গেল। বাতি জ্বাললো। জেরল্ড তাকে অনুসরণ করলো।

—কি ব্যাপার, তোমাকে এত উৎফুল্ল দেখাচ্ছে?

—তাই বুঝি। ওটা তোমার চোখের দোষ। তুমি সব সময় আমায় উৎফুল্ল দেখ। তবে এইটুকু বলতে পারি মাথার ব্যথাটা এখন নেই।

এ্যালিক্স নিজের চেয়ারে এসে বসলো। জেরল্ড পাশের চেয়ারে। এখন আটটা বেজে কুড়ি। নটার মধ্যে ডিক ঠিক চলে আসবে।

—তোমার কফিটা খুব ভাল হয়নি।

—হতে পারে একটু নতুন কায়দায় করেছি।

—ভীষণ তিতো লাগছে।

—বললাম তো ভাল না লাগলে, এভাবে আর করবো না।

এ্যালিক্স একটা সেলাই নিয়ে বসে ছিল। ওতে সে ব্যস্ত ছিল।

জেরল্ড একটা বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছিল। একসময় ঘড়িতে সাড়ে আটটা বাজলো।

জেরল্ড বললে—চলো, এখন আমার ছবিগুলো প্রিন্ট করার সময় হয়েছে।

এ্যালিক্স বললে—আমার হয়নি, আগে নটা বাজুক। তারপর।

—না, না, সাড়ে আটটা। আমি আজ ওই সময়টা নির্ধারণ করেছি। তাড়াতাড়ি কাজ সারা হলে তাড়াতাড়ি শোয়া যাবে।

—না, নটা বাজুক।

জেরল্ড ভীষণ একগুয়ে। চোখ পাকিয়ে বললে—আমার কথার অবাধ্য হয়ো না।

—বলছি তো নটায়।

—না সাড়ে আটটায়। যদি তুমি না ওঠে তাহলে তোমাকে কোলে করে নিয়ে যাব।

এ্যালিক্স ভয় পাচ্ছে। জেরল্ড তার দিকে এগিয়ে আসছে। আঙুলগুলো মুষ্ঠিবদ্ধ করছে। ওকে বোঝানো মুশকিল। দমানো জরুরী। কি ভাবে দমাবে। ক্ষুধার্ত বাঘ ক্ষেপে গেছে।

এবার সে খুব জোরালো ভাবে এ্যালিক্সের হাতটা ধরে বললে, তুমি উঠবে কি না বলো, নাকি আমি তোমায় তুলে নিয়ে যাব।

এ্যালিক্স উঠে দাঁড়ালো। দৌড়ে সরে গেল। দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ালো। দরজাটা ভেজানো। পালাবার উপায় নেই। তবে কি তাকে মরতে হবে।

—দেখ এ্যালিক্স।

—শোনো জেরল্ড। আমার কিছু কথা তোমায় বলার আছে।

যা হোক কিছু বলে সময় তো কিছুটা কাটাতে হবে।

—কি বলবে?

—আমি তোমায় একটা স্বীকারোক্তি দেব।

—স্বীকারোক্তি। কিসের স্বীকারোক্তি? কিসের প্রয়োজন?

—প্রয়োজন আছে। অবশ্য কথাটা আমার তোমাকে আগেই বলা উচিত ছিল।

—জানি, তোমার পুরাতন প্রেমের কথা মনে হয়।

—না।

—তাহলে? জেরল্ড একটু অবাক হল।

—বলতে পারো অপরাধ। গুরুতর অপরাধ। পাপের কথা। হ্যাঁ অপরাধ বলাই উচিত।

অপরাধ শব্দটা শোনা মাত্র এ্যালিক্স দেখলো জেরল্ডের মুখটা যেন হঠাৎ কেমন বদলে গেল। বুঝলো আঘাতটা ঠিক জায়গায় পড়েছে। জেরল্ড থেমেছে। ও যেন শুনতে রাজি কি সে বলতে চায়।

এ্যালিক্স ধীরে ধীরে মনে জোর পেল। বুঝলো পরিস্থিতি অনেকটা দখলে এসেছে।

—তুমি বসো জেরল্ড।

আড়চোখে ঘড়িটা দেখলো। এখনো নটা বাজতে দেরি আছে। গল্পটা তাকে চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এমন ভাবে চালাতে হবে যাতে জেরল্ড উৎসাহ বোধ করে। শুরু করলো এ্যালিক্স।

—আমি পনেরো বছর যাবৎ স্টেনো টাইপিস্টের কাজ করেছি এটা তুমি জানো, যদিও সবটা সত্যি নয়। মাঝখানে দুবার কাজ ছেড়েছি। আমার বয়স যখন বাইশ তখন প্রথমবার, সে সময় আমি একজন পুরুষের সংস্পর্শে আসি, যদিও সে ছিল বয়সে আমার চেয়ে বড় তবু তার অনেক সম্পত্তি ছিল। সে আমার প্রেমে পড়ে। বিয়ে করার অনুরোধ জানায়। আমি রাজি হই। রাজি হয়েছিলাম একটা শর্তে, তাকে দিয়ে আমার নামে একটা জীবন বীমা করিয়ে নিয়ে। সে দেখল জেরল্ডের চোখজোড়া জ্বলজ্বল করছে। যুদ্ধের সময় কিছুদিনের জন্য একটা হাসপাতালের ডিসপেনসারিতে কাজ করেছিলাম। এই সময় একটা বিরল ওষুধ আমার হাতে আসে। ওষুধটা মারাত্মক বিষ। আড়চোখে কথাগুলো বলতে বলতে লক্ষ্য করলো তার স্বামীর চোখ দুটো উৎসাহে চকচক করছে। খুনের গল্প খুনীকে উৎসাহিত করে

জানি। এখানে তার ব্যতিক্রম হল না। আড়চোখে ঘড়িটা দেখলো—নটা বাজতে এখনও কিছু সময় বাকি।

—বিষ মানে অত্যন্ত মারাত্মক। দেখতে সাদা গুড়ের মত একটু প্রয়োগে মৃত্যু অনিবার্য। তোমার কি জানা আছে এই বিষের কথা?

জেরল্ড বললে—না। আমার এই বিষয়ে কোন জ্ঞান নেই।

—বিষটার নাম হল হাইয়োসিন। চরিত্রগতভাবে মারাত্মক। কাউকে পানীয়ের মধ্যে মিশিয়ে দিলে সে কিছু বুঝতে পারবে না। মরবে ধীরে ধীরে। অথচ বাইরে ওই বিষের কোন চিহ্ন থাকবে না। যে কোন ডাক্তার মৃতদেহ দেখে হৃদরোগে আক্রান্তে মৃত্যু বলে সার্টিফিকেট দিয়ে দেবেন। ওই বিষ আমার কাছে কিছুটা চুরি করে রাখা ছিল।

এ্যালিক্স থামলো।

জেরল্ড থামা পছন্দ করলো না।

—কি হল তারপর।

—আজ এই পর্যন্ত থাক।

—না না তোমাকে বলতে হবে। আমি শুনতে চাই। এ্যালিক্স হাসলো। বললো—আমরা প্রায় মাসখানেক বিবাহিত জীবনযাপন করেছিলাম। আমার বৃদ্ধস্বামী আমার সেবায় সন্তুষ্ট ছিলেন। প্রত্যেকেই জানতো আমি একজন কর্তব্য পরায়না স্ত্রী। একদিন সন্ধ্যেবেলা এমনি এক কফির কাপে অল্প পরিমাণ সেই বিষ আমি ওকে মিশিয়ে দিলাম।

এ্যালিক্স থামলো। খুব স্বাভাবিক ভাবে ছুঁচে সুতো পরাতে পরাতে দেখলো স্বামীকে। কি অসাধারণ অভিনয় করতে হচ্ছে এ্যালিক্সকে। এই মুহূর্তে সে হল পৃথিবীর সবচেয়ে বড় অভিনেত্রী।

সব কিছু ঠিকঠাক শান্তিপূর্ণ ছিল। আমি বসে বসে দেখছিলাম। একসময় মনে হল তার বাতাসের ঘাটতি হয়েছে। উঠে গিয়ে জানলা খুলে দিলাম।

আমার সামনে যে লোকটা এতক্ষণ বসে ছিল, সে দেখলাম নিস্তেজ হয়ে গেল। মৃত্যু কত শান্তির।

এ্যালিক্স ঘড়িটা দেখলো। পৌনে নটা! আর অল্পক্ষণ তাকে কাটাতে হবে। ঠিক নটায় চলে আসবে।

—জীবনবীমা কত পাউণ্ডের ছিল?

—তা প্রায় দু'হাজার পাউণ্ড। ও নিয়ে আমি ফাটকা খেলি এবং যথারীতি সব নষ্ট হয়। ফলে বাধ্য হয়ে আমার চাকরিতে ফিরে যাই। অথচ আমি কখনই চাকরি করতে চাইনি। এরপর আর একজন।

অফিসে তখন আমি কুমারী। কারো পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না আমার প্রথম বিয়ের কথা। দ্বিতীয়জন যাকে বিয়ে করি। সে দেখতে ভাল। অর্থও ছিল। কাউকে না জানিয়ে সাসেক্স'এ গিয়ে তাকে বিয়ে করলাম। সে জীবনবীমা করতে চাইনি, তবে উইল করেছিল আমার স্বপক্ষে। পুরাতন স্বামীর মত সেও চাইতো আমি তার সেবা করি। আমি তাই করতাম।

—বিশ্বাস করো আমি খুব ভাল কফি তৈরি করি। আমার স্বামী একসন্ধ্যায় হঠাৎ কফি খেতে খেতে মারা গেলেন। স্বামী অসুস্থ হওয়া মাত্র আমি সবাইকে খবর দিলাম। গ্রাম শুদ্ধ লোকজন ছুটে এলো। ডাক্তার এলো। দেখেশুনে বললে—হার্ট ফেলিওর। আবার আমি আগের চাকরিতে ফিরে গেলাম। এবার আমি পেয়েছিলাম প্রায় চার হাজার পাউণ্ড। আর ফাটকা খেলিনি। ব্যবসায় লাগিয়েছি। তারপর তুমি এলে—

এবার এ্যালিক্স বাধা পেল। জেরল্ড তাকে বাধা দিল।

এ্যালিক্সের দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলো।

—কি দেখছ, আসলে আমরা কেউ কাউকে চিনি না।

জেরল্ড উত্তেজিত হয়ে বললে—এখন আমি বুঝতে পাচ্ছি, কফিটা এত তেতো লেগেছিল কেন। শয়তান মেয়েছেলে তুমি আমায় বিষ দিয়েছ। আমি তোকে শেষ করবো?

এই বলে সে বাঘের মত লাফ দিল। এ্যালিক্স ভয়ে ফায়ার প্লেসের দিকে সরে গেল। প্রচণ্ড ভয় পেয়েছে সে। মুহূর্তের মধ্যে জেরল্ড আবার আক্রমণ করতে পারে। তাকিয়ে দেখলো সে কি করতে পারে।

—হ্যাঁ তোমাকে বিষ দিয়েছি। বিষক্রিয়া শুরু হয়েছে। চেয়ার থেকে নড়ার ক্ষমতা হারিয়েছো—নড়াচড়ার ক্ষমতা এখন তোমার নেই।

ঘড়ির কাঁটায় নটা। কিসের শব্দ। পদধ্বনি। রাস্তা দিয়ে মনে হয় কেউ বা কারা এদিকে আসছে। গেট খোলার শব্দ হল। তবে কি ডিক। এ্যালিক্স আনন্দে দৌড়ে গেল বারান্দায়। অনুমান সঠিক। সে ডিক উইণ্ডফোর্ডের বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। তারপর জ্ঞান হারাবার মত অবস্থা।

—কি হল এ্যালিক্স। কি হয়েছে তোমার? ডিক চেঁচিয়ে উঠলো। তারপর সঙ্গের সঙ্গীকে বললে—একবার ভিতরে গিয়ে দেখতো কি ব্যাপার।

সঙ্গীটি পুলিশের পোশাক পরা সুদীর্ঘ চেহারার পুরুষ। এতক্ষণে এ্যালিক্সকে কোলে নিয়ে ডিক একটা সোফার উপর শুইয়ে দিয়েছে। হাত বুলিয়ে বলছে—কি হয়েছে সোনামণি তোমার, জেরল্ড তোমায় কি করেছে? বলো কি করেছে?

এমন সময় পুলিশের পোশাক পরা লোকটি ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে বললে—ঘরের ভিতর তো কিছু পেলাম না স্যার। কেবল ভিতরে দেখলাম একটা

লোক চেয়ারে বসে আছে। দেখে মনে হল ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে। তবে আমার অনুমান লোকটি মারা গেছে।

—সেকি। বেঁচে নেই।

—মনে হয় না।

এ্যালিস্ক শুনতে পেল। তারপর অস্ফুষ্ট স্বরে বললে—জেরল্ড মারা গিয়েছে...সে মৃত...এই খবরটা দেবার জন্যই তোমাকে ডেকে পাঠিয়ে ছিলাম ডিক। তারপর সে জ্ঞান হারালো।

হু উইল মিস আর্থার

এডিলেসি

আমার পাশেই শুয়েছিল ভেলমা। ওর টানটান শরীরে যৌবনের উদ্ধত গ্রন্থিগুলির বাঁধনহারা উন্মাদনা আমাকে অস্থির করে তুললেও, আমি কিন্তু আমার চিন্তা থেকে সরে এলাম। নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে ওর স্তনযুগলের নাচন দেখতে দেখতে একসময় বিহ্বল হয়ে পড়লাম। মনে হল খুনের ব্যাপারটা কি খুব সহজ হবে? সহজ না হলেও সহজ ভাবে করতে হবে।

এই মুহূর্তে হোটেলের অন্য ঘরগুলোর মধ্যে যারা আছে, তারা সকলেই কিছু না কিছু ব্যক্তিগত কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছে। ওদের মধ্যে এমন কি কেউ আছে, সে তার মত প্রেমিকার দিকে তাকিয়ে, তার সর্বনাশ যৌবনের মাদকতার নেশায় ডুব দিয়ে মনে মনে একটা খুনের কথা ভাবছে। অথবা বলা ভাল খুনের পরিকল্পনা ভাঁজছে।

ঠিক কি কারণে আমার ভেলমা নামের মেয়েটিকে ভাল লাগে, তা আমি বলতে পারবো না, তবে ওর আকর্ষণ অত্যন্ত দুর্বার, আমি সেই আকর্ষণকে অস্বীকার করতে পারি না। আর এটাও ঠিক, এর আগে আমি এই ভাল লাগার কারণগুলো নিয়ে কখনই মাথা ঘামায়নি। কি দরকার এসব নিয়ে ভাবনার। ভেলমার নরম নরম শরীরটা যে আমার একান্ত প্রিয়। একান্ত আমি বলবো না, কারণ ওর চাইতে অনেক বেশি, ফর্সা, নরম তুলতুলে মেয়ে আমার জীবনে এসেছে। অথচ একথা হলপ করে বলতে পারি এদের কারো জন্য আমি মনের মধ্যে এত দুর্বার আকর্ষণ কখনও বোধ করিনি, যা ভেলমার বিষয়ে বোধ হচ্ছে। অথচ মেয়েটা এমন কিছু আহামরি সুন্দরী নয়। বরং একেবারে সাদামাটা চেহারা। তবে ওর মধ্যে একটা আশ্চর্য ধরনের ছেলেমানুষি আছে যা আমাকে সম্ভবত মুগ্ধ করেছে। তাছাড়া কথাবার্তা খুব সংক্ষিপ্ত তবে কথার মধ্যে অদ্ভুত মাধুর্য আছে।

এই মুহূর্তে ওকে আমার নিষ্পাপ একটা দেবকন্যা বলে মনে হল। মনে হল যেন একটা ধবধবে নিটল সাদা পরী আমার পাশে শুয়ে আছে। এই নিষ্পাপ ভাব অথচ তার মধ্যে কিছু একটা করার বুদ্ধিদীপ্ত একজোড়া চোখ আমাকে মাঝে মাঝে ভীষণ ভাবিয়ে তোলে। এর আগে আমার দুজন স্ত্রী ছিল। তারা সুন্দরী অন্তত ভেলমার চাইতে, কিন্তু তারা ছিল যেমন বিলাসী, তেমনি বুদ্ধিতে ভীষণ বোকা

যাকে বলে একেবারে পাক্কা মেয়েছেলে। আমি যে মেয়েদুটোকে আমার জীবন থেকে ছেঁটে ফেলেছি এই খবরটা ভেলমা সঠিক ভাবে জানে না। অন্তত আমি তাকে কিছু বলিনি। আর যদি সে অন্য কারো কাছ থেকে শুনে থাকে, তাহলে সে কথা সে আমার কাছে দিব্যি চেপে গেছে। ওই যে বললাম বুদ্ধিমতী—এখানেই অন্যদের সঙ্গে তার মস্ত ফারাক।

আমি জানি আমি কি করতে চলেছি। তবু মনের মধ্যে এটাকে একটা অবাস্তব ধারণা বলেই মনে হচ্ছিল। আসলে আমি একজন মধ্যবয়সী কঠোর পরিহাস প্রিয় লোক। আমি রসিকতা কম বুঝি যতটা বাস্তব নিয়ে ভাবি। আমার একটা ছোটখাটো বিজ্ঞাপনের এজেন্সি আছে। অবস্থা মোটামুটি স্বচ্ছল। এই রকম একজন মানুষ হয়ে আমি ভেলমাকে কি করে বলবো আমার পরিকল্পনার কথা। ওতো আমার কথাকে প্রথমত বিশ্বাস করতে চাইবে না। ভাববে আমি ওর সঙ্গে কিছুটা রঙ্গ করার জন্য বলছি। অথচ রঙ্গ করার লোক আমি মোটেই নই। বলতে আমাকে ওকে হবেই, কারণ খুনটা করার জন্য ওকে দরকার, ওর সাহায্য ও অনুমতির প্রয়োজন কেননা যেহেতু সে হল আর্থারের স্ত্রী। আমাদের খুন করতে হবে সেই আর্থারকে। ওকে খুন না করলে ওকে আমাদের দুজনের মধ্যে থেকে সরানো যাবে না। কথাটা ভেলমা ঠিক কিভাবে নেবে সেটাই ভাবছিলাম। শেষে কপাল ঠুকে বলেই ফেললাম কথাগুলো।

আমার মুখে বেরুনো কথাগুলো ফাঁকা হোটেল ঘরটার চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে গম গম করে উঠলো। আসলে আমি সত্যি মনে প্রাণে চাই আর্থারকে খুন করতে। মেরুদণ্ডহীন ওই লোকটা ভেলমার স্বামী হয়ে বেঁচে থাকুক, এটা আমি চাই না—আর এই না চাওয়াটাই হল খুন করার একটা মস্ত কারণ।

আমি কথাগুলো বলার সময় আমার দুই হাতের উপর ভর দিয়ে ভেলমার দিকে ঝুঁকে পড়েছিলাম। ভেলমার শরীরটা ছিল আমার দুই হাতের মধ্যে। আমার কথা এবং মুখ চোখের চেহারা লক্ষ্য করে ভেলমা একটু নড়াচড়া করে উঠলো। ওর ছিপছিপে শরীরটা অদ্ভুত কায়দায় নাচলো। আয়ত চোখের দৃষ্টি আমার দিকে মেলে ধরে একটু উঠে বসার চেষ্টা করলো। তারপর ঠোঁটের কোলে ঈষৎ হাসির রেশটা মুছে ফেলে কিছুটা চোরা গাম্ভির্যের ভঙ্গিমায় কোন কিছু না বোঝার ভান করে বললে—তোমার মতলবটা ঠিক কি বলতো ফ্র্যাঙ্ক? তুমি কি পাগল হয়ে গেছ? আরে আর্থার একসপ্তাহের জন্য সমুদ্র ভ্রমণে নাসাউতে নিয়ে যাচ্ছে। আরে বাবা, আমি তো আর ওর সঙ্গে নাসাউতে চিরকালের জন্য চলে যাচ্ছি না, যে তোমাকে এত উতলা হতে হবে। তবে হ্যাঁ একসপ্তাহ তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে না এটা ঠিক, তা বলে এই নয় যে এই সপ্তাহের সমুদ্র ভ্রমণে আমি ওর প্রেমে বিগলিত হয়ে তোমাকে ভুলে যাব। তারপর ভেলমা দুই হাত দিয়ে আমার ঘাড়টা

ধরে আমার মুখটাকে তার কাছে টানলো। বললে—তুমি ভীষণ দুষ্টু। এত অবুঝ কেন, তোমাকে তো বলেছি ওকে আমি একদম পছন্দ করি না। পৃথিবীর কোন কিছুর বিনিময়ে তোমাকে কেউ আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবে না।

আমি ওর পাতলা ঠোঁটে চুমু দিয়ে বললাম, প্রিয়ে আমি যা বললাম সেটা কিন্তু কেবল কথার কথা নয়, একেবারে আমার মনের কথা। আমি প্রতিটা কথা অনেক ভেবে চিন্তে তোমাকে বলেছি। তারপর ওকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বললাম, বিশ্বাস করো সুন্দরী, এইভাবে লুকিয়ে চুরিয়ে খিড়কির দরজা দিয়ে তোমার সঙ্গে প্রেম করতে করতে আমি একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছি। আমি এখন স্রেফ আমার মত করে তোমাকে চাই। আর্থারের মত একটা গোঁয়ার ষাঁড় চট করে তোমাকে ছাড়বে না।

—তা ঠিক!

—তুমি বলো, ওকি তোমায় স্বেচ্ছায় ডিভোর্স দেবে?

আমার বিশ্বাস হয় না। আর তুমি যদি ওকে এমনি ছেড়ে চলে আসো, তাহলেও সে তোমাকে ছাড়বে না, ঠিক পিছু পিছু চলে আসবে। সুতরাং—।

—শোন ফ্র্যাঙ্ক, রাগ করো না লক্ষ্মীটি। আমি তো তোমার কাছে সারাক্ষণ থাকছি, কেবল রাতটুকু আমাকে তুমি পাওনা। তাছাড়া আর্থারকে আমি খুব ভাল চিনি। এখনও সে আমাকে তার একটা বিশেষ সম্পদ বলে মনে করে। আমি যদি ওকে ছেড়ে চলে আসি, তাহলে ঠিক বাচ্চা ছেলের মত হামাগুড়ি দিয়ে নাকে কান্না কেঁদে ঠিক আমার বুকের উপর লাফিয়ে উঠে পড়বে। এতে আমার জীবনটা আরও অসহ্য হয়ে উঠবে, আখেরে তোমারও ইচ্ছেটা পূরণ হবে না—মাঝখান থেকে আমরা দুজনে কেউ সুখী হতে পারবো না।

কথাগুলো ভেলমা বেশ আবেগ দিয়ে আমার শরীরের দিকে ঘন হয়ে সরে এসে বললে। আমি ওর নরম গাল দুটো ধরে বললাম—শোন রানী এই জন্য আমাদের একটু কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি হতে হবে। আমরা যে পরস্পরকে ভালবাসি একথা তো সত্যি। অথচ আর্থার নিজের থেকে জায়গা ছাড়বে না। এই ক্ষেত্রে তাকে জোর করে হটানো ছাড়া আমাদের অন্য কোন রাস্তা খোলা নেই।

—আমি জানি, সব বুঝেছি। সময় মত একটা উপায় ঠিক করা যাবে।

এবার আমার ভেলমার কথায় ভীষণ রাগ হল। আসলে ও যেন আমার কথাকে গুরুত্ব দিতে চাইছে না। তাই ওকে কিছুটা ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে বললাম—নিকুচি করেছে তোমার সময়ের। গত পাঁচ মাস ধরে আমি এই একটা ভাবনাই ভাবছি। জানি সময়ের ব্যবধানে কিছুই পালটাবে না। তবু যা করার আমাদের তাড়াতাড়ি করতে হবে, এখুনি করতে হবে, আমার আর সময় নষ্ট করতে ভাল লাগছে না।

ভেলমা বললে—বুঝেছি। ও আমাকে সমুদ্রে বেড়াতে নিয়ে যাবে বলে তোমার রাগ হচ্ছে, কি তাইতো? যদি তা না হবে, তাহলে কই এতদিন তো তুমি খুনের কথা বলোনি, আজ কেন বলছো? আর বলছো বেশ ঠাণ্ডা মেজাজে।

আমি ভেলমার দিকে তাকিয়ে বললাম—খুকুমণি, আমাকে যত ঠাণ্ডা বলে তোমার মনে হচ্ছে আদপে কিন্তু তা নয়। তুমি তো জানো রানী, আমি খুনী বা দুর্ধর্ষ প্রকৃতির লোক নই। কিন্তু একথা ঠিক প্রতিদিন তুমি যখন আমাকে ছেড়ে চলে যাও তখনই আমার মাথায় রক্ত চড়ে যায়। আমি হাত বাড়ালাম দেখি আর্থার তোমায় আদর করছে। উফ্ অসহ্য। তোমার ওই সুন্দর পাতলা ঠোঁট দুটোতে ওই কুৎসিত লোকটা চুমু দিচ্ছে, তোমার বুকে মুখ ঘষছে...অসম্ভব আমি তখন স্থির থাকতে পারি না। ভাবি রাস্তায় কোনদিন একলা পেলে ওকে আমি একেবারে শেষ করে দেব।

—তার মানে তুমি চাওনা আমি ওর সঙ্গে সমুদ্র ভ্রমণে যাই।

—উহু, ঠিক তার উল্টো। আমি চাই তুমি ওর সঙ্গে সমুদ্র ভ্রমণে যাও, আর এই সমুদ্র ভ্রমণেই হবে ওকে ঝেড়ে ফেলার নিখুঁত পরিকল্পনা।

—ঠিক বুঝলাম না।

—বুঝিয়ে দিচ্ছি তোমাকে সোনা। তারপর বাচ্চামেয়েকে যেমন করে মন ভোলাবার জন্য আদর করা হয়, সেইভাবে আদর করে বললাম, বলতো আমার সোনা, এই সমুদ্র ভ্রমণের ব্যাপারটা তোমাদের উঠলো কি করে। আমি জানি চট করে এতগুলো পাউণ্ড খরচ করার লোক আর্থার নয়।

ভেলমা হেসে বললে—আমি ওর কাছে ডিভোর্সের কথা বলাতে, খোরপোষের অর্থ সমেত ডিভোর্সে সে রাজি হয়নি। বরং আমাকে তখন সমুদ্র ভ্রমণের কথা বললে। আর এটাই হচ্ছে আমাদের দীর্ঘ দুবছরের বিবাহিত জীবনের প্রথম একটি উপলক্ষ্য যেখানে সে স্বেচ্ছায় পাউণ্ড খরচ করতে রাজি হয়েছে। তারপর ভেলমা আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে আমার নাকটা আলতো টিপে বললে—তোমার কোন ভয় নেই ফ্র্যাঙ্কি, সমুদ্র ভ্রমণ আমার মনের কোন পরিবর্তন ঘটাতে পারবে না। আর তুমি যদি আরও সুখী হতে চাও, তাহলে বলতো আমি যাব না। তবু দয়া করে ওই খুনটুনের প্রসঙ্গটা থামাও।

আমি উত্তেজিত হয়ে বললাম—না, না ভেলমা তুমি সমুদ্র ভ্রমণে যাও। নইলে হয়ত কোনদিন আমি রাগে আর্থারকে পিটিয়ে মেরে ফেলে জেলে যাব। ভেলমা, লক্ষ্মী সোনা আমার কথাটা শোনো, আমাকে বিশ্বাস করো, আমি ঠিক কার্যোদ্ধার করতে পারবো। সুযোগটা আমি কিছুতে হাতছাড়া করতে চাইছি না।

—ও ফ্র্যাঙ্কি! আমি তোমার কথাকে বিশ্বাস করছি। কিন্তু ভেবে পাচ্ছি না

আমাদের সমুদ্র ভ্রমণে কেমন করে আর্থারকে খুন করার একটা নিরাপদ রাস্তা বলে তোমার মনে হচ্ছে।

এবার আমি ভেলমাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে আদর করতে করতে বললাম—বলি সুন্দরী, তোমার কি মনে পড়ে কিভাবে আমাদের আলাপ হয়েছিল।

—হ্যাঁ আছে। সে কথা কি ভোলার। রাস্তায় আমি তোমাকে পিছন থেকে দেখে আর্থার বলে ভুল করেছিলাম। সরাসরি পিছন থেকে তোমার হাত ধরে সামনে ঘুরে দাঁড়িয়ে একেবারে বোকা বনে গিয়েছিলাম।

আমি হেসে বললাম, তোমার এই ভুল করার পিছনে মস্ত কারণ ছিল আমার বয়স, ওজন এবং উচ্চতা তোমার স্বামীর মত। আমাদের দুজনের মধ্যে এমন মিল আছে যা তুমি বুঝতে পারোনি। কাজেই বুঝতে পারছো।

ভেলমা বললো—মিল আছে তো বলো।

বললাম—বলো। ওই মিলটাকে কাজে লাগাতে হবে। আর ওকে বললাম তুমি আমার কথাগুলো মন দিয়ে শোনো সমুদ্র ভ্রমণের জাহাজটা এখানকার ডকে সাধারণতঃ শনিবার সকালে নোঙর করে। যাত্রীদের নামিয়ে দেয়। আবার নতুন যাত্রী নিয়ে এক সপ্তাহের জন্য বিকেলের দিকে ভেসে যায়। তোমাদের জাহাজ সন্ধ্যে ছটায় ছাড়ার সময়। অর্থাৎ তখন অন্ধকার হয়ে যাবে। আমি চাই তুমি কিছুটা ইচ্ছে করে সময় নেবে জাহাজে উঠতে। কিছুতেই জাহাজে তুমি সাড়ে পাঁচটার আগে উঠবে না। তারপর তোমরা তোমাদের কেবিনে যাবে। ওই সময় স্টুয়ার্ড তোমাদের দুজনকে একঝলক দেখে নেবে। স্টুয়ার্ডের অন্যান্য কেবিনগুলো দেখাশুনো করা ছাড়াও আরও কিছু কাজ থাকে। কাজেই কারো দিকে তার পক্ষে গভীরভাবে মনযোগ দেওয়া সম্ভব নয়। এরপর আমি অতিথি হিসাবে জাহাজে উঠবো। কেউ বাধা দেবে না। অনেকে জাহাজে ওঠে তার সঙ্গীদের বিদায় জানাতে। এই সময় অতিথিদের পরিচয় কেউ জানতে চায় না। তারপর জাহাজ ছাড়ার ঠিক আগে অতিথিরা সব নেমে গেলে আমি ডেকে দাঁড়িয়ে থাকবো। স্টুয়ার্ড ব্যস্ত থাকবে। ভাববে হয়ত আমি একজন যাত্রী। অন্য যাত্রীরা এইসময় জিনিসপত্র গোছগাছ করবে। খাবারের ব্যবস্থা করবে। আর এই সময় কিন্তু অন্ধকার হবে।

ভেলমা বললে—আমি এখনও ঠিক বুঝতে পারছি না তুমি ঠিক কি বলতে চাইছো।

হেসে বললাম—তুমি একবারে বাচ্চা মেয়ে। শোনো সুন্দরী, এইবার আমি সেই কথায় আসছি। এই সময় তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। আর্থারকে নিয়ে তোমাকে জাহাজের পিছনে যেতে হবে। উদ্দেশ্য হবে জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে দূরবর্তী তীরের আলোকমালা দেখা। এমন ভাব করবে যেন তোমার ভীষণ মাথা ধরেছে। তুমি আর্থারকে সঙ্গে নিয়ে ডেকে আসবে। এরপর আমার কাজ। আমি

পেছন থেকে গিয়ে ওর ঘাড়ে ধাক্কা মেরে রেলিং টপকে জলে ফেলে দেব। ততক্ষণে জাহাজ সমুদ্রের বেশ কিছুটা গভীরে এসে পড়বে। সুতরাং কেউ তাকে খুঁজে পাবে না। তারপর আমি মিস্টার আর্থার হারবার হয়ে যাব। তোমার কোমর জড়িয়ে কেবিনে ফিরে আসবো। ডিনারের জন্য পোশাক বদল করবো। কি এবার বুঝলে আমার মতলবটা—ব্যাপারটা কিন্তু ভীষণ সোজা?

চারদিকে নিস্তব্ধতা নেমে এলো। ভেলমা আমার দিকে ছেলেমানুষের মত তাকিয়ে বড় বড় চোখ করে বললে—তোমার মালপত্তরের কি হবে?

—কেন আমি আর্থারের জামাকাপড় পড়বো। আমাদের তো এক মাপ। এরপর শনিবার যখন জাহাজটা নিউইয়র্কে নোঙর করবে তখন আমরা মিস্টার ও মিসেস হারবার হয়ে তীরে নেমে যাব। এখানে তো পাসপোর্টের ঝামেলা নেই। ইমিগ্রেশনের ব্যাপারটাও নেহাত মামুলী। তারপর একটু থেমে বললাম—দেখ সুন্দরী এর আগে আমি বহুবার সমুদ্র ভ্রমণ করেছি। সুতরাং নিয়মকানুন সবই আমার জানা আছে।

—জাহাজ ছেড়ে তীরে নামার পর কী হবে ফ্র্যাঙ্ক?

—কি আবার হবে? কিছুই না। তুমি সোজা আমার বাসায় উঠবে। সেখানে তুমি আমার স্ত্রী হিসাবে থাকবে। যদি চাকরি করতে চাও করবে। না হয় চাকরি ছেড়ে দেবে—সেটা তোমার ব্যাপার। তারপর একসময় আমরা আইন মাফিক বিয়ে করে নেব। আসল কথা হচ্ছে এরপর আর আমাদের লুকোচুরি খেলতে হবে না। আর তাছাড়া তুমি তো জানো আর্থার হারবারের কোন আত্মীয়স্বজন নেই—কোন পারিবারিক সম্পর্কের কেউ নেই যে তার খোঁজ করবে। সুতরাং তার জন্য দুঃখ করার কেউ থাকবে না। তারপর তুমি আর আমি।

ভেলমা মনে হয় আমার কথায় সামান্য কেঁপে উঠলো। বয়সটা কম বলেই একটু ভয় পেয়েছিল। তাই সটাং আমার বুকের উপর শুয়ে থাকলো।

বললাম—কি হল।

—আমার ভীষণ ভয় করছে। সত্যি সত্যিই কাজটা যে ভাবে বললে এতই সোজা হবে।

আমি শুয়ে আদর করতে করতে বললাম—কোন চিন্তা নেই। সোজা মানে ভীষণ সোজা হবে? তবে চিন্তা একটা মাত্র আছে, সেটা হল মৃতদেহটা যদি ভেসে ওঠে। তাতে কোন চিন্তা নেই। পরিস্থিতি তখনও আমাদের সপক্ষে থাকবে। তবে হ্যাঁ আর একটা বিপদ আছে, ধরো যখন ওকে রেলিং টপকে ফেলে দেব তখন যদি কেউ দেখতে পায়। তবে এসব সমুদ্র যাত্রায় প্রথম দিকে যাত্রীরা কেউ ডেকে ঘোরাফেরা করে না। তারা মালপত্র গোছায়, পোশাক বদলায়—কেবিনেই বিশ্রাম করে।

আমি এমনভাবে ওকে বলছিলাম যেন মনে হবে শুনে এর আগে আমি বহু মানুষজনকে খুন করেছি। তবে ভেলমাকে আমি আসল বিপদের কথাটা এখনও বলিনি যে আমি সত্যি যে ভাবে বললাম, এত সহজ ভাবে তাকে শেষ পর্যন্ত খুন করতে পারবো কিনা। তবে আমার ধারণা আমি আর্থারকে যতটা ঘৃণা করি আর ভেলমাকে যতটা ভালবাসি তাতে মনে হয়, আমি ওকে ঠিক খুন করতে পারবো।

হঠাৎ ভেলমা আমাকে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললে—ফ্র্যাঙ্ক। আমি কি বললাম তুমি শুনতে পেয়েছ।

আমি সচকিত হয়ে বললাম—আমি সত্যি দুঃখিত, আমি ঠিক শুনতে পাইনি তোমার কথা তুমি কি বলছিলে?

ভেলমা বললে—আমি বলছিলাম, স্টুয়ার্ড কি বুঝতে পারবে না তুমি আর্থার নও।

হেসে বললাম—স্টুয়ার্ডের কাছে যাত্রীরা সকলে একেকজন কালো দানার মত। এত লোককে চোখে দেখে মনে রাখা তার পক্ষে সম্ভব নয়। আর সবচেয়ে বড় কথা তুমি যদি আমাদের চেহারার মিল দেখে ভুল করতে পারো, তাহলে স্টুয়ার্ডের পক্ষে চেনা সম্ভব হবে কি করে। আসলে সব কাজটা যদি আমি ঠাণ্ডা মাথায় ঠিকঠাক করতে পারি তাহলে স্টুয়ার্ডের পক্ষে কেন পৃথিবীর কারো পক্ষে কিছু বোঝা সম্ভব হবে না।

ভেলমা বললে—তবু আমার ভীষণ ভয় করছে।

আমি ওকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বললাম—ওগো মিষ্টিপাখী, আমারও ভয় করছে। ভয় করলেও আমাকে কাজটা করতে হবে, তারপর তো আমরা দুজনে সারাজীবন একসঙ্গে থাকতে পারবো। বিশ্বাস করো ভেলমা, এটাই একমাত্র সহজ পথ। আমি আর সহ্য করতে পারছি না। রাস্তার মাঝখানে উত্তেজনায় আর্থারকে পিটিয়ে মেরে ফেলার চাইতে এটাই হল অনেক সহজ কাজ। কেবল তোমাকে একটু সাহায্য করতে হবে। ওকে ভুলিয়ে ভালিয়ে জাহাজের পিছনের দিকে নিয়ে যেতে হবে। তারপর বাকি কাজটা আমার।

ঘটনাটা আমাদের স্বপক্ষে এলো। ঠিক যে ভাবে বলেছিলাম সেইভাবেই কাজগুলো করে গেলাম। জাহাজ তখন খাড়ি ছেড়ে এগিয়ে চলেছে সমুদ্রের দিকে। ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়া শুরু হয়েছে। এই অবস্থায় জাহাজটা দুলতে দুলতে এগিয়ে যাচ্ছে। ডেক এক কথায় প্রায় জনশূন্য। আমার নির্দেশ মত ভেলমা ঠিক জায়গায় আর্থারকে নিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। অপেক্ষা করছিল। আমি গুটিসুটি মেরে পেছন থেকে আঘাত করলাম আর্থারকে। আমার আঘাতে ওর দেহটা ঝুঁকে পড়লো জলে। রেলিংএ ওর শরীরটা ঝুলে থাকা অবস্থায় আমি ওর কোটটা খুলে নিলাম।

ওয়ালেটটা বার করে নিলাম। তারপর দেহটাকে ঝুপ করে জলের মধ্যে ফেলে দিলাম। না কেউ শব্দ শুনতে পায়নি।? তারপর নিজের কোটটা খুলে জলে ফেলে দিয়ে আমি আর্থারের কোটটা গায়ে চাপিয়ে নিলাম। তারপর ভেলমার হাতটা ধরলাম, ভয়ে বেচারির হাতটা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। ফিসফিসিয়ে ওকে বললাম—কাজ শেষ, এবার নির্বিঘ্নে ফিরে চলো সুন্দরী। ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত সহজে মিটে গেছে। ভেলমা উত্তর দিল না। আমি কেবিনে ঢোকার আগে দেখলাম কেউ লক্ষ্য করেছে কি না, কাউকে নজরে পড়লো না। ভেলমা কেবিনে ঢুকে বিছানায় বসে পড়লো। চোখেমুখে শূন্য দৃষ্টি। আমি তাকে নাড়ালাম। বললাম—কি ভাবছ খুকুমণি, মন থেকে ওসব ভাবনা ঝেড়ে ফেল। মনে রেখ সে এখন সমুদ্রের অতলে।

ভেলমা বললে—সব বুঝেছি, সব দেখেছি। আমাকে এখন একটু মদ খাওয়াতে পারো?

—নিশ্চয়! একবারই।

আমি ভেলমাকে খানিকটা মদ দিলাম। ভেলমা মদ খাচ্ছিল। আমি সেই সময় আর্থারের কোটের পকেট থেকে চাবিটা বার করে ব্যাগ খোলার জন্য ব্যস্ত হলাম। আমি আর্থারের ব্যাগটা অর্থাৎ আমার ব্যাগটা খুললাম। একটা কাগজে মোড়া প্যাকেট পেলাম। সেটা পেয়ে আমি ভেলমার দিকে ছুঁড়ে দিলাম। ভেলমা বললে, এটা বোধ হয় সেই উপহার যেটা আর্থার আমায় দেবে বলেছিল। তারপর বস্তুটা নিজেদের প্রসাধন ব্যাগে ঢুকিয়ে নিল। বুঝলাম আর্থার ভালভাবেই জেতাতে চেয়েছিল। ওর ব্যাগে ৫৬৩ ডলার। আমার কাছেও যথেষ্ট ডলার ছিল।

ভেলমা আর আমি দুপেগ করে মদ খেলাম। তারপর একটু নাচলাম। এরপরে কেবিনে ফিরে এসে আশ্চর্য জনকভাবে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হলাম।

পরের দিনটা ছিল রৌদ্রজ্জ্বল। আমরা ডেক চেয়ারে বসে আরাম করছিলাম। আমি আর্থারের একজোড়া ওয়াকিং সর্টস পড়েছি। পায়ে ছিল আর্থারের স্পোর্টস সু—সুন্দর ফিট করেছে আমার। সেই রাতে ক্যাপটেনের দেওয়া ডিনারে আর্থারের ট্রাকস্যুট পরে গেলাম। সেটা অবশ্য স্টাইলের দিক দিয়ে খুব নজরদার নয় তবু আমাকে বেশ একজন পুরোনো বিবাহিতের মত লাগছিল।

সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা হল, এতবড় একটা কাণ্ড ঘটালাম অথচ তার জন্য আমাদের মনে কোনরকম দুঃখ হচ্ছিল না। তবে ভেলমার পক্ষে সবসময় আমাকে আর্থার বলে ডাকা সম্ভব হচ্ছিল না। অভ্যাস মত আমাকে সে মাঝে মাঝে ফ্র্যাঙ্ক বলে ডাকছিল। আসলে এই ভুল হওয়া স্বাভাবিক। তাই ওকে বললাম, এককাজ করো ভেলমা তুমি আমার নাম ধরে না ডেকে প্রিয় বলে ডাক, এতে কেউ কিছু মনে করবে না। এরপর আমরা দুজনে হাত ধরাধরি করে নাচলাম। মঙ্গলবার

জাহাজ নাসাউতে নোঙর করলো। আর ঠিক যখন আমরা প্যারাডাইস বিচে নামবার জন্য পা বাড়িয়েছি তখন স্টুয়ার্ড এসে বললে, খাজাঞ্চি অফিসে আমায় একবার যেতে হবে।

একটু খট্‌কা লাগলো। তবু গেলাম।

খাজাঞ্চি আমায় প্রশ্ন করলেন—আপনি আর মিসেস হারবার কি আজই জাহাজ ছেড়ে চলে যাবেন স্যার?

আমি বেশ বিরক্তির সঙ্গে বললাম—বন্দরে জাহাজটাই কি আমাদের হোটেল নয়? তাহলে কোন্ চুলোয় যাব?

মিস্টার হারবার, আপনার নিশ্চয় মনে আছে যে আপনি আমাদের কাছ থেকে শুধু মাত্র আসার টিকিট কিনেছিলেন।

আপনি আমাদের সিটি অফিসে বলেছিলেন যে আপনারা এখান থেকে জাহাজে যাবেন, ফিরবেন প্লেনে।

এবার আমি তাড়াতাড়ি ভুল ধরতে পেরে বললাম, আশা করি আমার সেক্রেটারি আপনাদের সিটি অফিসে গিয়ে আমার মত পরিবর্তনের কথা জানিয়ে এসেছে?

—না স্যার কেউ কোন খবর দেয়নি।

এবার চোখেমুখে বিরক্তির ভাবটা প্রকাশ করে বললাম, মেয়েটা একেবারে যাচ্ছে তাই। এত করে বলে দিলাম, তবু বলেনি? না ওকে দিয়ে দেখছি চলবে না। ফিরে গিয়েই একটা ব্যবস্থা করতে হবে। তারপর ওদের উদ্দেশ্য করে বললাম, যা হোক দ্বীপে বাস করার মতটা আমি পাল্টিয়েছি। আমরা কি আমাদের কেবিনটা বজায় রেখে জাহাজের সঙ্গে ফিরে যেতে পারি?

হেসে লোকটি বললে—খুব ভাল যে আপনি আমাদের সঙ্গে থাকছেন। কিন্তু এই ক্ষেত্রে আপনাকে অতিরিক্ত ৩৩০ ডলার জমা দিতে হবে। অবশ্য ইচ্ছে করলে চেকে দিতে পারেন।

দেঁতো হাসি হেসে বললাম—না, না, নগদই দেব। স্টক মার্কেটে বউয়ের জন্য কম ডলার সঙ্গে থাকাই ভাল। কি বলেন। তারপর ব্যাগ থেকে নগদ গুণে ফাইনের ডলার দিয়ে ব্যাপারটাকে সামলে বেরিয়ে এলাম।

এবার রাগ হল ভেলমার উপর। বললাম—তোমার কি মাথা খারাপ ভেলমা, একবারও আমায় জানাওনি যে তোমরা জাহাজ ছেড়ে দ্বীপে চলে যাবে। ছিঃ ছিঃ—এই বিশ্রি ব্যাপার তাহলে ঘটতো না। জানা থাকলে আমি আগেই ব্যবস্থা করে ফেলতাম।

ভেলমা অবাক হয়ে তাকালো। ওর দুচোখে অপার বিস্ময়! বোঝা গেল ও কিছুই জানে না। বললে—জাহাজ ছেড়ে দেব কেন? আর্থার—মানে তুমিই তো আমাকে

একসপ্তাহের ছুটি নিতে বললে। আমি তো মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি এবার কোটের পকেট হাতড়ে টিকিটগুলো বার করলাম। এগুলো আমার আগেই লক্ষ্য করা উচিত ছিল। দোষটা আমার—ভেলমার নয়। টিকিটগুলো সত্যি শুধুমাত্র আসার জন্য। আমি সেগুলো ভেলমাকে দেখিয়ে বললাম এগুলো আসার টিকিট, ফেরার টিকিট নয়। যাক এখন আর কিছু করার নেই, যা হবার হয়েই গেছে।

তারপর গলা নামিয়ে ওকে বললাম—আচ্ছা বলতো, তোমার কি ঠিক মনে আছে আর্থার এখানে জাহাজ ছেড়ে দেবার কোন কথা বলেছিল কিনা?

—না, না, কেবল এক সপ্তাহের মত ছুটির দরখাস্ত করতে বলেছিল। নিজেও করেছিল। এটা হচ্ছে আমাদের দ্বিতীয় মধুচন্দ্রিমা—এই ভ্রমণ সম্পর্কে সে শুধু এইটুকু রসিকতা করে বলেছিল। তাছাড়া তুমি তো জানো, ও খুব বেশি কথা বলতো না, আর এটা ছিল আমার বিরক্তির মস্ত কারণ। আসলে আমি ডিভোর্সের কথা বলায় সে রাজি না হওয়ার জন্য আমি প্রচণ্ড চেঁচামেচি শুরু করে দিই। তখন সে আমাকে ঠাণ্ডা করার জন্য সমুদ্র ভ্রমণের এই বিস্ময়কর ব্যাপারটা বলে। এরপর মন ভোলাবার জন্য আরও অনেক কিছু বলেছিল। যেমন ধরো বলেছিল—সে বুঝতে পেরেছে আমি জীবনে আনন্দ করার মত কিছু পাইনি। ফূর্তিবাজ মেয়ে আমি। ও এখন থেকে আমাকে আনন্দে রাখবার চেষ্টা করবে। আমি তাকে বলেছিলাম, এসব মিষ্টি কথায় আমার মন ভিজবে না। স্রেফ আসতে রাজি হয়েছিলাম যখন শুনলাম টিকিটগুলো কেনা হয়ে গিয়েছে। তারপর বললে—মরুকগে। চলো আমরা এখন সী বীচে যাই। তবে আমার ধারণা সে চেয়েছিল দ্বীপে কয়েকটি দিন কাটিয়ে ক্রেডিট কার্ড দেখিয়ে প্লেনে ফিরে যেতে। নাও চলো।

আমরা কাঁচে ঢাকা সুন্দর শৌখিন নৌকো করে একটু ঘুরলাম তারপর প্যারাডাইস বীচে গিয়ে অনেকক্ষণ সময় কাটালাম। বিকিনি পরা ভেলমাকে তখন আমার একজন স্বপ্নের রাজকন্যা বলে মনে হচ্ছিল। তার ছিপছিপে শরীরটা ইতিমধ্যে রোদ লেগে তামার মত রঙ নিয়েছিল। আমি নিজেই তার মসৃণ চামড়ায় খানিকটা তেল মালিশ করে দিয়ে বললাম—সাবধান সূর্যের তাপে চামড়া কিন্তু পুড়ে যাবে। এরপর খানিকক্ষণ দুজনে বালিতে গড়াগড়ি খেয়ে বেলা তিনটের সময় একটা নৌকো ভাড়া করে মেইন স্ট্রীটে গেলাম। সেখানে ভেলমা কিছু কেনাকাটা করলো। খড়ের ব্যাগ, টুপি আর কয়েকটা প্রসাধনের জিনিস। বেশ গরম লাগছিল। তাই আমরা জাহাজের শীততাপ নিয়ন্ত্রিত আরামদায়ক পরিবেশে ফিরে এসে আমাদের নৈশভোজ সেরে নিলাম। তারপর জাহাজের হলঘরে বসে দুজনে খানিকটা রাম খেলাম। অনেকে নাচছিল—আমরা দেখতে লাগলাম। তারপর আমরা অন্য পর্যটকদের মত রুটিন মাফিক করনীয় কাজগুলো শেষ করে কেবিনের দরজা বন্ধ করে দিলাম।

পরের দিন প্যারাডাইস বীচে সাঁতার কাটলাম। তারপর পোস্ট অফিসে গেলাম। ভেলমা সেখান থেকে তার অফিসের মেয়েদের জন্য ছবিয়ালা কয়েকটা কার্ড কিনলো। আমি কোন কার্ড পাঠালাম না। কারণ আমি তো এখন অন্তরীপে কোথাও বসে মাছ ধরছি, এটাই সবাই জানে। ব্যাপারটা চিন্তা করে নিজেই হাসলাম। মাছ ধরাই বটে। ভেলমার মত একটা বড় মাছ যে শেষ পর্যন্ত জালে তুলতে পেরেছি এই যথেষ্ট। আর্থারের ভূমিকায় অভিনয়টা ভালই করে চলেছি। জাহাজ ছাড়ার আগে আমরা ফিরে এলাম। দেশী ডুবুরীদের পেনি ছুঁড়ে দিতে লাগলাম। তারা ডুব দিয়ে সেগুলো তুলে আনতে লাগলো।

নিউইয়র্কে ফেরার দুদিনের যাত্রা পথ বেশ শান্তিতেই কাটলো। দারুণ স্ফুর্তি যাকে বলে। সারাদিন ধরে নাচ, গান আর মদ খাওয়া চললো। এই পৃথিবীতে আর যে কোন কাজ আছে সেটা একবারও মনে এলো না। মনে এলো না আমি একটা খুন করেছি সে কথা। প্রচুর ঘুমোলাম। ভেলমা বুকের মধ্যে—আহা এমন ভাবে জীবনের প্রতি মুহূর্ত যদি কেটে যায় তাহলে বেশ হয়।

নিউইয়র্কে নোঙর করার আগের রাতে আমরা কাস্টমসের ফর্মগুলো ভর্তি করলাম। আমরা দুজনেই শুল্ক সীমার নিচে ছিলাম। তবু ভেলমাকে একটু ভীতু লাগছিল। সে বললে, আচ্ছা আগামীকাল সকালে হেঁটে জাহাজ ছেড়ে যাওয়ার আগে আমাদের আর কি কাজ আছে।

আমি বললাম—তেমন কিছু কাজ আর নেই। আজ রাতে ব্যাগগুলো গুছিয়ে দোরগোড়ায় রেখে দেব যাতে সেগুলো সহজেই ডেকে নিয়ে যাওয়া যায়।

শনিবার সকালে ব্যাগগুলো যখন নামানো হবে—ঠিক সেই ফাঁকে আমরা এসে ইমিগ্রেশন লাইনে দাঁড়ালাম। আসলে এটা কিছুই নয়—এখানে শুধু মাত্র জিজ্ঞাসা করা হবে আমরা নাগরিক কিনা? আর সেরকম যদি প্রয়োজন হয় তাহলে আমি আর্থারের ক্রেডিট কার্ডটা দেখাবো আর ভেলমা তুমি দেখাবে তোমার অফিসের আইডেনটিটি কার্ড। ওতেই যথেষ্ট। এরপর আমরা নামবার কার্ড নিয়ে জাহাজ ছেড়ে চলে যাব। শুল্ক বিভাগের লোকেরা জেটিতে অপেক্ষা করবে। আমরা যা যা এনেছি তা তাদের দেখাবো। ব্যস তাহলেই খেল খতম।

ভেলমা বললে—যত সহজ ভাবছো তত সহজ নয়। কিন্তু আর্থার, মানে তুমি আমায় তোমার ব্যাগ থেকে যে সুগন্ধি প্যাকেটটা দিয়েছ তার কি হবে? ওটাতো খোলাই হয়নি। ওর মধ্যে কি আছে তাওতো ছাই জানি না। আমি এটা ঘোষণা পত্রে উল্লেখ করবো।

—না। যদি শুল্ক অফিসারেরা ওটা দেখার জন্য নাছোড়বান্দা হয় আর বিশ্বাস না করে যে ওটা নিউইয়র্ক থেকে কেনা হয়েছিল—তাতেও কোন ক্ষতি নেই। কারণ আমরা তবুও তখন সীমার নিচে থাকবো। আমরা তো আর চোরাপথে কিছু নিয়ে আসিনি।

—তা ঠিক। ভেলমা বললো বটে কথাটা, কিন্তু মুখটা কেমন যেন শুকনো শুকনো লাগলো।

শনিবারের আকাশটা বেশ ঝলমলে ছিল। আমরা সকাল সকাল প্রাতঃভোজন করে ডেকে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করতে থাকলাম জাহাজটা নিউইয়র্ক বন্দরে ঢুকছে। ভেলমা একটু কাট কাট হয়ে থাকলেও ইমিগ্রেসনের ব্যাপারটা ঝটপট মিটে গেল। আমাদের অবতরণ করার কার্ডে স্ট্যাম্প মেরে দেবার পর গাঙপ্ল্যাঙ্ক বেয়ে নামা শুরু করলাম। ভেলমা বললে—আমার প্রসাধনী ব্যাগটা তোমার কাছে রাখ। কাজেই আমার হাতে ভেলমার প্রসাধনী ব্যাগ। সে ফিসফিস করে প্রশ্ন করলো—আচ্ছা শুল্ক বিভাগের লোকেরা কি জামাকাপড় খুলিয়ে পরীক্ষা করবে?

—দূর, এত বোকা তুমি। চুপ করো। কথা বলো না। ওরা শুধু আমাদের ফর্মে ঘোষিত জিনিসগুলো পরীক্ষা করে দেখবে। তারা বড়জোর আমাদের ব্যাগের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দেখতে পারে। তাবলে তোমার জামার ভিতর হাত গলাবে না—এটা নিশ্চিত।

এরপর ভেলমা বললে—এই প্যাকেটটার কি হবে।

—আঃ মিথ্যে ভয় পাওয়া বন্ধ করতো। তোমাকে তো বলেছি জিজ্ঞাসা করলে বলবে এটা জাহাজে ওঠার আগে তোমাকে এখানেই দেওয়া হয়েছিল। তবু তারা যদি মনে করে এটা নাসাউতে কেনা হয়েছে—তাহলে এক কাজ করবে ঘোষণা পত্রে যোগ করে দেবে।

ভেলমা কাঁপা গলায় বললে—এটা কিন্তু সুগন্ধি নয়।

—নিকুচি করেছে। সাবধানে কথা বলো। কি আছে প্যাকেটটায়। আমি ওর হাত থেকে প্যাকেটটা নিলাম। তারপর হাতের তালুতে রেখে ওজনটা অনুভব করার চেষ্টা করলাম। খুব একটা ভারি নয়। কিন্তু ভেলমা বলেছে এটা সুগন্ধি নয়। ও জানলো কি করে এটাতে সুগন্ধি নেই? তাহলে কি আছে এর মধ্যে। আমি জিনিসটা দেখার জন্য প্যাকেটের একটা ধার একটু ছিড়লাম। প্যাকেটের ছেঁড়া দিকটা উল্টে দেখতেই হোঁচট খেলাম। আমি যা দেখতে পেলাম তা হচ্ছে সবুজ রঙের একতাড়া কুড়ি ডলারের নোট।

আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম।

পিছনের যাত্রীরা আমাকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য পিছন থেকে চিৎকার করলো। প্যাকেটটা আমি আমার ট্রেঞ্চ কোটের পকেটে ঢুকিয়ে রেখে ভেলমার হাতটা ধরে টানলাম। ফিসফিস করে বললাম—কোথা থেকে এগুলো এলো?

—আমি জানি না। কাগজটা ছিড়তে দেখতে পেলাম। এত ডলার ওর সঙ্গে আছে আমি জানতাম না। এখন কী হবে?

আমি কিছুটা ধমকে বললাম—একদম ছেলেমানুষি করো না। একটু স্বাভাবিক

হওয়ার চেষ্টা করো। যা ভুল হওয়ার হয়ে গেছে। তাকে আর সংশোধন করা যাবে না। বরং এখন বিপদ কাটাতে স্বাভাবিক হওয়ার প্রয়োজন। মন থেকে ঝেড়ে ফেল আর্থার আর ওর ডলারগুলোর কথা। তারপর বললাম—আমি এখন প্যাকেটটা পকেটে রেখেছি। বাইরে থেকে ফোলা ফোলা কিছু বোঝা যাচ্ছে না। একমাত্র ভয়ের ব্যাপার যদি কাস্টমসের লোকেরা পকেটের ভিতর হাত না দেয়।

আমরা প্রায় গ্যাঙপ্লাঙ্ক পার হয়ে শেষ প্রান্তে চলে এসেছি। হঠাৎ দেখি বড় মত চেহারার দুজন লোক আমাদের পথ আগলিয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের একজন তার পরিচয় পত্র বার করে আমাকে দেখিয়ে বললে—মিস্টার হারপার—

আমি বেশ বুঝতে পারলাম আমার আর কিছু করণীয় নেই। কারণ এরা হচ্ছে পুলিশের লোক।

তবু আমি বললাম—কি ব্যাপার আপনারা, আমাদের পথ আটকালেন কেন?

যদিও আমি বুঝে গিয়েছি শেষপর্যন্ত কি ঘটতে চলেছে।

দ্বিতীয়জন তার মাংসল মাথাটা নাড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললে—আপনি তো মশাই কঠিন জিনিস। আপনার বসের পঞ্চাশ হাজার ডলার চুরি করে আবার বুক চিতিয়ে নিউইয়র্কে ফিরে এলেন। আমরা তো ভাবতেই পারিনি আপনি আবার এই জাহাজেই ফিরবেন। সত্যি মশাই আপনার হিম্মত আছে।

দ্য মিসট্রি অফ দ্য থ্রি ব্লাইণ্ড মাইস

আলফ্রেড হিচকক

"আমি আলফ্রেড হিচকক বলছি। আপনারা এবার এক অতি উত্তেজক গল্পের সঙ্গে পরিচিত হয়ে নিজেদের জড়াতে চলেছেন। একটু আগের কথা বলে নিই। আপনারা পরিচিত হতে চলেছেন একজন কোটিপতি মানুষের সঙ্গে, যার বর্তমান আবাস হল একটি ভূতুড়ে প্রাসাদ। ভদ্রলোকের সখ পুরনো ডাকটিকিট সংগ্রহ এবং অতি অবশ্যই শত্রু বৃদ্ধি করা। গল্পের শেষটুকু আগেই ভেবে নেওয়া অনেকের অভ্যাস আছে। এটা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত বাজে অভ্যাস। তাই উপসংহার দেবার প্রয়োজন নেই। রহস্যের সমাধানে আপনিও গোয়েন্দা। অতএব শুরু করা যাক।..."

ভয়ঙ্কর একটা কর্কশ ধ্বনি চারদিক কাঁপিয়ে তুললো। এই ভয়ঙ্কর আওয়াজটার কথা এ্যাণ্ডি এ্যাডামস্ চিরকাল মনে রাখবে। এই ভয়ঙ্কর কণ্ঠস্বর গভীর রাত্রির নিস্তব্ধতাকে খান খান করে ভেঙ্গে চুরে দিয়ে কম্বলের তলায় আশ্রিত সুখ নিদ্রাকে একেবারে তছনছ করে দিল। এ্যাণ্ডি ভয়ে গুটিয়ে এতটুকু হয়ে গিয়েছিল।

শয়নকক্ষের চারিপাশের দেয়ালগুলো কাঁপিয়ে শব্দটা উঠেছিল—"আমাকে সাহায্য করো।"

এ্যাণ্ডির ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল, ও তখনও বুঝে উঠতে পারছিল না শব্দটা কোথা থেকে ভেসে আসছে।

আবার চিৎকার উঠলো—সে আমাকে গুলি করছে...মাইস। অতিকষ্টে যেন সে দ্বিতীয়বার একই কথা উচ্চারণ করলো। তৃতীয় এবং শেষবার ওই কণ্ঠস্বর ভেসে এলো বিলম্বিত লয়ে—মা-মা-মা-ই-ই-ই-স্-স্-স্।

এ্যাণ্ডি আর স্থির থাকতে পারলো না। তাড়াতাড়ি আলো জ্বাললো। তাকালো চারদিকে। নজরে পড়লো দেয়ালের গায়ে উচ্চভাবি যন্ত্র, যার মাধ্যমে সেই বিভৎস আওয়াজ ভেসে আসছিল। ভাবতে চেষ্টা করলো শব্দটা। প্রথমেই তার কাছে অদ্ভুত বলে মনে হল ওই বিভৎস আর্তনাদকে। "মাইস"—মাইস মানে তো ইঁদুর। ইঁদুর কি করে একজনকে গুলি করতে পারে? তারপরেই তার মনে হল, সে এখন ঠিক কোথায় আছে? ভাবতে গিয়ে আস্তে আস্তে তার মনে পড়লো...

পোটার ফিণ্ড এ্যাডামস্ বলেছিলেন, এটাই সমগ্র আমেরিকার একমাত্র নির্ভরযোগ্য ভুতুড়ে বাড়ি।

আর ওঁরই ছেলে হচ্ছে এ্যাণ্ডি, প্রায় বাবার মতই লম্বা, রোগা ছিপছিপে গড়ন। অতিবিহ্বল চোখে সে একবার ঘরটাকে নতুন করে জরিপ করে নিল। ঘরের দেয়াল, মেঝে এগুলো সব নিরেট পাথর দিয়ে তৈরি। ছাদে কড়ি বরগাগুলো যে কত শতাব্দীর পুরনো একথা বলা মুসকিল। আগুন জ্বালানোর জায়গায় গনগনে আগুন জ্বলছে। ঘরের দেয়ালগুলোতে মৃত জন্তুর মাথা দিয়ে সাজানো। কি নেই—বাঘ, সিংহ, মোষ, কুমির, পাহাড়ি গণ্ডার, ছাগল, চিতা...সব আছে। আর মেঝেতে পাতা রয়েছে জেব্রা, বাঘ, সিংহের চামড়া। এ্যাণ্ডি স্বপ্নেও এমন একটা ঘরে রাত্রি বাসের কথা ভাবেনি।

তার গত সন্ধ্যার কথা মনে পড়লো। সমবেত প্রার্থনার আগের দিন। রাত তখন প্রায় নটা হবে। ওর মা গিয়েছেন ফিলাডেলফিয়ায়, অসুস্থ বোনকে দেখতে। ও আর ওর বাবা বাড়িতে ছিলেন। ওরা খেলছিল যখন ফোনটা বাজল।

পোটারফিল্ড এ্যাডামস্ একজন নামী গোয়েন্দা। জালিয়াতি, জুয়াচুরি, পুরনো নথিপত্রের নকল ইত্যাদি ধরার ব্যাপারে তিনি হলেন একজন বিশেষজ্ঞ। তিনি উঠে গিয়ে ফোনটা ধরলেন।

কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলার পর ফোন নামিয়ে রেখে মুখ চোখে কিছুটা বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন—চলো একটা তদন্তের কাজ সেরে আসা যাক। যেতে পারবো না বলেছিলাম, কিন্তু ওরা শুনলো না। বললে খুব জরুরী। আমার উপস্থিতি খুব প্রয়োজন। তারপর একটু থেমে তিনি বললেন, দিন কয়েকের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় জিনিসপত্রগুলো কীটস্ ব্যাগে ভরে নাও।

বাবার সঙ্গে কোন তদন্তের কাজে যাওয়া, এ যেন এ্যাণ্ডি ভাবতেই পারে না। কাজেই তার উত্তেজিত হবার কারণ ছিল। প্রায় ঘন্টা খানেক নিউ ইংল্যাণ্ডের গ্রামাঞ্চল দিয়ে গাড়ি চালিয়ে ওরা এমন একটা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো, যে ধরনের বাড়ি এ্যাণ্ডি জীবনে কখনও দেখেনি। বাড়িটা খুব বড় নয়, দোতলা অনেকটা ইংরাজি "ইউ" এর মত কিন্তু বিশাল বিশাল অমসৃণ পাথরের স্তূপ। দেখে মনে হয় কয়েক'শ বছরের পুরানো হবে। বাড়িটার প্রতিটি প্রান্তে একটা করে চতুষ্কোণ মিনার। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হল বাড়িটাকে ঘিরে আছে প্রায় তিরিশ ফুট চওড়া জলে ভর্তি পরিখা। ভিতরে ঢুকতে হলে ব্রিজ আছে। প্রয়োজন মাফিক তুলে নেওয়া যায়। অনেক সময় ছবির বইতে এই ধরনের বাড়ি দেখা যায়—অনেকটা সেই রকম।

ওদের জন্য ব্রিজটা নামিয়ে দেওয়া হল। চারদিক দেখতে দেখতে ওরা বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করলো। পরে একটা ঘরে ওদের স্বাগত জানাতে দরজার সামনে এসে

উপস্থিত হলেন ছোটখাটো চেহারার এক ভদ্রলোক। পরণে লাল কোট এবং লাল প্যান্ট। ভদ্রলোকের নাম রবিন।

এ্যাণ্ডির বাবা জানালেন একেই বলে ক্যাসেল প্রাসাদ এবং বাড়িটা ভুতুড়ে বলেই আমেরিকায় বিখ্যাত।

একসময় বিশাল বপু টাক মাথার এক ভদ্রলোক ঘরের মধ্যে এসে ঢুকলেন। তিনি বসেছিলেন একটা ব্যাটারি চালিত চাকা লাগানো চেয়ারে। ভদ্রলোক তার ছোট ছোট চোখ দিয়ে এ্যাণ্ডি ও তার বাবাকে ভালভাবে নিরীক্ষণ করলেন। মনে হচ্ছিল তিনি তাদের দেখে অসন্তুষ্ট হলেন। মুখচোখে কেমন যেন অবজ্ঞার ভাব।

—আপনি তাহলে সেই ডিটেকটিভ। জড়ানো ইংরাজি উচ্চারণে লোকটি ঘ্যোং ঘ্যোং করে উঠলো। বললেন—দেখেতো বাপু আপনাকে তেমন চালাক চতুর বলে মনে হচ্ছে না। তো কি নাম যেন আপনার? ও হ্যাঁ মনে পড়েছে—পোর্টারফিল্ড এ্যাডামস্। কোন গোয়েন্দার আবার এই রকম নাম হয় নাকি?

লোকটির কথায় এ্যাণ্ডির মাথা থেকে পা পর্যন্ত অপমানে জ্বলে উঠলো। কিন্তু বলার আগে তাকালো বাবার দিকে। দেখলো ওর বাবা অত্যন্ত শান্ত মেজাজে তার বলিষ্ঠ হাতে তামাকের পাইপে তামাক ভরতে ভরতে বললেন—আমি যদি নিজেকে শার্লক হোমস বলি তাহলে কি আপনার পছন্দ হবে? আর যদি সেই সঙ্গে আপনাকে ডাকি স্লিকি ক্রামস বলে?

মন্তব্য শুনে চেয়ারে বসা ভদ্রলোক যেন রাগে ফেটে পড়লেন! ওর মুখচোখ লাল হয়ে উঠলো। নিজেকে অতিকষ্টে সামলে নিয়ে বললেন—হুঁ। আপনাকে দিয়ে আমার কাজ হবে। তারপর এ্যাণ্ডির দিকে তাকিয়ে বললেন—সঙ্গে এই নেংটিটাকে এনেছেন কেন? ওকে সঙ্গে আনার কোন দরকার ছিল?

পোর্টারফিল্ড এ্যাডামস্ মুখ থেকে পাইপের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন, ও হচ্ছে আমার ছেলে। আপনি তো জানিয়েছেন আপনার মূল সমস্যা হল ডাকটিকিট সংক্রান্ত। ও নিজে একজন ভাল সংগ্রাহক, আমাকে এই ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবে বলে মনে হয়েছে বলেই ওকে সঙ্গে এনেছি।

গোয়েন্দার বক্তব্য শুনে মনে হল ভদ্রলোক কিছুটা আশ্বস্ত হলেন। বললেন—বেশ, বেশ। তারপর এ্যাণ্ডিকে বললেন, তুমি কি ধরনের ডাকটিকিট জমাও।

—আমেরিকার বিভিন্ন স্মারক ডাকটিকিট।

—আমি সংগ্রহ করি, বিরল এবং দামী ভুল ছাপা ডাকটিকিট যা বাজারে ছাড়া হয়ে গিয়েছিল। এ ধরনের যত ডাকটিকিট পৃথিবীতে ছড়ানো আছে আমি হলপ করে বলতে পারি তার প্রতিটি একটা করে আমার সংগ্রহে আছে।

ভদ্রলোকের কথা বলার ধরনটা ভারি অদ্ভুত, যেন এ্যাণ্ডিকে পরীক্ষা করছেন।

তাই সে, ভদ্রলোকের কথা শুনে, তাকে একটু খোঁচা মারার লোভটা সামলাতে না পেরে বললেন—মাফ করবেন, সব ডাকটিকিট আপনার সংগ্রহে থাকতে পারে না। অত্যন্ত ১৮৫১ সালে প্রকাশিত ব্রিটিশ গায়নার ডাকটিকিট এক সেন্টের ম্যাজেন্টা আপনার কাছে নেই।

—কি বললে? মোটা লোকটা এমনভাবে এ্যান্ডির দিকে ঝুঁকে এলেন যেন তিনি এ্যাণ্ডিকে মারতে আসছেন।

—এই ডাকটিকিট এত বিরল শ্রেণির যে একটির বেশি কোথাও আছে বলে জানা নেই। স্কটস্ মূল্য তালিকায় বলা আছে, ওটির বর্তমান বাজার দর প্রায় পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড এবং বর্তমান মালিক সেটি বিক্রি করতে নারাজ। তাই বলছিলাম ওটি আপনার কাছে থাকতে পারে না।

—ঠিক বলেছ। না, নেই। একটা সুগভীর দীর্ঘশ্বাস পড়লো। তারপর হাতের কাছে পড়ে থাকা গণ্ডারের চামড়ার তৈরি চাবুকটা তুলে নিয়ে নিজের ভিতরের সমস্ত বিক্ষোভ প্রকাশ করে মেঝেতে বেশ কয়েকবার আঘাত করলেন।

—আমি ওটা চাই। লক্ষ্য ডলার দিতে রাজি আছি। কিন্তু ওর মালিক আমাকে বিক্রি করবে না। তবে আমি কথা দিচ্ছি আজ হোক, কাল হোক, ছলেবলে কৌশলে ওটা আমি যোগাড় করবোই। নয়ত আমার নাম নিজেল মেফেয়ার নয়।

হেণ্ডারসন। এদিকে এসো—মেফেয়ার গর্জন করে উঠলেন। ও এলে ভদ্রলোক পরিচয় করিয়ে দিলেন—ইনি হচ্ছেন এ্যাডামস্ যাকে ডেকে পাঠাতে আমি বাধ্য হয়েছি। আর এ হল বার্ট হেণ্ডারসন। আমার উকিল। আইনের পরামর্শদাতা।

ভদ্রলোক হাত বাড়িয়ে করমর্দন করলেন। বললেন—আপনারা আসায় ভারি খুশি হয়েছি। তারপর তিনি মেফেয়ারের দিকে তাকিয়ে বললেন—ওদের এবার ঘটনাটা জানানো যেতে পারে নিশ্চয়।

মেফেয়ার অনুমতি দিলেন না। বললেন—দাঁড়াও দাঁড়াও আগে এ বাড়ির সব শকুনগুলোর সঙ্গে ওর পরিচয় হোক। উনি জানুন কারা কারা আমার মাংস খুবলে খুবলে খাচ্ছে।

খবর পেয়ে প্রথম ঘরে ঢুকলো পেড্রো।

—পেড্রো, ইনি হচ্ছেন গোয়েন্দা এ্যাডামস্। এর সাহায্যেই তোমাদের মধ্যে কাউকে আমার জেলে পোরার ইচ্ছে আছে। তারপর গোয়েন্দার দিকে তাকিয়ে বললেন—মিস্টার এ্যাডামস্, পেড্রো হচ্ছে আমার গাড়ির ড্রাইভার, দেহরক্ষী। তাই বলে যে ও ওই মানুষদের দলে নেই একথা আমি হলপ করে বলতে পারবো না। তারপর পেড্রোকে বললেন—পেড্রো, আমার শালিকা এবং পালিত পুত্রের নামধারী সেই জানোয়ারটি কোথায়? ওদের এখানে ডাক।

—আজ্ঞে ওরা এখুনি নিচে নামবে। মিস্টার হাওয়ার্ড মুসকেনের বাড়িতে

আগামীকালের উৎসবের পরিপ্রেক্ষিতে আজ একটা পার্টি আছে। সেখানে ওরা যাবে বলে প্রস্তুত হচ্ছেন। এখুনি নীচে নামবেন।

পেড্রো শিক্ষিত এবং অভিজ্ঞ চাকরের মতই মনিবের সঙ্গে কথা বললে। কিন্তু তার দু'চোখের কোণে যে ঘৃণার আগুন জ্বলছিল সেটা গোয়েন্দার দৃষ্টি এড়ালো না।

এমন সময় ওরা নিচে নামলেন। এ্যাণ্ডি এবং তার বাবা দেখলেন একজন সুন্দরী মহিলা, অঙ্গে মূল্যবান সান্ধ্য পোশাক, সঙ্গে একটি যুবক। ওদের দুজনকে দেখেই মেফেয়ার ঘোৎ ঘোৎ করে উঠে বন্য শুয়োরের মত বলে উঠলেন—তাহলে তোমরা যাচ্ছ। আমার বারণটা শুনলে না। লোকটা আমার ডাকটিকিট চুরি করার ধান্দায় তোমাদের নিমন্ত্রণ করেছে। আসলে লোকটা একটা বদমায়েশ, পাজি, নচ্ছার—ঠগ্।

মহিলাটি আপত্তি জানিয়ে বললেন—নিজেল, উনি হচ্ছেন আমার প্রিয়তম, আর আপনি একজন বৃদ্ধ পাগল। আপনি তাকে হিংসে করেন কারণ তার বাড়িতে স্টিকারের সংগ্রহ অনেক বেশি এবং ডাকটিকিট সম্বন্ধেও তার জ্ঞান আপনার চাইতে অনেক বেশি।

—দেখ মোলি, মেফেয়ার যেন ক্ষেপে উঠলেন। বললেন, তুমি একটু বেশি বাড়াবাড়ি করছো। তোমার বোনকে বিয়ে করেছিলাম মানে এই নয় যে তুমি আমায় যা খুশি তাই বলবে।

শ্যালিকা জবাব দিলেন—দেশটা আমেরিকা। আপনি এমন কিছু রাজা বাদশা নন যে আপনাকে আমার ভয় পেতে হবে। আমি বলতে চাইছিলাম না, কিন্তু আপনি আমাকে বলতে বাধ্য করালেন, খুব শীঘ্রই আমি এই পাগলের আড্ডা ছেড়ে চলে যাচ্ছি। একেবারে চলে যাব। হাওয়ার্ড মুসকেনকে আমি বিয়ে করছি।

যুবকটি বললে, আমিও মাসির সঙ্গে চলে যাব। যুবকটির নাম রেগি। সে দৃঢ়কণ্ঠে বললে, যাই হোক তোমাকে জানানোর প্রয়োজন তাই বলছি, আগামীকাল আমি একটা মোটর রেসে অংশ গ্রহণ করতে যাচ্ছি।

—আগামীকাল তোমরা কেউ জেলেও যেতে পারো মেফেয়ার চিৎকার করে বলে উঠলেন।

—দেখা যাবে। ওরা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মেফেয়ার কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। মুসকেনকে তার শ্যালিকা বিয়ে করছে? হ্যাণ্ডারসন, চোরেদের দলে সেও থাকতে পারে। হয়ত বিয়েটা তার পুরস্কার। ছেলেটাও হতে পারে। ওরা সকলেই আমাকে ঘৃণা করে। সবাই, এই বাড়িতে যে কজন লোক বাস করে—তারা সবাই আমাকে ঘৃণা করে। এরপর গোয়েন্দাকে বললেন, দেখলেন, যারা আমার আশ্রয়ে আছে, তারা প্রত্যেকেই আমাকে ঘৃণা করে। আপনিও করবেন।

পোর্টারফিল্ড শান্ত গলায় বললেন, এত ভাবছেন কেন, মনে হয় ব্যাপারটা আপনি সহজ করে নিলেই পারেন।

—অবাধ্যতা আমি একদম পছন্দ করি না। মেফেয়ার গোয়েন্দাকে ধমকে বললেন। মনে রাখবেন আপনি হচ্ছেন আমার ভাড়া করা লোক। আপনি আপনার অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করবেন না।

এ্যাণ্ডি এবং তার বাবা উঠে দাঁড়ালেন। শান্ত গলায় পোর্টারফিল্ড বললেন, চলো আমরা ফিরে যাই, মেফেয়ারের কেস আমাদের পক্ষে নেওয়া সম্ভব নয়। ঘটনা যাই ঘটে থাকুক।

—ঠিক আছে, ঠিক আছে—মেফেয়ারের কথায় ঘরটা গমগম করে উঠলো। বললেন—যেতে হবে না। আপনি দেখছি বড্ড বেশি আত্মাভিমানী এবং স্পর্শকাতর। চলুন আপনি আমার পড়ার ঘরে চলুন। আর এ্যাণ্ডি তোমার পরামর্শ দেওয়ার জন্য কিছু প্রাপ্তি থাকতে পারে।

পোর্টারফিল্ডকে রাজি হতেই হল। ওরা মেফেয়ারের পিছন পিছন চললেন। হেণ্ডারসন পিছন থেকে ফিস ফিস করে বললেন—নির্ভয়ে যান, বেশি চেঁচামেচি করলে আমি পৌঁছে যাব। উনি একটু তাড়াতাড়িতে বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়েন।

এ্যাণ্ডি এবং তার বাবা অপেক্ষাকৃত একটা ছোট ঘরে প্রবেশ করলেন। এখানেও জীবজন্তুর মাথা। সেই সঙ্গে পুরনো কালের অস্ত্রশস্ত্র। দরজাটা বন্ধ করে দিন। মেফেয়ার নির্দেশ দিলেন। এ্যাণ্ডি দরজাটা বন্ধ করে দিল। পোর্টারফিল্ডের পাইপ থেকে অনর্গল তামাকের ধোঁয়া বেরিয়ে চলেছে। তাকে খুব শান্ত দেখাচ্ছে। এ্যাণ্ডি নিজেকে শান্ত করে রাখলো।

—নিজের সম্বন্ধে কিছু বলার আগে আমি লোকটা কেমন সে সম্বন্ধে আপনাদের নিশ্চয় একটা ধারণা থাকা উচিত। অন্তত তাহলে বুঝতে পারবেন আপনারা কেমন লোকের সঙ্গে কাজ করবেন। তাই না—?

গোয়েন্দা সমর্থন করে বললেন—তাহলে তো ভালই হয়।—বেশ। মেফেয়ার শুরু করলেন—আপনারা জানেন আমি একজন ডাকটিকিট সংগ্রাহক। লণ্ডনের এক বস্তিতে কেটেছে আমার কৈশোর—সেটা খুব সুখস্মৃতি নয়। বস্তির জীবন সেদিন ছিল ভীষণ নোংরা। আমাকে তখনই পাড়ার সকলে নাম দিয়েছিল—স্নিফি ক্রামস। কারণ সর্বক্ষণ আমি সর্দিকাশীতে ভুগতাম। নাক দিয়ে কফ গড়াত। আমার কাজ ছিল রাস্তা থেকে বোতল কুড়িয়ে আনা। তারপর সেগুলোকে পরিষ্কার করে একেকটা আধসেন্ট দিয়ে বিক্রি করা। এই করেই আমি ধীরে ধীরে সেন্ট জমাই। যখন মোটামুটি জমলো, তখন পাড়ি দিলাম দক্ষিণ আফ্রিকায় ভাগ্য পরিবর্তনের উদ্দেশে। পেয়েও গেলাম একটা কাজ। হীরের খনিতে। সুযোগ সন্ধান জেনে নিয়ে শুরু করেছিলাম হীরে পাচার—তার একটা রাস্তাও খুঁজে বার করলাম, যাতে

প্রহরীরা টের না পায়। আমার একুশ বছর হবার আগেই আমি হয়ে উঠলাম লক্ষপতি। তখন সবচেয়ে জরুরী হয়ে পড়লো আমার নিজের জন্য একটা সুন্দর নাম। নাম হবে সুন্দর এবং আভিজাত্যপূর্ণ। আমি নিজেই নিজে হলাম—নিজেল মেফেয়ার।

হ্যাঁ মশাই আমি যখন নিজেল মেফেয়ার হলাম, তখন আমি রীতিমত ভদ্রলোক। লক্ষপতি। তখন ডলারের লোভ আমায় পাগল করে তুলেছে।

এন্তার ডলার রোজগার করেছি। আর আপনি তো জানেন, কোন কিছু সংগ্রহ করার পোকা যখন মাথায় ঢোকে, তখন আইনের সুন্দর দিকগুলোর কথা তার অনেক সময় মনে থাকে না। কি তাই না? মেফেয়ার হাসলেন। আলোর মধ্যে ভয়ঙ্কর এক হাঙ্গরের দাঁতগুলো দেখা গেল।

যখন যথেষ্ট রোজগার হল, আয় আশানুরূপ হল, তখন শুরু করলাম জীবজন্তুর মাথা সংগ্রহ। সে সব ভারি সুন্দর সুখের দিন গিয়েছে। মনের সুখে হিংস্র জন্তু শিকার করেছি। জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়েছি। ব্রিটিশ অভিজাত পরিবারের এক মহিলাকে এই সময় বিয়ে করলাম। এক ডিউকের বিধবা বড় সুখে ছিলাম মশাই। কিন্তু একবার ভারতে বাঘ শিকার করতে গিয়ে আমার স্ত্রী মারা পড়লেন। ফলে ওর আগের পক্ষের ছেলে রেগি আর শ্যালিকা মোলি রেইনিয়ার আমার ঘাড়ে চাপলো। তাদের তো আপনি দেখলেন। ওরা আমারই অন্ন ধ্বংস করছে আর আমাকে ঘৃণা করে। এই ঘৃণার কারণ আমি লণ্ডনের বস্তিতে জন্মেছি বলে আর ওদের হয়েছে জমিদার বাড়িতে।

আরও আছে। বিষুব অঞ্চলে এক নাম না রোগ আমাকে হঠাৎ আক্রান্ত করে তার ফলস্বরূপ আমি অক্ষম হয়ে পড়ি। আমাকে ডাক্তারের পরামর্শ মত চলে আসতে হয় এই জায়গায়। ওদের ধারণা এখানকার জলহাওয়া আমাকে সুস্থ করে তুলবে। আমি এখানে এসে এই প্রাসাদটি কিনি বসবাসের জন্য, আবার কিছুটা মোলি ও রেগিকে আমার সামর্থের ইঙ্গিত দিতে। বাড়িটা ছিল ভূতের ডিপো। আগাপাছতলা ভূতুড়ে। অন্তত লোকে তাই বলে। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি আমি কিন্তু এতদিন হয়ে গেল কোন ভূতটুত দেখিনি।

মেফেয়ারের কণ্ঠস্বরে যথেষ্ট আত্মপ্রত্যয়ের সুর ছিল। বললেন, হ্যাঁ এই প্রাসাদটা আমি কিনেছি। খুব না হলেও তবে একেবারে খাঁটি জিনিস এবং যথেষ্ট পুরোনো। স্কটল্যাণ্ড আর ইংল্যাণ্ডের প্রান্ত সীমায় এটা দাঁড়িয়েছিল অন্তত সুদীর্ঘ চারশ বছর ধরে। বেশ কয়েকবার হাত বদল হয়েছে। স্কট আর ইংল্যাণ্ডের যুদ্ধের সময় কত যে রক্তস্রোত এর মেঝে দিয়ে গড়িয়ে গেছে তার হিসাব দেওয়া কঠিন। আমি প্রতিটি ইঁট খুলে এখানে বয়ে নিয়ে এসেছি। যেখানে যেমনটি ছিল সেই ভাবেই তৈরি করেছি এই প্রাসাদ। এমনকি প্রাসাদে ঢোকার জন্য ঝোলানো পুলটাও বাদ

যাইনি। কেবল নতুন সংযোজনের মধ্যে আছে ইলেকট্রিকের বন্দোবস্ত। উত্তর আমেরিকার আমি একমাত্র লোক যে সত্যিকার একটা ভূতুড়ে প্রাসাদে বাস করি। যার চারদিকে আছে জলভরতি পরিখা। কথাগুলো বলার সময় মেফেয়ারকে যথেষ্ট আত্মতৃপ্তিতে ভোগা একজন দাম্ভিক মানুষ বলে মনে হচ্ছিল। তারপর একটু থেমে তিনি এ্যাণ্ডিকে বললেন, তুমি আমাকে বিশ্বাস করো। একজন সংগ্রাহক হিসাবে তুমি নিশ্চয় তৃপ্তি পাও যখন দেখ তোমার সংগ্রহ করা টিকিট অন্য কারো কাছে নেই। এও সেই রকম। তবে আমি তো এখন অথর্ব—নিজেকে ঠিকমত ব্যবহার করতে পারি না, অথচ তারই মধ্যে আমাকে জোগাড় করতে হয় সেইসব বিরল টিকিট যা অন্যের কাছে নেই।

মেফেয়ার থামলেন।

অনেকক্ষণ পর পোর্টারফিল্ড বললেন, আপনার বক্তব্য শুনলাম। কিন্তু এখনও বুঝলাম না, আপনার আসল সমস্যা কি? কেন আপনি আমাকে ডেকে এনেছেন।

—বুঝলেন না? ঠিক আছে একটা কাজ করুন, দেয়ালের গায়ে ওই জেব্রা ঝুলছে, ওটা সরান।

পোর্টারফিল্ড উঠে গিয়ে দেয়ালের গায়ে ঝোলানো জেব্রার চামড়াটা সরালেন। দেখা গেল দেয়ালের গায়ে মানুষ প্রমাণ একটা উঁচু স্টিলের বিশাল দরজা, সেখানে কম্বিনেশন চাবি লাগানো আছে।

দরজাটা খুলুন। আপনারা যখন আসেন তখনই আমি সেটাকে খুলে রাখি। ভিতরের ছোট বাল্বটা জ্বালানো আছে।

পোর্টারফিল্ড তাই করলেন। ভিতরে স্টিলের তৈরি একটা ঘর। মাপটা ভারি অদ্ভুত। উচ্চতায় ছয় ফুট লম্বায় আট ফুট চওড়ায় ছয় ফুট। ভিতরে একটা ছোট টেবল-চেয়ার আছে। দেওয়ালে র‍্যাক। সেখানে রাখা আছে প্রচুর চামড়া বাঁধানো খাতা।

মেফেয়ার বললেন, ওটা আমার সর্বস্ব। আমি আমার চেয়ারটা নিয়ে ওখানে ঢুকে যেতে পারি। লক্ষ লক্ষ ডাকটিকিট ওখানে রাখা আছে। এটা আগুন নিরোধক, চুরি করা চট করে সম্ভব নয়। এমন কি কেউ পোড়াবার চেষ্টা করলে সে নিজেই বিপদে পড়বে। কারণ বিষাক্ত গ্যাস আছে যা ঘরটাকে তখনই ছেয়ে ফেলবে।

আরও আছে। ছয় অক্ষরের শব্দ নির্ধারিত করা আছে, যা একমাত্র আমি ছাড়া এই দুনিয়ার কেউ জানে না। কোন দিন কোন চোরের পক্ষে এই দরজা খোলা সম্ভব নয়। কিন্তু এত নিরাপত্তা সত্বেও কেউ একজন আমার অজান্তে এই ঘরে ঢুকেছিল। দরজাটা খুলতে পেরেছিল এবং চুরি করে নিয়ে গেছে কিছু ডাকটিকিট। অবশ্যই চুরি করে।

ভদ্রলোক কথা বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে ওঠায় পোর্টারফিল্ড বললেন,

উত্তেজিত হবেন না। উত্তেজিত হলে প্রয়োজনীয় সূত্রগুলো পেতে আমার অসুবিধে হবে।

না, না উত্তেজিত আমি হইনি। অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করে মেফেয়ার বললেন, কিন্তু গোয়েন্দা মশাই একটা সময় ভেবে দেখুন যে এই কাজটি করেছে সে আসলে নিজেল মেফেয়ারকে ডাকাতি করেছে। একজন সংগ্রাহকের হেফাজত থেকে টিকিট চুরি যাওয়া মানে হচ্ছে মূল্যবান কিছু সম্পদ হারানো—এটা ডলার চুরির মতই সাংঘাতিক।

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে মেফেয়ার বললেন—যাই হোক চুরি গেছে মোটে গোটা দুয়েক স্ট্যাম্প, খুব বেশি হলে বাজারে এখন ওর দাম হবে বিশ-তিরিশ হাজার ডলার। আমার ধারণা এই বাড়ির কেউ না কেউ এই কাজ করেছে। কে সে এটাই আমার জানার দরকার। আমার শ্যালিকা, রেগি, পেড্রো, কিংবা হেণ্ডারসন। রাঁধুনি ফ্রেঞ্চিকে আমি সন্দেহ করি না—কারণ সে যতক্ষণ থাকে ততোক্ষণ তাকে রান্না ঘরেই কাটাতে হয়। এই ঘরে সে কখনই আসে না। আমার বক্তব্যটা হল কে এই চুরিটা করেছে। আমার চুরির ধন মুসকেনের বাড়িতে গেছে। মুসকেন আমার নিকটতম প্রতিবেশী। আমার শ্যালিকা তার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। যদি এই কাজ মোলি করে থাকে, তবে তো সোনায় সোহাগা।

ভদ্রলোক বলে চললেন—ভল্টের মধ্যে আমি রোজ ঢুকি না। হয়ত মাসের পর মাসও কেটে যায় আমি ভল্টে ঢুকিনি, এমন ঘটনাও আছে। চুরির কথাটা আমি টের পেতাম না। টের পেলাম হঠাৎ কয়েকদিন আগে। কয়েকজন আমাকে জানালেন আমেরিকায় চার সেন্ট দামের যে দাগ হেমারজেণ্ডের জোন্ট স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করেছে, তাতে ভুল আছে। ব্যাপারটা বুঝলে? এবার মেফেয়ার প্রশ্ন করলেন এ্যাণ্ডিকে।

হ্যাঁ আমি জানি—এ্যাণ্ডি জবাব দিল। অনেকেই একথা বলেছে। পশ্চিমের কেউ কেউ তো চিঠির সঙ্গে ব্যবহারই করেছেন। এই দিকের এক ভদ্রলোকের কাছে পুরো পাতাই আছে। প্রচুর দাম চাইছেন তিনি।

মেফেয়ার বললেন, চাইতেই পারেন। ওকে আমি প্রায় কব্জা করে ফেলেছিলাম। ১৯১৮ সালের পর এত বড় ভুল আমেরিকার ডাক বিভাগ করেনি। কিন্তু তার আর প্রয়োজন নেই। কেন জানো? ওয়াশিংটনের ওই হতভাগা পোস্টমাস্টার জেনারেল ঘোষণা করেছেন, ডাকটিকিট সংগ্রহ কিন্তু লটারি নয় যে মোটে কয়েকজন বিত্তবান ব্যক্তির আবিষ্কারে সে সব থাকবে। কয়েক লক্ষ ওই ভুল টিকিট আবার ছাপা হবে যেন প্রত্যেকে সেটা পান। হতভাগা—ওরকম একটা জরুরী জিনিস আমার বাড়িতে ঢোকার অনুমতি পেল না। কিন্তু একটা কাজ হল। আমি ভল্ট খুললাম এবং তখনই ধরা পড়লো চুরিটা। ঘটনাটা আমাকে পাগল করে

তুললো। আমার একমাত্র কামনা ওই জানোয়ারটিকে খুঁজে বার করা। কাউকে না কাউকে এরজন্য শাস্তি পেতে হবে। মূল্য দিতে হবে। আমি ছাড়বো না।

ভদ্রলোক সত্যি রাগে গর্জাচ্ছিলেন। অনেকটা অবস্থা ফাঁদে পড়া বাঘের মত। গোয়েন্দা তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে যাওয়ার আগেই একটা দরজা খুলে গেল। হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকলো পেড্রো, ওর পিছনে হেণ্ডারসন, রবিন প্রভৃতি। ওদের মুখগুলো ফ্যাকাশে।

পেড্রো দ্রুত একশিশি আরক এনে মেফেয়ারের মুখে ঢেলে দিল। ধীরে ধীরে মেফেয়ার স্বাভাবিক হয়ে এলেন। শান্ত হলেন। পেড্রোকে ধন্যবাদ দিয়ে বললেন, তুমি কি মোলি আর রেগিকে মুসকেনের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এসেছ?

—হ্যাঁ। পেড্রো জবাব দিল। আর সে জানালো, ওই বাড়িতে বিরাট বড় এক পার্টির ব্যবস্থা হয়েছে। প্রচুর লোক। গান বাজনা, নাচ হবে। মুসকেন বলেছেন, পার্টি শেষ হলে তিনি ওদের বাড়ি পৌঁছে দেবেন। আমি এখন গাড়িটা সারাতে চললাম।

মেফেয়ার বললেন, আমি শুতে যাওয়ার আগে বিছানায় বসে বসে প্রেসিডেন্টকে একটা চিঠি লিখব এবং তাতে জানাবো আমি পোস্টমাস্টার জেনারেলের সম্বন্ধে কি ভাবি। তারপর বললেন, পেড্রো আমাকে শোবার ঘরে নিয়ে চলো। মিস্টার এ্যাডামস্ বাকি কথা আমাদের কাল সকালে হবে। আপনার আপাতত যা যা প্রয়োজন আপনি রবিনকে বলবেন, ওই সব ব্যবস্থা করে দেবে।

পেড্রো বোতাম টিপতেই দেয়ালের একটা অংশ সরে গেল। এ্যাণ্ডি সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলো, ছোট একটা লিফট সেখানে দাঁড়িয়ে। নিজেল মেফেয়ার তার ইলেকট্রিক চেয়ার সমেত ওই লিফটের মধ্যে ঢুকে গেলেন।—"শুভরাত্রি" পেড্রো লিফটের দরজাটা বন্ধ করে দিল।

ওরা চলে যেতে এ্যাণ্ডির মনে হল সে যেন এতক্ষণ একটা ঝড়ের মধ্যে পড়েছিল। মেফেয়ারের রাগের প্রতিক্রিয়া তখনও তাকে আচ্ছন্ন করেছিল।

হেণ্ডারসন গিয়ে ভল্টের খোলা দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। ভিতরের লাইট নিভিয়ে দিলেন। এবং তিনি সাক্ষী মানলেন গোয়েন্দা বাবা ও ছেলেকে। বললেন, আপনারা সাক্ষী রইলেন আমি ভল্ট বন্ধ করলাম। উনি তো কাউকে বিশ্বাস করেন না। তারপর এ্যাণ্ডিকে জিজ্ঞাসা করলেন, মেফেয়ারকে কেমন লাগল?

—ভালো লাগল না। এ্যাণ্ডি জবাব দিল। বললে—ভদ্রলোক বড় বড় কথা বলে গেলেন যে সারা জীবন ধরে তিনি তার প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহে মিথ্যে কথা, ছল, চাতুরি, কৌশল সবই প্রয়োগ করেছেন।

—যদি তার চাইতে আর কিছু খারাপ না করে থাকেন হেণ্ডারসনের মন্তব্য।

—যাক গে—এবার পোর্টারফিল্ড বললেন, যাকগে, এখন সব কিছুই মিটে

যাবে। মিস্টার হেণ্ডারসন আপনি নিশ্চয় আমাকে কিছু সূত্র দিয়ে সাহায্য করতে পারেন।

—নিশ্চয়।

—এ্যাণ্ডি তুমি বরং এখন শুতে যাও। অনেক রাত হল। আমি বলছি আজ রাত্রের মত আর কিছু হবে না।

গোয়েন্দা পোর্টারফিল্ড এ্যাডামস্ ভুল বলেছেন। ভবিতব্য পড়তে পারেননি। তার ভুলটা অবশ্যই ধরা পড়েছে, আরও কয়েক ঘণ্টা পর।

"...আমি আলফ্রেড হিচকক বলছি, অনেকক্ষণ চুপ করেছিলাম। এবার কথা না বলে আর থাকতে পাচ্ছি না। এ্যাণ্ডি যখন শুতে গেছে তখন আমার চোখে পড়েছে এমন কয়েকটি সূত্রের প্রসঙ্গ আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথমতঃ মেফেয়ারের স্বভাব। তিনি এমন কিছু তার যা নিজের কাছে আছে, তা অন্যের কাছে আছে, এমন কিছু ভাবতে নারাজ। একটি অত্যন্ত জরুরী প্রশ্ন। পরবর্তীকালে খুবই বিশাল চেহারা দিতে পারে। দ্বিতীয়ত যারা ডাকটিকিট সংগ্রহ করেন, তার একটা তারিখ লক্ষ করুন, তারিখটা হল ১৯৬২ সালের সমবেত প্রার্থনার আগের দিন। দাগ হেমারজোণ্ডের ভুলে ভরা স্মারক ডাকটিকিটটি বেরুবার দিনটি। ওটা আবিষ্কার হয়েছিল এই বছরের বসন্তকালে। নভেম্বর মাসে সাধারণত প্রচণ্ড বাতাস বয় নিউ ইংল্যাণ্ডে। আপনারা নিশ্চয় খেয়াল করেছেন সে রাত্রে ঠাণ্ডা বাতাস বইছিল দুর্গম বেগে। বাতাসের ওক গাছগুলো নুয়ে নুয়ে পড়ছিল। এই সূত্রগুলি কি আপনার কোন কাজে লাগবে?

রবিন ততক্ষণে এ্যাডিকে নিয়ে দোতলায় তার জন্য নির্দিষ্ট ঘরে প্রবেশ করেছে। ঘর তো নয় যেন একটা বিশাল হলঘর। ঘর ভর্তি পুরনো দিনের আসবাবপত্র। বিশাল দুটো বড় খাট। একটা এ্যাডির জন্য অন্যটি তার বাবার জন্য। রবিন বেশ নাটকীয়ভাবে বললেন, এ্যাণ্ডি আজ রাতে তুমি যে খাটে ঘুমোবে সে খাটে কোন এককালে কোন রাজা ঘুমোতেন। মিস্টার মেফেয়ার বিভিন্ন রাজবাড়ি থেকে বেছে বেছে একেকটা আসবাবপত্র কিনেছেন। সেখানে তিনি হেঁটে যান, সেখানে দিয়ে কোন একসময় কোন একরাজা হেঁটে গেছেন। যে চেয়ারে তিনি বসে আছেন—সেখানে কোন এক রাজা বসতেন।...এসব চিন্তা করতে তার ভাল লাগে।

সব কিছু দেখে আর শুনে এ্যাণ্ডি বেশ রোমাঞ্চিত হল। যে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। সে দেখতে পেল তার বাঁ দিকের পুরো অংশটা অন্ধকারে ঢাকা কিন্তু ডান দিকের অংশটা আলোয় আলোময়। বাইরে ঠাণ্ডা বাতাস যেন চাবুক চালাচ্ছে, পরিখার ধারে গাছগুলো যেন চিৎকার করে নুয়ে পড়ছে। পশ্চিম প্রান্তে দেখা যায়

একটা আলো, কখনও দৃষ্টিগোচর হচ্ছে কখনও সেটা মিলিয়ে যাচ্ছে। তবে সেটা অনেক দূরে।

—ওই আলোটা কিসের রবিন?

—ওটা হেণ্ডারসনের ঘরের আলো। তিনি ওই ঘরে থাকেন।

—আমি দূরের আলোটার কথা বলছি?

—ওটা। মিস্টার হাওয়ার্ড মুসকেনের বাড়ি। একসময় এই দুই বাড়ির মালিকের মধ্যে খুব বন্ধুত্ব ছিল। এখন ওরা পরস্পরের শত্রু। যাক, ও সব কথা, তুমি কি গরম জলে একটু স্নান করবে?

এ্যাণ্ডি ভেবে দেখল মন্দ নয়। সে রাজি হল। আরও জানতে চাইলো, রবিন নিচে যত জন্তু জানোয়ারের মুণ্ডু আর চামড়া দেখলাম, ও সব কি মেফেয়ার নিজে শিকার করেছেন।

—না, না। মিস রেইনিয়ার ওর শ্যালিকা, কিছু, কিছু রেজিলাণ্ড, কিছু পেড্রো, এমনকি আমিও দু-একটা চিতা শিকার করেছি।

—তার মানে এই বাড়ির সকলেই শিকারি?

—একমাত্র রাঁধুনি ছাড়া।

এ্যাণ্ডি গোয়েন্দা সুলভ প্রশ্ন চালিয়ে যেতে লাগলো।

—রবিন প্রত্যেকে কি সত্যি মেফেয়ারকে ঘৃণা করেন?

—উনি নিজেকে প্রত্যেকের কাছে নিজেকে বিরক্তিকর করে তোলেন।

—তুমি তাকে ঘৃণা করো? পেড্রো? মানে প্রত্যেকে?

—মেফেয়ার যদি সত্য কিছু বলে না থাকেন, তবে বলি আমি এবং আমরা প্রত্যেকেই তাকে ঘৃণা করি। এমনকি রেইনিয়ার আর তার ছেলে রেগি পর্যন্ত?

—তাই নাকি? তাহলে তোমরা ওর এখানে আছো কেন? তোমরা তো চলে যেতে পারো।

রবিন বললে শান্ত গলায়—মাস্টার এ্যাণ্ডি, বলাটা সহজ। আসলে কখনও কখনও আমরা প্রত্যেকেই কিছু না কিছু ভুল করি। নেহাতি প্রাণের দায়ে আমরা এখানে আছি। ওই ভল্টে একটা লোহার বাক্স আছে, ওই বাক্সের মধ্যে মেফেয়ার আমাদের বিশ্বাস কিছু গোপন কাগজপত্র সযত্নে রেখে দিয়েছেন। আমাদের এখানে রাখা এবং বিশ্বস্ত থাকার পক্ষে ওই কাগজগুলোই যথেষ্ট।

—তার মানে উনি তোমাদের ভয় দেখান। ব্ল্যাকমেইল করছেন?

—দেখ ওই শব্দটা আমার ঠিক পছন্দ নয়। তবে এটা ঠিক সকলের সম্বন্ধে কিছু গোপন কাগজ তার কাছে জমা আছে।

—মিস্টার হেণ্ডার সন? মিস রেইনিয়ার, রেগি প্রত্যেকের।

রবিন বললে—মিস রেইনিয়ার এবং রেজিলাণ্ড রেগি—এরা দুজনেই কপর্দক

শূন্য। উপরন্তু বাজারে এদের প্রচুর ধার আছে। ওদের যাবতীয় খরচ মেফেয়ার চালান। স্বভাবতই ওদের চলে যাওয়ার কোন স্বাধীনতা নেই। মেফেয়ার ওর মৃতা স্ত্রীর কিছু সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন। ওই সম্পত্তি রেইনিয়ার পেলে তাদের ভরণপোষণ চলে যায়...যাক অনেক সময় কথা হল আর নয়, তুমি বরং স্নানটা সেরে ফেল।

—হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে তুমি যাও।

রবিন চলে গেল। তারপর দীর্ঘ সময় ধরে স্নান করলো এ্যাণ্ডি। মনের সুখে স্নান শেষ করে বিছানায় শুয়ে পড়লো। তারপর সারাদিনের ক্লান্তিতে একসময় ঘুমিয়ে পড়েছিল। গভীর ঘুম।

কিন্তু ওই বিকট আওয়াজটা তার ঘুম ভাঙিয়ে দিল। সে উঠে বসলো। তখন শব্দটা ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে আছে। কাঁপছে চারপাশ।

সেই কণ্ঠস্বর সমানে চিৎকার করছে—বাঁচাও...বাঁচাও।

এ্যাণ্ডি কম্বল সরিয়ে খাট থেকে নেমে এলো।

"সে আমাকে গুলি করছে।" শব্দ এত যান্ত্রিক এবং ভাঙ্গা যে এ্যাণ্ডি বুঝতে পারছিল না কার এই আর্তচিৎকার।

—আমি সন্দেহ করছি লোকটা মাইস।

আস্তে আস্তে কণ্ঠস্বর নিস্তেজ হয়ে এলো। তখনও শব্দটা ছড়িয়ে আমি সন্দেহ করছি লোকটা মাইস।

তারপর সব স্তব্ধ। অনেকক্ষণ বাদে শেষবারের মত—ভেসে এল দীর্ঘলয়ে—মা...মা...মা...ই...ই...ই...স...স...স।

এ্যাণ্ডি বিছানার উপর উঠে বসলো। তারপর দ্রুত পাগলের মত উদবিগ্ন হয়ে সে আলোটা জ্বাললো। আলো জ্বালা মাত্র তার সব গোলমাল হয়ে গেল এ কোথায় সে আছে? এখানে এলো কি করে? পরক্ষণে তার সব কথা মনে পড়লো। তাকিয়ে দেখলো পাশে ওর বাবার বিছানাটা ফাকা। সে দরজার দিকে ছুটলো। দেখল তার বাবা হলের অন্য প্রান্তের একটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন। ও ছুটলো তার পিছনে। যে দরজা দিয়ে বাবা বেরিয়ে গেলেন সে দরজা ততোক্ষণে বন্ধ হয়ে গেছে। এ্যাণ্ডি দরজাটা খুলে বাইরে এসে দেখলো আরও একটা বড় ঘর। ঘরটায় বহু জানলা এবং সেগুলোতে ঝালর ঝুলছে।

—ঝালরগুলো সব বিরল। বাবা দাঁড়িয়ে আছেন এক বিশাল খাটের সামনে। খাটের উপর কাত হয়ে শুয়ে আছেন মেফেয়ার। সহজভাবে নিশ্বাস নেবার চেষ্টা চালাচ্ছেন, চোখ বন্ধ, একটা হাত তখনও তার প্রচার যন্ত্রের সুইচের উপর। এই প্রচার যন্ত্র মারফৎ মেফেয়ারের সাহায্যের আবেদন ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়েছিল। খাটের ঠিক পাশে একটা টেবিলে টেবল-ল্যাম্পটা তখনও জ্বলছিল।

—এ্যাণ্ডি। ওর বাবা ডাকলেন। তারপর তিনি ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, মেফেয়ারকে কেউ গুলি করেছে। বিছানার ওপর বসা অবস্থায় এবং ঘরের আলো জ্বালা থাকায়—তিনি ছিলেন ভাল টার্গেটে। তিনি হয়ত শীঘ্রই মারা যেতে পারেন। আমাদের এখুনি একজন ডাক্তারের প্রয়োজন।

কথাটা বলেই তিনি প্রচার যন্ত্রে মুখ লাগিয়ে রবিন আর পেড্রোকে ডাকলেন। এবার ওদের নজর পড়লো জানলার দিকে। ওরা দেখতে পেল মাঝের জানলার গায়ে পরিষ্কার তিনটে গুলির চিহ্ন। গর্তের চারদিকে বারুদের দাগ। বাবার সঙ্গে এ্যাণ্ডি গিয়ে জানলার কাছে দাঁড়ালো। সে একটা ফুটো দিয়ে চোখ রাখলো এবং দেখতে পেল মিঃ মুসকেনের বাড়ির আলো যেন জ্বলছে আর নিভছে। ফুটোগুলো এবং মুসকেনের বাড়ি একই সরলরেখায়।

বাবাকে ডাকতে গিয়ে থমকে গেল এ্যাণ্ডি। দেখলো ততোক্ষণে পেড্রো ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকছে। তার হাতে ড্রাম, গাড়ি পরিষ্কার করছিল সে। পিছনে রবিন এলেন, প্রায় ওদের সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকলেন হেণ্ডারসন। পরণে পায়জামা, গায়ে ড্রেসিং গাউন, পায়ে শোয়ার ঘরের চটি।

গোয়েন্দা পোর্টারফিল্ড এ্যাডামস্ গম্ভীর ভাবে আদেশ করলেন প্রথমে রবিনকে। বললেন, রবিন তুমি এখুনি একজন ডাক্তারকে খবর পাঠাও। আর সেই সঙ্গে নিকটবর্তী হাসপাতালে ফোন করে বলো একটা স্বয়ং সম্পূর্ণ এ্যাম্বুলেন্স পাঠাতে, ওকে সাহায্য করার জন্য। পেড্রো, তুমি মেফেয়ারের এই মুহূর্তে যা প্রয়োজন করো। ভদ্রলোকও বেঁচে আছেন, অবস্থাটা ভাল নয়। তারপর হেণ্ডারসনের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি একটু বাইরে বেরিয়ে দেখুন যদি কোন সূত্র আপনার নজরে পড়ে। আমি পুলিশকে একটা খবর দিতে যাচ্ছি। এ্যাণ্ডি তুমি শুতে যাও।

—হ্যাঁ যাচ্ছি। বাবার গম্ভীর কণ্ঠস্বর তাকে অন্য কিছু বলার সুযোগই দিল না।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে এ্যাণ্ডি ভাবতে লাগলো। ভাবতে গিয়ে আবিষ্কার করলো মাইস কথাটার কি মানে হতে পারে। গুলি চালাবার সময় মনে হয় কে গুলি করছে তাকে তিনি চিনতে পেরেছিলেন এবং যন্ত্রণার মধ্যেও তিনি তার নামটা জানিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন। হয়ত উনি বলতে চেয়েছিলেন, আমি মুসকেনকে সন্দেহ করি—পুরো কথাটা বলার সময় হয়ত তিনি পাননি। তাই পুরো কথাটা বলতে না পেরে বলেছেন—"মাইস্"। সেই সঙ্গে এ্যাণ্ডির মনে হল মেফেয়ার হয়ত বলতে চেয়েছিলেন—"My Sister in Law" অথবা "My Stepson". দুটো ক্ষেত্রেই প্রাথমিক উচ্চারণ "মাইস্"। তিন মাইস্। এ্যাণ্ডির মাথার মধ্যে এটাই ঘুরতে লাগলো। তিন মাইস্ "কারণ মেফেয়ারকে যারা ঘৃণা করেন। তাদের একজন হতে পারেন "Muyskens"..."My Sister in Law"...অথবা "My Stepson".—

তিন মাইস্। আর আমরা কিনা অন্ধের মত ঘুরছি—জানি না এদের মধ্যে কে গুলি করেছেন। এ্যাণ্ডির আরও মনে হল। "মাইস্" কথাটার অর্থ হচ্ছে "ইঁদুর"। মেফেয়ার অবশ্যই কাউকে মানুষ ভাবতেন না। অতএব পুরো ব্যাপারটাকে বলা যেতে পারে—"মুসিক রহস্য" আবোল তাবোল ভাবতে ভাবতে এবং সেই সঙ্গে সন্ধ্যের উত্তেজনার শিকার হয়ে একসময় এ্যাণ্ডি নরম বিছানায় শুয়ে ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

আমি হিচকক বলছি। আপনাকে বিরক্তি করার জন্য সত্যি আমি দুঃখিত। কিন্তু চুপ করে মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকতে পারলাম না, এই ভেবে যে ব্যাপারটা অত্যন্ত জরুরী। সূত্র এই মাত্র ভেসে উঠে আবার ডুব দিল—আপনার নজরে পড়েছে কিছু? যদিও সে সূত্র নির্দিষ্ট ভাবে অপরাধীকে চিহ্নিত করতো না, তবু কারা অপরাধী নয়, তাদের আলাদা করে সরিয়ে দিতে পারতো। আপনার সন্দেহভাজন ব্যক্তির সংখ্যা এতে অন্তত কমে যেত। সূত্রটি যদি আপনার নজরে না পড়ে থাকে, তবে শেষ পাতাগুলো আবার পড়ুন না। পেয়ে যেতে পারেন। কিছু একটা অন্তত আপনার উপকার হবে, আর যাই হোক পড়ার অভ্যাসটা তৈরি হবে। কেবল এইটুকু আমার বলার আছে এই মুহূর্তে বর্তমান নাটকে একটা খুব জরুরী সূত্র উঁকি মেরে চলে গেছে।...ব্যাস এর চাইতে বেশি কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"

সকালে যখন এ্যাণ্ডির ঘুম ভাঙলো তখন ঘড়িতে সাড়ে নটা বাজে। পাশের বিছানাটা দেখে সে বুঝতে পারলো বাবা রাতে শোবার সুযোগ পান নি। সে দ্রুত নিজেকে তৈরি করে নিল এবং নেমে এলো হলঘরে। ওর আশঙ্কা এতক্ষণে বোধহয় স্ট্যাম্প চুরি এবং মুসিক রহস্যের সমাধান হয়ে গেছে। সে হলঘরে কাউকে দেখতে পেল না। কেবল মেফেয়ারের ঘরের দরজাটা খোলা দেখতে পেল। পায়ে পায়ে সে ভিতরে ঢুকে পড়লো। ঘরে কাঠের দেওয়ালে গুলির আঘাতের চিহ্ন প্রথমেই তার নজরে পড়লো। মেফেয়ারের শরীরে দুটো গুলি লেগেছে, তৃতীয়টি লাগেনি কারণ তখন তিনি শুয়ে পড়েছেন। এ্যাণ্ডি জানলার কাছে গিয়ে দেখতে পেল, কেউ ওই জায়গা থেকে জানলা অবধি একটা কালো সুতো বেঁধে রেখেছে। এ্যাণ্ডি জানলার কাছে গিয়ে দেখতে পেল সুতোটা তৃতীয় গর্তের উপর অবধি টানা রাখা আছে। ক্ষতটি যে তৃতীয়গুলির দ্বারা হয়েছে এটা বুঝতে এ্যাণ্ডির কোন অসুবিধে হল না।

সে ঝুঁকে সুতোর লাইন বরাবর দেখার চেষ্টা করলো। তার দৃষ্টি কাঠের তৈরি গর্তের ভিতর দিয়ে সে সোজা একটা লাইন তৈরি করলো, সেটার মধ্যে দিয়ে দেখতে পেল—লাইনটা সোজা গিয়ে ঠেকেছে যে বাড়িতে—সেটা হল মিস্টার

হাওয়ার্ড মুসকেনের বাড়ি। এ্যাণ্ডি তাই আশা করেছিল। কারণ আগের রাতেই সে এটা লক্ষ্য করেছিল। মুসকেনের বাড়িতে তখন পার্টি চলেছে।

এবার এ্যাণ্ডি খোলা জানলা দিয়ে পুরো দৃশ্যটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো। আগের রাতের ঝড়ো হাওয়া এখন আর নেই। সে দেখতে পেল তিরিশ ফুট চওড়া খালের কিছুটা অংশ, সূর্যের আলো পড়ে জল চিকচিক করছে। তারপর নির্দিষ্ট দূরত্বে লাগানো একসারি ওক গাছ, তারপরে পাথরের দেয়াল। তারও প্রায় তিনশ ফুট দূরে হাওয়ার্ড মুসকেনের বাড়ি। এবং বুঝতে পারলো গুলিটা এসেছে ওক গাছের মধ্যে দিয়ে। সোজাসুজি মেফেয়ারের ঘরের মধ্যে।

এ্যাণ্ডির হিসাব মত প্রাসাদের পশ্চিম কোণ থেকে ছয় ফুট দূরত্ব রেখে বুলেট ছুটে এসেছে। এ্যাণ্ডি খুব ভাল করে লক্ষ্য করে দেখলো পশ্চিম দিকের কোন জানলা থেকে গুলি করা সম্ভব কিনা। সে লক্ষ্য করলো পশ্চিম দিকের রাস্তার শেষ ঘরটি হেণ্ডারসনের ঘর। সে ঘরের জানলা অল্প খোলা কিন্তু ওই কোণ থেকে গুলি চালানো সম্ভব নয়। যদি আলসে মত কিছু থাকতো, তাহলে ব্যাপারটা সম্ভব হলেও হতে পারতো। তা একাবারেই সম্ভব নয়। এই বাড়ির কোন অংশ থেকে গুলি করা সম্ভব নয়। এমনকি বাইরের বাগান থেকেও সম্ভব নয়—সবুজ লন—ওক গাছ—পরিখা, না কোন অংশ থেকেই গুলি করা সম্ভব নয়।

হঠাৎ এ্যাণ্ডি চমকে উঠলো। বাড়ির পশ্চিম প্রান্তে দেওয়ালে হেলান দিয়ে রাখা আছে একটা মই। অবশ্য এও তার নজরে পড়লো যে কারুর পক্ষে সেই মই-এর মাথায় দাঁড়িয়ে গুলি চালানো সম্ভব নয় কারণ যে কোণ সৃষ্টি হয়েছে সেখান থেকে বাড়ির এই অংশ অর্থাৎ মেফেয়ারের ঘর দেখাই যায় না। সেই সঙ্গে আরও একটা চিন্তা তার মাথায় এলো, এবং এই ভেবে আশ্চর্য হল, যে আজকাল তার মাথা বেশ পরিষ্কার হয়েছে, চিন্তা শক্তি বেড়ে গেছে। ভাবলো তার বাবার মাথায় এই চিন্তাটা এসেছে কি না। কারণ ব্যাপারটা তা হলে পুরো ঘটনাটার চরিত্রই পাল্টে যাবে।

সে বাবার উদ্দেশে ছুটলো। তাড়াতাড়ি যেতে গিয়ে প্রায় সে রবিনের ঘাড়ের উপর গিয়ে পড়লো।

—রবিন। বলতে পারো বাবা কোথায় আছেন?

—পশ্চিম লাইব্রেরিতে আছেন। বোধ হয় কিছু টুকে নিচ্ছেন।

—তাহলে কি রহস্যের সমাধান ইতিমধ্যে হয়ে গেছে।

—মনে তো হয় না। রবিনকে খুব বিরক্ত বোধ করতে দেখা গেল। বললে—পুলিস ইতিমধ্যে এসে গেছে। তারা আমাদের ইতিমধ্যে বেশ কয়েক হাজার প্রশ্ন করেছে। আমার ধারণা তারা প্রতারিত হয়েছে।

—অনেক ধন্যবাদ রবিন—এই বলে সে হন হন করে হেঁটে বাবার খোঁজে এগিয়ে গেল।

কিন্তু অন্য একটা দরজা অতিক্রম করতে গিয়ে সে থমকে দাঁড়ালো। দরজাটা একটু ফাঁক ছিল। দেখলো ভিতরে স্থানীয় এক পুলিশের কর্তা লেফটেন্যান্ট ডিক ফিল্ড বসে আছেন। এ্যাণ্ডি তাকে আগেই চিনত। তিনি কথা বলছিলেন লম্বা, খড়্গনাসা কালো চুলের মালিক এক ভদ্রলোকের সঙ্গে। এ্যাণ্ডি আন্দাজ করলো— উনি নিশ্চয় হাওয়ার্ড মুসকেন হবেন।

—মিস্টার মুককেন...পুলিশ অফিসারের গলা শোনা গেল। তিনি বলছেন— এই রাইফেলটি আমার লোকেরা পরিষ্কার জলের ভিতর থেকে উদ্ধার করেছে। দেখতেই পাচ্ছেন এটা একটা শিকার করার বন্দুক। টেলিস্কোপ বসানো। খুব সম্ভব পাঁচশ গজ অবধি এই ধরনের রাইফেল কার্যকর।

—ভুল করলেন। মুসকেন দেখে মৃদু হেসে বললেন—এর কার্যকারিতা এক হাজার গজ। হ্যাঁ রাইফেলটা আমারই। ওটা আমার ট্রফি সাজানো শোকেসের মধ্যে ছিল। কেউ বোধহয় চুরি করেছে।

—কখন চুরি গেছে, এই সম্বন্ধে আপনার কোন ধারণা আছে?

—একদম নয়। ঘরটা বাড়ির একেবারে শেষ মাথায়। এমনও হয়েছে যে দীর্ঘদিন আমি ওই ঘরে যাইনি। হু, যে কেউ এটা ব্যবহার করে থাকুক না কেন, কাজের শেষে জলে ফেলে দিয়েছে। কারণ গতকাল রাতে আমার বাড়িতে পার্টি চলছিল, মনে হয় সেই জন্য ফিরিয়ে দেবার সুযোগ বা সুবিধা পায়নি।

—পার্টি চলার ফাঁকে আপনি নিশ্চয় এটা ব্যবহার করেননি। হঠাৎ করে ইন্সপেক্টর জানতে চাইলেন।

—ওই বৃদ্ধ মেফেয়ারকে মারতে। এটা একেবারে ছেলেমানুষি হত। খাটে বসা অবস্থায় কাউকে গুলি করা ব্যাপারটা আমার কাছে একেবারে অখেলোয়াড়চিত। না, মশাই আমি গুলি করিনি। আর আপনি তো বিভিন্ন লোককে প্রশ্ন করে জেনেছেন যে গতকাল রাতে পার্টি ঘিরে তখন নিজে কতটা ব্যস্ত ছিলাম।

—কিন্তু আপনারা তো তার শত্রু।

—বাজে কথা। তিনি হয়ত আমাকে ঘৃণা করেন কিন্তু আমি তাকে শ্রদ্ধা করি। আসলে আমার ওপর তার রাগের কারণ হল আমি খুব শীঘ্রই ওর শ্যালিকা রেইনিয়াকে বিয়ে করতে যাচ্ছি। এই অঞ্চলে আমার বাস করার উদ্দেশ্যও তাই, ওর কাছাকাছি থাকা।

—মেফেয়ারের চুরি যাওয়া একটা ডাকটিকিট আপনি কেনেন নি আশা করি।

—না।

—ধন্যবাদ আপনি এখন যেতে পারেন, তবে পরে দরকার হলে আবার আপনাকে ডেকে পাঠানো হতে পারে।

এবার অফিসার হাঁকলেন—মিস রেইনিয়া। গতকাল রাত্রে দেখা সেই সুন্দরী মহিলাটিকে সাড়া দিতে দেখা গেল।

—বলুন ইন্সপেক্টর।

—গতকাল রাতের বক্তব্যের সঙ্গে আর কিছু যোগ করার আছে কি আপনার?

—না। নিজেকে আমি গুলি করিনি। যদিও আমার মাঝে মাঝে ওর ব্যবহারে মাথায় রক্ত চেপে যেত, ইচ্ছে হত খুন করি। কিন্তু করিনি। গতকাল রাত্রে আমি তো পার্টিতেই ছিলাম।

—টেলিস্কোপ লাগানো রাইফেল দিয়ে তিরিশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে আপনি গুলি করতে পারেন।

—খুবই সহজ অফিসার। বলেন তো একবার দেখিয়ে দিই।

—ধন্যবাদ, তার কোন প্রয়োজন হবে না। আপনি এখন যেতে পারেন।

এর পরেই শোনা গেল রেগির উত্তেজিত কণ্ঠস্বর।

—আমরা স্রেফ সময় নষ্ট করছি না অফিসার।

না মশাই ওই বৃদ্ধ যুবকটিকে আমি গুলি করিনি কিন্তু পারতাম যদি এই চিন্তাটা আমার মাথায় ঢুকত। গতকাল রাত্রে আমি পার্টিতে ছিলাম। তারপর অনুনয়ের সুরে বললেন—এবার অনুমতি দিন প্রাতঃরাশ সেরে ফেলতে পারি। বিকেলে আবার আমার মোটর কার রেস আছে।

প্রশ্নোত্তর শেষ হয়ে গেছে ভেবে এ্যাণ্ডি ছুটলো লাইব্রেরির দিকে। সেখানে বাবাকে পেয়ে গেল।

ভদ্রলোক তখন ঘাড়গুঁজে কি সব যেন টুকে নিচ্ছিলেন।

—বাবা। এ্যাণ্ডির উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনে তিনি তাকালেন তার দিকে। এ্যাণ্ডি বললে—মেফেয়ার মেফেয়ার কে— ?

—তিনি এখন হাসপাতালে। অজ্ঞান অবস্থায় আছেন। বাঁচতেও পারেন, আবার নাও পারেন। বাঁচলেও চব্বিশ ঘণ্টার আগে ওর সঙ্গে কথা বলা যাবে না।

—কোন্ ইঁদুর ওকে গুলি করেছে, তুমি কি তা বার করতে পেরেছ?

—এই সমস্যাটাই তো আমাকে আর পুলিশকে ঘোরাচ্ছে। এই তো অফিসার এসে গেছেন। কিছু পেলেন অফিসার?

—কিচ্ছু না। ভদ্রলোক ধপাস করে সোফায় বসে পড়লেন।

এমন সময় ঘরে ঢুকলো রবিন।

সে দু'কাপ কফি নামিয়ে দিল দুজনের উদ্দেশে আর এ্যাণ্ডির সামনে ধরে দিল তার প্রাতঃরাশ।

—মাস্টার এ্যাণ্ডি, আপনার খাওয়া হয়নি, তাই নিয়ে এলাম।

এ্যাণ্ডি ওর কথায় খুশি হল। খেতে শুরু করলো।

—খুব তাড়াতাড়ি আমাদের কাউকে গ্রেপ্তার করতে হবে মিস্টার পোর্টার। অফিসার বললেন—নয়ত কাল প্রভাতি সংবাদপত্রগুলো আমাদের মুণ্ডুপাত করে ছাড়বে। সত্যিকারের একটা প্রাসাদ জল ভর্তি পরিখা—ঝোলান পুল...তালা লাগানো ভল্ট..কোটিপতি ডাকটিকিট সংগ্রাহক রাত্রিবেলা অর্তকিতে গুলিবিদ্ধ। আহত ব্যক্তি সন্দেহভাজন ব্যক্তির নাম বলার চেষ্টা করেছিলেন। বারবার বলেছেন—"মাইস"। উঃ চিন্তা করা যায় না, কিভাবে কাগজগুলো আমাদের ভুলোধনা করবে।

—ওই ভল্টটা আমাদের খুলতে হবে—পোটারফিল্ড সমর্থন করে বললেন—ওটা খুলতে পারলে জানতে পারবো, অন্তত কি কি চুরি গেছে। আর সূত্রও পেতে পারি। রবিন আমাকে বলেছে মেফেয়ারের ভল্টের মধ্যে এমন কিছু কিছু কাগজ আছে যা দিয়ে তার এখানে যারা কাজ করে তাদের অনায়াসে বিপদে ফেলা যায়।

এ্যান্ডি মধ্যিখানে কথা না বলে আর থাকতে পারলো না। বললে—মেফেয়ার ওদের ভয় দেখিয়ে তার সঙ্গে থাকতে বাধ্য করেছেন, যদিও এরা প্রত্যেকেই তাকে ঘৃণা করে।

—খাঁটি কথা। অফিসার সমর্থন করলেন। বললেন মেফেয়ার লোকটা মশাই খুব একটা সুবিধার নয়। যতক্ষণ তিনি আমাদের নিজে গুপ্ত শব্দটি না জানাচ্ছেন ততোক্ষণ এই ভল্ট খোলা যাবে না।

ছয় সংখ্যার একটি শব্দে ভল্ট খুলবে। আর সংখ্যার আসল শব্দটা একমাত্র মেফেয়ারই জানেন। পাইপ থেকে ধোঁয়া ছেড়ে পোটারফিল্ড এ্যাডামস্ বললেন—কয়েকটা নাম নিয়ে আমরা যতই নাড়াচাড়া করি না কেন, তবু খুলবে না। যদিও কোন একজন মেফেয়ারের বুদ্ধিকে টেক্কা মেরেছে এবং শব্দটি জেনে ফেলেছে।

—"স্ট্যাম্পস্"—এ্যান্ডি হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো। সবাই ওর দিকে তাকালো। সে বললে—না মানে উনি তো স্ট্যাম্প পছন্দ করেন, আর শব্দটাও ছয় অক্ষরের।

—ভাল বলেছ। এ্যাডামস্ উৎসাহ দিলেন ছেলেকে। তারপর বললেন, আমরা ইতিমধ্যে চেষ্টা করেছি, কিন্তু কাজে লাগেনি। এমনকি আফ্রিকা, যেখানে থাকতে উনি ডলার বানিয়েছেন "হেলেনা" ওর স্ত্রীর নাম সবই আমরা চেষ্টা করেছি, কিন্তু কোন ফল হয়নি।

—যাক আপাতত ভল্ট যাক। বরং কে গুলি চালিয়েছে সেটা নিয়ে ভাবা দরকার। আমার ধারণা তাকে গ্রেপ্তার করতে পারলে, সেই টিকিট চোরের খবর আমাদের দিয়ে দেবে। আসলে পোর্টার গতকাল রাত্রে তোমাদের আগমন চোরকে সাবধান করেছে এবং অসংযতও করেছে। তার প্রতিক্রিয়া হচ্ছে মেফেয়ারকে মেরে ফেলা, তাহলে তদন্তের যবনিকা পড়বে।

—আমার কি মনে হয় জানো? গোয়েন্দা ভুরু দুটো কুচকে বললেন—ওকে

মারার পরিকল্পনা বোধ হয় আগেই করা হয়েছিল। আমরা আসা বা না আসা কোন ব্যাপার নয়।

—অর মানে তুমি বলতে চাইছো গতকাল রাতের পার্টি সুযোগটা এনে দিয়েছে?

এ্যাণ্ডির প্রশ্ন—হয়ত এই পার্টির জন্যই মিস রেইনিয়া ও রেগি বাড়ির বাইরে যেতে পেরেছে। বড় পার্টির হৈ হট্টগোলের মধ্যে কেউ একজন সুট করে সরে গিয়ে সকলের অলক্ষ্যে মেফেয়ারকে গুলি করে আসার সুযোগ পেয়েছে।

—ও ঠিক বলেছে অফিসার। পুত্রের বক্তব্যকে সমর্থন করলেন পোর্টারফিল্ড। বললেন—খুব সুন্দর প্ল্যানমাফিক কাজ হয়েছে। বুঝতে পারছো সন্দেহভাজন লোকের তালিকার ভিড় ক্রমশ বাড়ছে আর সেইসঙ্গে বৃদ্ধি পাচ্ছে যতরকমের বিভ্রান্তি। এদিকে আমি বাগানের এবং গুলির সম্ভাব্য পথের একটা নকশা এঁকেছি দেখতো।

নকশাটা হাতে নিয়ে খুব মনযোগ সহকারে দেখলেন পুলিস অফিসার। তারপর বললেন—ভাল হয়েছে। এর দ্বারা আমরা বুঝতে পাচ্ছি গুলি চালানো সম্ভব এই তিনজনের দ্বারা। মুসকেন, রেগি অথবা মিস রেইনিয়া—তাই না।

—খুব সহজ সিদ্ধান্ত। যদি বোঝা যেত তিন মাইসের কোন একজন গুলি চালিয়েছে।

—বাবা। হঠাৎ এ্যাণ্ডি বাধা দিয়ে বললে—ওই যে সিঁড়িটা, সেটা পশ্চিমদিকের দেওয়ালে হেলান দিয়ে রাখা আছে এবং তোমার নকশাতেও সেটা দেখিয়েছ—

—হ্যাঁ তাতে কি হয়েছে?

—আমার মাথায় একটা চিন্তা এসেছে, ওই সিঁড়ির ব্যাপারে। একবার পরীক্ষা করে দেখলে হয় না।

পুলিস অফিসার হেসে বললেন—তোমার ছেলেও দেখছি গোয়েন্দা হয়ে গেল। বেশ তো চলো, একবার দেখা যাক।

ওরা বেরিয়ে পড়লো। মিনিট কয়েকের মধ্যে খোলা জায়গায় চলে এলো। তারপর বাড়িটার পশ্চিম প্রান্ত ঘুরে এসে দাঁড়ালো সিঁড়িটার সামনে। পুরোনো কাঠের তৈরি। প্রয়োজন মত লম্বা করা যায় সেই রকম। জানলার গায়ে ওটা হেলান দিয়ে দাঁড় করানো আছে।

—এটা তো একসপ্তাহ ধরে এখানে পড়ে আছে। বললেন গোয়েন্দা এ্যাডামস্। তারপর বললেন—তোমার এই ব্যাপারে আইডিয়া কি শুনি?

সিঁড়িটাকে নামিয়ে আনার দরকার আছে। আগে বুঝতে হবে এটা চল্লিশ ফুট লম্বা হবে কি না।

—বেশ, ডিক তুমি হাত লাগাও, তবে তোমার পক্ষে নামানো একার কম্ম নয়।

মই নামানো হল। পুলিস অফিসার হেসে বললেন—সাবাস, পোর্টার তুমি বা আমি কি চিন্তা করছি, তোমার ছেলের চিন্তা শক্তি দেখছি খুবই প্রখর। আমাদের

দুজনের মধ্যে কারো মাথায় আসেনি এটাকে ব্রিজ হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে? আমরা জিনিসটাকে অন্য রকম ভেবেছি। তোমার ছেলের বাহাদুরি আছে। তারপর তিনি এ্যাণ্ডিকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমায় মাথায় এই রকম আইডিয়া এলো কি করে?

—সিনেমায় দেখেছিলাম, এই ভাবে একটা মইকে ব্যবহার করা হয়েছিল।

এবার তিনজনে মিলে মইটার উপর দিয়ে হাঁটাচলা করলেন, পরিখার উপর স্থাপন করার পর।

উৎসাহিত এ্যাণ্ডি বললে—দেখলে তো ওই তিনজনকে শুধু সন্দেহ করলে চলবে না, অন্য কেউ এমন কাজ করতেও পারে, পরিখা পার হয়ে আসার পর। তারপর গুলি করে রাইফেলটা পরিখার জলে ফেলে দিয়ে মইটাকে আবার যথাস্থানে রেখে ফিরে গিয়েছে। আর ভালমানুষ সাজতে বসেছে। ওরা তিনজনে মিলে মইটা আবার যে জায়গায় ছিল, সেই জায়গায় রেখে দিল।

কাজ শেষ হবার পর অফিসার বললেন, তোমার চিন্তাশক্তি ভাল, তবে কিছুটা দুর্বল। তুমি তো দেখলে মইটাকে রাখা এবং পাতার জন্য আমরা তিনজনে মিলে হাত লাগিয়েছি। এক্ষেত্রে হত্যাকারি যা করেছে তা একাই করেছে।

পুলিস অফিসারের কথায় এ্যাণ্ডি একটু আহত হল। বললে—আপনি বলতে চাইছেন মইটাকে একজনের পক্ষে নামানো সম্ভব নয়। আর আমি যদি বলি—তিনজনে মিলে কাজটা করেছেন আর গুলিটা চালিয়েছেন একজন। আর সবচেয়ে বড় কথা হল, ওই রাতে সব ঘরে খবর পাঠানোর পর তিন মিনিটের মধ্যে হাজির হয়েছিলেন পেড্রো, রবিন ও হেণ্ডারসন।

—ঠিক কথা। অফিসার হাসলেন।

এ্যাণ্ডির মাথায় তখন বিচিত্র ভাবনার ঝড় উঠেছে। এবার বললে—ধরুন ওরা তিনজনে কাজ করেছে এবং গুলি চালিয়েছে একজন। ওরা তিনজনেই রাইফেল চালাতে জানে।

অফিসার উল্লসিত হয়ে গোয়েন্দা পোর্টারকে বললেন—পোর্টার এদিকটা তো আমাদের নজর এড়িয়ে গেছে। ওর বয়স যদি একটু বেশি হত, আমি আজই ওকে পুলিশে ঢুকিয়ে নিতাম। যদিও ওর ভাবনাগুলো যথেষ্ট বাস্তবসম্মত নয়, তবু বেশ মজার।

—কিন্তু কেন সম্ভব নয় বলুন। এ্যাণ্ডি যেন একটু বেশি রেগে গেছে।

এবার ওর বাবা বললেন—তোমার আউডিয়াটা একেবারে ভুল একথা বলবো না। কিন্তু মনে রেখো মেফেয়ার বিশেষ কাউকে সন্দেহ করেছিলেন কিন্তু তার পুরো নামটা বলে যেতে পারেননি। আমাদের সামনে যে রহস্য দানা বেঁধে আছে, এই হচ্ছে তার মূল কথা।

এ্যাণ্ডি আরও কিছুটা তর্ক করতে পারতো। কিন্তু তার মনে পড়লো সেই দুর্যোগের কথা। ওক গাছগুলো কিভাবে আছাড়ি-পাছারি করছিল। দূরের আলোর এদিক ওদিক দোলা দিচ্ছিল। তাই সে বাবাকে বললে—বাবা তুমি বলতে চাইছো দিনের বেলায় মইয়ের উপর দিয়ে যেভাবে ছোটাছুটি করা সহজ রাতে সেটা সহজ নাও হতে পারে। প্রায় তাদের হামাগুড়ি দিয়ে যেতে হবে। তোমার সাহায্যের আবেদন শোনা মাত্র ওরা তিনজনই ঘরে হাজির হয়েছিলেন।

—ঠিক তাই। পোর্টার খুশি হয়ে বললেন, গোয়েন্দা হবার সব দিকগুলোই ভাল শিখেছ। আর আধ ঘণ্টার মধ্যে আমরা মেফেয়ারের ঘরের মধ্যে সবাই জমায়েত হচ্ছি। এবং বিশেষ একজনকে আমি কিছু জিনিস জিজ্ঞাসা করতে চাই। সেখানে তোমারও নিমন্ত্রণ রইলো।

পুলিশ অফিসার সাই দিলেন। বললেন—খুঁদে গোয়েন্দার কাছ থেকে কিছু মতামত পাওয়া যাবে।

আমি হিচকক বলছি—"আমার প্রশ্ন এ্যাণ্ডি যে সব সন্দেহের কথা প্রকাশ করলো, আপনাদের মধ্যে কি কেউ বলতে পারবেন, সেগুলো কিভাবে আরও সুন্দর এবং ব্যবহারিক হতে পারে? এই অবধি এসে গল্পের মধ্যে যাবতীয় সূত্র সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এতক্ষণে আপনাদের ধরে ফেলা উচিত ছিল কে আসলে গুলি করেছিল। ওক গাছের কথাগুলো ভাবুন, একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক বিছানায় বসে আছেন, টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে,...ভারি সুন্দর লক্ষ্য কিন্তু নভেম্বরের ওই ঠাণ্ডা রাত্রি, ঝড়ো বাতাস যেন মনে হয় একাকি অশরীরি আত্মা করুণ সুরে বিলাপ করছে। আরও আছে ছয় অক্ষর যুক্ত শব্দ, যা কি না ভল্টের দরজা খুলতে সাহায্য করবে..."

নিজেল মেফেয়ারের শোবার ঘরে সবাই জমায়েত হয়েছে। এ্যাণ্ডি দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল, ওর পাশে দাঁড়িয়ে হেণ্ডারসন। গোয়েন্দা এ্যাডামস্ নিজে দাঁড়িয়েছিলেন বুলেট বিধ্বস্ত জানলার কাছে। পুলিশ ইন্সপেক্টর ফিল্ড দাঁড়িয়ে ছিলেন হলঘরের একটা বন্ধ দরজার সামনে। পেড্রো, রবিন এবং আরও একজন বিছানার খুব কাছে দাঁড়িয়েছিল। ওদের চোখে ভয়ের ছাপ। মিস রেইনিয়ার একমাত্র মহিলা উপস্থিত ছিলেন, তিনি বসেছিলেন চেয়ারে। রেগি দুই পকেটে হাত দিয়ে টানটান হয়ে অন্য একটা চেয়ারে বসেছিল।

—উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণ—অফিসার এইভাবে শুরু করলেন। এই জমায়েত আমাদের তদন্তের একটা অঙ্গ। মিস্টার পোর্টার আমাকে সাহায্য করবেন তার মূল্যবান উপদেশ দিয়ে এবং মেফেয়ারকে হত্যার প্রচেষ্টার আগের সন্ধ্যায় তিনি

উপস্থিত ছিলেন এই বাড়িতে। কারো কোন প্রশ্ন আছে কি?

দেখে মনে হল না কেউ কোন প্রশ্ন করবেন। শুধু রেগি কিছু বলতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত নিজেকে সামলে নিল।

—বেশ তাহলে শুরু করা যাক। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বিছানার প্রান্ত থেকে গুলিতে ঝাঁঝরা জানলা অবধি একটা কালো সুতো টানা আছে। গুলি ওই পথ দিয়ে এসেছিল। এবং তিনটের মধ্যে দুটো লেগেছিল মেফেয়ারের দেহে। মিস্টার মুসকেন, ব্যাপারটা একবার দেখবেন নাকি।

—নিশ্চয়। মুসকেন উঠে গিয়ে সুতোর লাইন বরাবর চোখ লাগিয়ে কিছুক্ষণ দেখলেন তারপর নিজের চেয়ারে বসে বললেন, ঁ লাইন দুটো ওক গাছের মধ্যে দিয়ে যে বাড়িতে পৌঁছেছে সেটি অবশ্যই আমার বাড়ি। তিনশ গজ।

—আপনি কি কোন মন্তব্য করবেন?

—করা উচিৎ, মুসকেনের ঠোঁটের কোণায় সামান্য হাসির রেখা ফুটে উঠলো। বললেন, খুবই উঁচু মানের কাজ।

—মানে।

—মানেটা যা খুশি হতে পারে অফিসার।

মিস রেইনিয়ারের দিকে তাকিয়ে এবার অফিসার বললেন আপনি কিছু বলবেন।

মহিলা সুন্দর করে হাসলেন।

বললেন—হাওয়ার্ডের মন্তব্যই আমার মন্তব্য এটা বলতে পারি কাজটা খুবই উঁচু দরের।

—রেগি।

—আমি। রেগি হাসবার কষ্টটুকুও স্বীকার করলেন না। শুধু বললেন, আপনারা আমার কাছ থেকে কোন সাহায্য পাবেন না। বুড়ো মরেছে এবং ওর মরাই উচিত ছিল। প্রচুর জ্বালিয়েছে। প্রতিটি দিন আমাদের ভয়ে ভয়ে কাটে। হাওয়ার্ড, আমার মাসি অথবা আমি—এই হত্যার ব্যাপারে আপনারা কোন সুনির্দিষ্ট প্রমাণ আমাদের বিরুদ্ধে দিতে পারবেন না। আমরা সকলে পার্টিতে ছিলাম এবং প্রত্যেকেরই গুলি করার মত সমান সুযোগ ছিল কিন্তু পার্টিতে ব্যস্ত থাকার জন্য সেটা করে ওঠা সম্ভব হয়নি। তার মাস্টার এ্যাণ্ডি এবার তোমাকে বলি পুরো ব্যাপারটাই একটা যাচ্ছে তাই বাজে ঘটনা।

—বাঃ বেশ সুন্দর বিশ্লেষণ, এ্যাণ্ডির বাবা বাধা দিলেন তারপর বললেন, যাই হোক আপনার সবাই শুনেছেন মেফেয়ারের শেষ কথা। মাইকে যা শুনিয়েছে অনেকটা "মাইস" এইরকম। যার পুরো শব্দ হতে পারে—"Muyskens", "My Sister in Law" অথবা "My Stepson."

গোয়েন্দা প্রত্যেকের দিকে শ্যেন দৃষ্টিতে তাকালেন। কোন ভাবান্তর কারো মধ্যে হয় কিনা দেখার জন্য এবং প্রত্যেকের মধ্যেই একটা উদবিগ্নতা লক্ষ্য করা গেল। এ্যাণ্ডি ভাবছিল, বাবা এই তিনজনের মধ্যে কাকে নির্বাচন করবেন।

—উদ্দেশ্য আপনাদের প্রত্যেকেরই ছিল—গোয়েন্দা বলে চললেন—মিঃ মুসকেন আপনি হয়ত চেয়েছিলেন আপনার প্রিয়তমাকে বাঁচাতে। মিস রেইনিয়ার, যদি ডাকটিকিটগুলো আপনি চুরি করে থাকেন, তাহলে জেল বা অপমানের হাত থেকে বাঁচার জন্য এ কাজ আপনি করেছেন বলা যায়। রেগি সম্পর্কেও আমাদের এইরকম একই ধারণা।

—দেখুন স্যার উদ্দেশের কথা যদি বলেন, তাহলে বলবো আমার একডজন উদ্দেশ্য থাকা উচিত ছিল। কিন্তু গোয়েন্দা মশাই, আমি দুঃখিত যে ডল্টের বিশেষ সংখ্যাটি আমি বার করতে পারিনি। পারলে বুড়োর সব টিকিট নিয়ে এতদিনে পগার পার হয়ে যেতাম।

—সে যাই হোক, গোয়েন্দা পোর্টার একবার আড়চোখে এ্যাণ্ডির দিকে তাকালেন। তারপর ঠাণ্ডা গলায় বললেন আমি হলপ করে বলতে পারি আপনারা তিনজন—কেউই দোষী নন।

ঘরের মধ্যে গুঞ্জন উঠলো। গোয়েন্দা বলতে লাগলেন—কারণ গতকাল পশ্চিমের বাতাস ছিল। আর সেই বলেছে কে দোষী। গতকাল রাতে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বাতাসে ওক গাছগুলো ভীষণ ভাবে দুলছিল। মেফেয়ারকে গুলি করার পর আমি দেখেছি ওক গাছগুলোর পাতা যেভাবে দুলে পড়ছিল তাতে মুসকেনের ঘরের জানলা আড়াল যাচ্ছে। ওই প্রচণ্ড হাওয়ার মধ্যে, যখন ওক গাছের লতাপাতা উড়ছে, তখন প্রায় তিনশ গজ দূর থেকে কারো পক্ষে গুলি চালানো সম্ভব নয় বলেই আমার ধারণা। মিস্টার মুসকেন আপনি কি কিছু বলবেন?

—কখনই সম্ভব নয়। প্রথমতঃ বাতাসের গতি নির্ধারণ করাই ছিল মুসকিল। দ্বিতীয়তঃ গাছগুলো প্রচণ্ড দুলছিল, তৃতীয়তঃ গুলি গাছের গায়ে লাগতো। কাজেই আমার বাড়ি থেকে যে গুলি করা হয়নি এটা নিশ্চিত করে বলতে পারি।

—তবে বোধ হয় আকাশ থেকে গুলি করা হয়েছে হঠাৎ করে পেড্রো বলে বসলো কথাটা।

—আমার মনে সেই প্রশ্নটাই এসেছে, পরে ভেবে দেখলাম সেটাই সম্ভব।

সবাই অবাক হয়ে পরস্পরের দিকে তাকালো। গোয়েন্দা সকলকে বোঝাবার চেষ্টা করে বললেন—একটা পরীক্ষার মাধ্যমে আমরা ব্যাপারটা বোঝাতে পারি। সবাই জানলা থেকে সরে দাঁড়ান। এবার বাইরের দিকে লক্ষ্য করুন। সবাই সবিস্ময়ে দেখলেন—ধীরে ধীরে একটা মই বাইরে দিকে ঝুঁকে পড়ছে। ওপরের পাদানির সঙ্গে কোন জানলা দড়ি দিয়ে বাধা।

মইয়ের মাথায় একজন পুলিশ অফিসার দাঁড়িয়ে আছে, তার হাতে একটা. রাইফেল, জানলার দিকে তাক করা।

এ্যাণ্ডি হঠাৎ চিনতে পারলো সেই মই। যেটা মিস্টার হেণ্ডারসনের জানলার বাইরে হেলান দিয়ে দাঁড় করানো ছিল। ঘরের মধ্যে খাটের ঠিক মাঝখানটায় একটা মোটা পাশবালিশ রাখা হল, ঠিক যেমন ভাবে মেফেয়ার বসেছিলেন। এবার সকলে দেখলো পুলিশ অফিসার গুলি চালালেন। বালিশ ফেটে তুলো বেরিয়ে পড়লো। গোয়েন্দা পোর্টারফিল্ড বললেন—এইমাত্র আপনারা তো দেখলেন কিভাবে আকাশ থেকে গুলি চালাতে পারে।

—তার অর্থ। পেড্রো কি যেন বলতে গিয়েও থেমে গেল।

তখনই কেন যেন সবাই হেণ্ডারসনের দিকে তাকালেন। তিনি এ্যাণ্ডির পাশে দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

—হ্যাঁ মিস্টার হেণ্ডারসন। পোর্টারফিল্ড এডামসেব কণ্ঠস্বর গম্ভীর শোনালো। যে জানলার পাশে সিঁড়িটা হেলান দেওয়া অবস্থায় বসে আছে ; ওটা আপনার ঘরের জানলা। আপনার ঘর তল্লাসি করে একটা খুব শক্ত ও মজবুত ধরনের লোহার দড়ি পাওয়া গেছে, সেটা স্পর্শ করে মনে হয়েছে বেড়িয়েটরের মত কোন জিনিসের সঙ্গে ওটা বাঁধা ছিল, কারণ ওই দড়িটা তখন যথেষ্ট গরম ছিল। দড়িটা বিদ্যুতের সাহায্যে ছোট বড় করা যায়। আপনি ওই দড়ির সাহায্যে ওই বাইরের মইতে চড়ে মিস্টার মেফেয়ারকে গুলি চালিয়ে ছিলেন। তারপর পরিখার জলে রাইফেলটা ফেলে দিয়ে দড়ি গুটিয়ে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেছেন, মইটা জানলার পাশে হেলান দিয়ে রেখেছেন তারপর ছুটে এসে আমাদের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। আবার দেখুন—অন্য কেউ গুলি করলে আপনি নিশ্চয় শুনতে পেতেন আর আগেই আমাদের জানাতেন।

—কিন্তু বাবা উনি তো "মাইস" নন।

—অর্থাৎ তুমি বলতে চাইছো ওর নামের অক্ষর এম নয়—এই তো। গোয়েন্দা ব্যাখ্যা দিলেন—তুমি কি জানো মিস্টার মেফেয়ার একজন ব্রিটিশ, ইংরেজরা উকিলদের সলিসিটার বলেন। তুমি শুনেছ হেণ্ডারসন মেফেয়ারের সলিসিটর ছিলেন। তাকে সলিসিটার বলে সম্বোধন করতেন। সেটাই তোমার মুসিক রহস্য নিহিত। মিস্টার মেফেয়ার তার নিজের ভাষায় বলতে চেয়েছিলেন—"I Suspect my Solicitor."

হেণ্ডারসনের বলিষ্ঠ হাত এ্যাণ্ডির শরীর স্পর্শ করলো। সে চমকে উঠলো। সে আরও অনুভব করলো তাদের পিছনের দেওয়ালে ভারি কিছু একটা সরে যাচ্ছে। হেণ্ডারসন ততোক্ষণে এ্যাণ্ডিকে জড়িয়ে ধরেছে। হায়—হেণ্ডারসন আক্ষেপ করে উঠলেন। বললেন ওই দমকা ঝড়ো হাওয়াই আমার সর্বনাশ করেছে। আমার

ধারণা ছিল ভারি সুন্দর একটা প্লট হয়েছে, আমি সেই ভরসাতেই আপনাকে এখানে ডেকে এনেছিলাম মিস্টার পোর্টারফিল্ড। মিঃ মেফেয়ারকে বোঝাতে চেয়েছিলাম আমি সন্দেহ মুক্ত কিন্তু আপনি যে এত তীক্ষ্ণ মেধাবি তা আমার ধারণা ছিল না। যাই হোক বর্তমান পরিস্থিতিতে আমি আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি।

এ্যাণ্ডি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দেখল ঠিক ওর পিছনের দরজা খোলা। কেউ কিছু বোঝার আগে হেণ্ডারসন এ্যাণ্ডিকে ধাক্কা দিয়ে ভিতরে ঢুকিয়ে দিল তারপর সজোরে দরজাটা বন্ধ করে দিল। লিফট তখন হুড় হুড় করে নেমে চলেছে। মেফেয়ারের নিজস্ব লিফট। হেণ্ডারসন সাবধান করলো ঝামেলা বাড়িও না খোকা। আমার সঙ্গে পিস্তল আছে। ওটা কিন্তু ব্যবহার করতে বাধ্য হব।

একসময় লিফট থামলো। দরজা খুলে গেল। হেণ্ডারসন ধাক্কা মেরে এ্যাণ্ডিকে বার করে নিয়ে এলো অন্য একটা ঘরে তার পরে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল। ওক গাছের ভারি পাল্লার দরজা। আপাততঃ মিনিট পাঁচেক নিশ্চিন্ত, খোকা চুপ করে দেওয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়াও, নয়ত তোমার হাতটা আমি মুচড়ে ভেঙ্গে দেব। তুমি নিশ্চয় হাতটা ভাঙ্গতে চাও না। এ্যাণ্ডির হাতটা হেণ্ডারসনের লৌহ কঠিন মুঠিতে ধরা আছে। একবারের জন্য ছাড়েনি।

এ্যাণ্ডি আদেশ পালন করলো। কিন্তু সে এ'ও বুঝতে পারলো হেণ্ডারসন বিশাল ভল্টের কম্বিনেশনের চাবি ঘোরাচ্ছে। ওর আন্দাজ ঠিক ছিল। একটু পরে ভল্টের দরজা খুলে গেল। হেণ্ডারসন তাকে ভল্টের ভিতরে ঠেলে দিল। ভিতরে একটা ছোট টেবিল আর চেয়ার ছিল, হেণ্ডারসন তাকে চেয়ারে বসতে বললো। এ্যাণ্ডি বসলো। হেণ্ডারসন বললেন—তুমি যদি বেশি নড়াচড়া করো, বুঝতেই পাচ্ছ গুলির পরিমাণ প্রচুর আমার হাতে আছে। তার চেয়ে বরঞ্চ এখানে বসে বাঁচার উপায়টা বের করো।

এরপর এ্যাণ্ডি দেখলো লম্বা লোকটা একটার পর একটা এ্যালবাম বার করে বেছে বেছে কিছু মূল্যবান ডাকটিকিট সংগ্রহ করে নিয়ে একটা খামে পুরলো। এক মিনিটও হল না, তার ভিতরেই সে সব কাজ শেষ করে ফেললো। তারপর এ্যাণ্ডিকে বললে—যাক আমার সব কাজ শেষ। যে ডাকটিকিটগুলো আমি নিলাম এগুলোর সব শুদ্ধ দাম হবে বাজারে এক লক্ষ ডলার। তাতেই আমি আবার নতুন করে কাজ শুরু করতে পারবো। কিন্তু এবার তো আমাকে চলে যেতে হবে। তোমার জন্য আমার বড় কষ্ট হচ্ছে খোকা। তোমাকে এখানে একা থাকতে হবে। ওঃ একটা কাজ বাকি।

সে একটা ছোট লোহার বাক্স বার করলো। বললে এই বাক্সের মধ্যে আমার এবং অন্যদের কার্যকলাপের সব ইতিহাস আছে। যা কিনা আমাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ

করা হতে পারে। সবাই জেনে খুশি হবে আমি সব সাক্ষ্য প্রমাণ পুড়িয়ে ফেলেছি।

তোমার ধারণা তুমি পালাতে পারবে?

ওই শোন ওরা দরজাটা ভাঙবার চেষ্টা করছে।

—তুমি ঠিক বলেছ। তারা সেই চেষ্টা করছে বটে শোন এ্যাণ্ডি আমি তোমাকে ভল্টের ভিতরে রেখে বাইরে থেকে বন্ধ করে চলে যাব। প্রায় পাঁচ-ছয় ঘণ্টা তুমি এখানে নিশ্বাস নেবার মত বাতাস পাবে। আশা করি তার মধ্যে তুমি সংকেতটি বার করতে পারবে না। অবশ্য তোমার বাবা যদি রাজি থাকেন, চার ঘণ্টা সময় দিতে, যাতে আমি পালাবার মত যথেষ্ট সময় পাই, তবে তাকে আমি টেলিফোনে সংকেতটা জানিয়ে দেব। তবে চার ঘণ্টা। নয়ত ওরা যখন তোমায় উদ্ধার করবে তখন তোমার পৃথিবীর সম্পর্কে কোন জ্ঞান বা উৎসাহ থাকবে না।'

হেণ্ডারসন দরজার দিকে এগিয়ে গেল। বাইরে কাঠের দরজার উপর তখন দুমদাম কুড়ুলের কোপ পড়ছে।

''আমি তোমাকে ভীষণ পছন্দ করি এ্যাণ্ডি।'' হেণ্ডারসন ফিরে দাঁড়ালেন। তোমার বাবাকেও আমি শ্রদ্ধা করি, যদিও তিনি আমার মুখোসটা খুলে দিয়েছেন, তবুও। পশ্চিম বাতাসের উল্লেখ তার মুখে শোনায় আমি তার বিচক্ষণতায় আরও বেশি শ্রদ্ধাবান হয়েছি। যাই হোক আমি তোমাকে একটা সূত্র দিয়ে যাচ্ছি। বলতে পারো একটা ধাঁধা। বসে বসে বার করো। বার করতে পারলে দরজাটা খুলে যাবে। এখন শোনো মন দিয়ে। কবি জেমস রাসেল লোয়েনের জুন মাসের উপর লেখা একটা কবিতা—নাম ''স্যার লন্‌ফলের স্বপ্ন''। কবিতাটা স্কুলে প্রত্যেকের পড়া উচিত। তুমি নিশ্চয় পড়েছ। মনে করার চেষ্টা করো জুন মাসের একদিন এক বনভোজনের ছবি সেখানে আঁকা হয়েছে। খাবারের তালিকায় কি ছিল? সসেজ প্যাটিজ, টোস্টেড মার্সমালোজ, আর্টি চোক হার্ট, মাস্টার্ড পিকলাস এবং প্রন হুইপ। যদি ধাঁধার উত্তর বার করতে পারো তাহলে দরজাটা খুলবে। সংকেত শব্দটি পেতে হলে কবিতার এই লাইনগুলোকে উল্টেপাল্টে সাজিয়ে দেখ। পাবে। তুমি বুদ্ধিমান নিশ্চয় বার করতে পারবে। এর চাইতে বেশি আমি আর তোমাকে কিছু বলে সাহায্য করতে পারছি না। আমার হাতে কিছুটা সময় দরকার। আমাকে পালাতে হবে। অনেক দূর। মেফেয়ার যদি বেঁচে ওঠে তবে পৃথিবীতে শেষ প্রান্ত থেকেও আমায় ধরে নিয়ে আসবে আর প্রতিশোধ নেবে বুঝতে পারছো। তোমার হাতে অগাধ সময়। ভাবতে শুরু করে দাও।

হেণ্ডারসন চলে গেল। এ্যাণ্ডি শুনলো একটা চাবি ঘুরিয়ে সে দরজা বন্ধ করে দিল। তার মনে হল সে একা—দরজা বন্ধ এক ভল্টের মধ্যে সে একা। বাবা যদি সময় মত দরজা খুলতে না পারেন, তবে সে দমবন্ধ হয়ে মারা যাবে। টেবিল থেকে উঠে গিয়ে এ্যাণ্ডি দরজাই সামনে দাঁড়ালো, আচড়াবার চেষ্টা করলো। কিছু একটা

ধরে সর্বশক্তি চেষ্টা করলো—সব চেষ্টা তার ব্যর্থ হল। তার মনে হল বাতাস ইতিমধ্যে শেষ হয়ে আসছে। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। সে বোধহয় জ্ঞান হারাবে।

ধীরে ধীরে শান্ত হল এ্যাণ্ডি। ব্যস্ত হয়ে উত্তেজিত হয়ে কোন লাভ নেই। ভল্টের মধ্যে কয়েক ঘন্টার মত বাতাস মজুত আছে। ইতিমধ্যে বাবা নিশ্চয় একটা না একটা রাস্তা ঠিক বার করে ফেলবেন। ভল্টের ভিতরের চেহারাটা দেখে তার ভীষণ কষ্ট হল। হেণ্ডারসন সব লুঠ করে নিয়ে গেছে। ওর থেকেই সংকেত শব্দটি পাওয়া যাবে। এ্যাণ্ডি মন দিল জুন মাসের কোন একদিনের বনভোজনের উপর লেখো কবিতাটার কথায়? ভাবতে চেষ্টা করলো কিন্তু পারলো না। পেটে আসছে কিন্তু মুখে আসছে না লাইনগুলো। একটা লাইন—মনে পড়লো। জুন মাসের দিনগুলোতে কি সে জিনিস যা সহজ লভ্য নয়।' ব্যস এই পর্যন্ত, আর মনে পড়লো না। এ্যাণ্ডি একটা কাগজে কবিতার কয়েকটা লাইন লিখল আর তার তলায় লিখল হেণ্ডার সনের দেওয়া বনভোজনের খাদ্য তালিকা। ভাবতে গিয়ে ওর দু'চোখে জল এসে গেল। মাসটা জুন নয়। আজ চড়ুইভাতি হচ্ছে না, আজ নবান্নের দিন। বাড়িতে মুরগি মসল্লম খাওয়ার কথা। মা বেড়াতে গেছেন বাবা বানাতেন।

হঠাৎ সে বাবার কণ্ঠস্বর শুনতে পেল—এ্যাণ্ডি, এ্যাণ্ডি তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?

শব্দটা কোথা থেকে আসছে বুঝতে পাচ্ছিল না এ্যাণ্ডি, পাগলের মত এদিক ওদিক খুঁজতে লাগলো। তারপর দেখতে পেল ঠিক মাথার উপর একটা লাউড স্পিকার। এ্যাণ্ডি আমার কথা শুনতে পেলে লাউস স্পিকারের তলায় লাল বোতাম টিপে জবাব দাও। তারপর ছেড়ে দাও শোনার জন্য।

এ্যাণ্ডি তাই করলো।—বলো বাবা শুনতে পাচ্ছি।

—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। শোনো হেণ্ডারসনের সঙ্গে আমাদের চুক্তি হয়েছে। বারঘন্টা সময় চায় পালাবার জন্য। তারপর টেলিফোনে সাংকেতিক শব্দটা সে আমাদের জানিয়ে দেবে। চার ঘন্টা মত বাতাস ভিতরে আছে তুমি একদম ভয় পেয় না। আমরা সংকেত শব্দটা বার করার চেষ্টা করছি।

—না বাবা, আমি ভয় পাচ্ছি না। এ্যাণ্ডি জবাব দিল। তারপর হেণ্ডারসন তাকে যা যা বলে গিয়েছিল তা সবই সে তার বাবাকে বললে।

অনেকক্ষণ পরে বাবার কণ্ঠস্বর আবার শোনা গেল। আমি তো মাথামুণ্ডু বুঝে উঠতে পাচ্ছি না। যাই হোক পুলিশের বিশেষজ্ঞরা সবাই এসেছেন। তুমি শান্ত হও। উত্তেজিত হবে না। উত্তেজিত হলে ভিতরের বাতাস কমে আসবে। এখনকার যা অবস্থা তাতে গ্যাস কাটার দিয়ে কাটাও যাবে না, তাহলে বিষাক্ত গ্যাসে সব ভরে

যাবে। আমরা অন্যভাবে চেষ্টা করছি কিন্তু কিছু ভেব না। আমি সব সময় তোমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখছি।

—হ্যাঁ বাবা। এ্যাণ্ডির জবাব। বললেই কি আর শান্ত থাকা যায়। না কি সম্ভব শান্ত থাকা। বের করতে হবে ধাঁধার উত্তর। সে আবার চেষ্টা শুরু করলো। জুন মাসের কোন একদিন কি সে বস্তু যা সহজলভ্য নয়। আর খাদ্য তালিকারই বা কি অর্থ? এ্যাণ্ডি হাতের কাছে রাখা একটা ডাকটিকিটের অ্যালবাম টেনে নিল। প্রথম পাতাটা খুলে দেখল লেখা আছে, ব্রিটিশ গায়না, একটি সেন্ট ম্যাজেন্টা, প্রকাশের সময় ১৮৬৫, নিচে কিছুটা ফাঁকা জায়গা। সম্ভবত ডাকটিকিট রাখার জন্য। আরও নিচে টিকিটের ইতিহাস। এ্যাণ্ডি জানে সে টিকিট মেফেয়ার কখনও পাননি। পাবেনও না। অথচ মেফেয়ারের প্রতিজ্ঞা, টিকিটটা তিনি জোগাড় করবেন যে করেই হোক।

এ্যাণ্ডি ক্যাটালগের পাতা উল্টালো। সবগুলোই প্রায় খালি। সেখানে ছিল অতি মূল্যবান সব ডাকটিকিট যাতে কিছু না কিছু ভুল ছিল। উত্তমাশা অন্তরীপের চতুষ্কোণ টিকিট, মরিশাস দ্বীপের টিকিট, ১৯১৮ সালে প্রকাশিত আমেরিকার এয়ারমেল টিকিট ইত্যাদি। ভারি ইচ্ছে ছিল টিকিটগুলো একটু চোখে দেখার। কারণ কোটিপতি ছাড়া এসব টিকিট সংগ্রহ করা কারুর পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু হেণ্ডারসন সব নিয়ে গেছেন। এবার সে আর একটা ক্যাটালগ বার করলো। সেটাও সরিয়ে রাখলো। আর সরাতে গিয়ে তার নিজেরই নজরে পড়লো তার হাতে লেখা কবিতাটার লাইনটা। সেখানে ঠিক মাঝখানে একটা শব্দ লেখা আছে "RARE"।

"RARE"। বিরল। জুন মাসে কি বিরল? তারপর হঠাৎ তার মনে হল সে পেয়েছে। শব্দটা সে পেয়েছে। লাফ দিয়ে উঠে গায়ের জোরে লাল বোতামটা টিপে চেঁচিয়ে উঠলো—বাবা। তার পরেই শব্দটা উচ্চারণ করলো উত্তেজিত ভাবে।

—ঠিক আছে। আমি শুনেছি, তুমি শান্ত হও। উত্তেজিত হও না। আমরা দেখছি। আশ্চর্য দরজাটা খুলছে না কেন?

—বাবা।

—দুঃখিত এ্যাণ্ডি তোমার দেওয়া শব্দটা কার্যকর হল না।

এ্যাণ্ডি প্রায় কেঁদে ফেলে আর কি। হল না। সে আছড়ে পড়লো দরজার গায়ে। ঘুষি মারতে গিয়ে হাত রক্তাক্ত হল। মনে পড়লো আবার বাবার কথা—বিপদে কখনো ধৈর্য হারাবে না। বিপদ যখন ঘনিয়ে আসবে তখন ততোটাই শান্ত থাকতে হবে।

এ্যাণ্ডি আবার চিন্তা করতে চেষ্টা করলো। হেণ্ডারসন আরও একটা কথা বলেছিল, কি সে কথা?

ধাঁধা সংক্রান্তই সে কথা। হ্যাঁ মনে পড়েছে, সামনে থেকে ভাব, পিছন থেকে ভাব, উল্টে ভাব, পাল্টে ভাব যে ভাবে খুশি ভাব।

—ঠিক ঠিক, পিছন থেকে বানানটা করো।

সে আবার বাবাকে ডাকলো।

—বলো এ্যাণ্ডি।

—বাবা যে শব্দটা তোমাকে আগে দিয়েছিলাম সেটাকে পিছন দিক থেকে বানান করো। পিছন দিক থেকে...

এ্যাণ্ডি অপেক্ষা করতে লাগলো। যেন অপেক্ষাটা অনন্তকাল বলে তার মনে হল। খুলছে। দরজা খুলছে। খোলা দরজা দিয়ে বুলেটের মত ছুটে বেরিয়ে এলো এ্যাণ্ডি। ঝাঁপিয়ে পড়লো বাবার বুকে। বাবা, এবারও আমার ভুল হতে পারতো।

—আমার ও তাই ধারণা। গোয়েন্দা সহকর্মীদের নির্দেশ দিলেন সমস্ত রাস্তা অবরোধ করার জন্য। মোটে আধঘন্টা সময় পেরিয়েছে।

সরকারি অফিসার জানালেন সে কাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। আপনি বরং আপনার ছেলেকে নিয়ে লাইব্রেরিতে একটু বিশ্রাম করুন।

লাইব্রেরি ঘরে বসে গোয়েন্দা জিজ্ঞাসা করলেন, কি করে তুমি শব্দটা পেলে?

—দেখ বাবা—এ্যাণ্ডি ব্যাখা করলো, মিস্টার মেফেয়ার চাইতেন সব সময় সব বিষয়ে প্রথম হতে। দুনিয়ার এক নম্বর জিনিস তার অধিকারে রাখতে। অন্য কারুর কাছে যেন সেই বস্তু না থাকে। এবার এসো ডাকটিকিটের ক্ষেত্রে। একটা ডাকটিকিট আছে যা কিনা দুষ্প্রাপ্য। পৃথিবীতে মাত্র একটা কপিই আছে—সেটা ব্রিটিশ গায়নার টিকিট।

মিস্টার মেফেয়ারের হেফাজতে সেটি ছিল না। হেণ্ডারসন সেই সূত্রই দিয়েছিল—একটি মাত্র টিকিট মেফেয়ারের ছিল না। এই ব্যাপারটা নিশ্চয় তাকে অস্থির করতো। আর শব্দটাও ছয় অক্ষরের—G-u-i-a-n-a, আমি সিদ্ধান্তে এসেছিলাম এই শব্দটা দিয়েই দরজাটা খুলবে। তবে খুলেছে। তবে উল্টোদিক দিয়ে বানান করে। কারণ মেফেয়ারের চরিত্রই তাই ছিল। তার মানসিক গঠন প্যাঁচালো। কোন কিছুকেই তিনি সহজ করে নিতে পারতেন না।

—ছেলেকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে গোয়েন্দা পোর্টারফিল্ড বললেন—তুমি একজন পাকা গোয়েন্দার মত কাজ করেছ। খুবই বুদ্ধির কাজ। ভাবছি ভবিষ্যতে আমার কোম্পানির নাম পাল্টে রাখবো—এ্যাডামস এ্যাণ্ড সনস্। তুমি কি বলো?

বাবার বুকে মুখ গুঁজে এ্যাণ্ডি খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে বললে খুব ভাল হবে বাবা।

"আমি আলফ্রেড হিচকক বলছি—সব ভাল যার শেষ ভাল, আমি এই

ব্যাপারে একমত। কেসটা যেভাবে এগিয়েছে তাতে আমার কিছু বলার নেই। কিন্তু মিস্টার বার্ট হেণ্ডারসনের কি গতি হল সেটা নিশ্চয় আপনাদের জানতে ইচ্ছে করছে। পুলিস কি ফাঁদ পেতেছিল, তার কি হল। ভাল কথা, সময় মত একটা টেলিগ্রাম এসেছিল হেণ্ডারসনের কাছ থেকে। যাতে সাংকেতিক শব্দটি লেখা ছিল। অর্থাৎ হেণ্ডারসন অপরাধী হলেও কথা দিয়ে কথা রাখে। হ্যাঁ, পুলিশ তাকে অনেকদিন ধরতে পারেনি। অথচ সে কাছেই একটা গ্রামে লুকিয়েছিল। সেখানে তার পরিচয় ছিল একজন রহস্য গল্পের লেখক হিসাবে। একরাশ ডাকটিকিট কিনতে গিয়ে সে ধরা পড়ে যায়। সেটা ১৯৬৩ সালের জানুয়ারি মাসে।

ওর নামে কেস রুজু হয়েছে। বন্ধুর টিকিট চুরির অভিযোগ। এদিকে মেফেয়ার আরোগ্য লাভ করে কেস তুলে নেন। কারণ হিসাবে জানা গেল তার সংগৃহিত সব টিকিট কিন্তু সোজা রাস্তায় তার কাছে আসেনি।

পুলিশ অবশ্য হেণ্ডারসনের বিরুদ্ধে মেফেয়ারকে গুলি করার অভিযোগ এনেছে। তারও কি হবে বলা মুসকিল। কারণ ওর উকিল যে রকম তেড়েফুড়ে পুলিশের দাবিগুলো নস্যাৎ করছে, তাতে মনে হয় খুব সুবিধা হবে না...।"
